মাসুদ রানা
দুরন্ত ঈগল ১
কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

শুক্রবার, সন্ধ্যা – জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

ঠিক সাড়ে ছ'টায় রানওয়েতে ল্যান্ড করল একটা সিঙ্গাপুরি ফ্লাইং অ্যামবুলেন্স। প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র যাচাই করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে আগেই অনুমতি দেওয়া হয়েছে, মুমূর্ষু একজন রোগিণীকে সিঙ্গাপুরের 'মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটাল'-এ নিয়ে যাওয়া হবে।

সাবলীল ভঙ্গিতে নিরাপদেই ল্যান্ড করল সাদা বকের মত প্লেনটা, তারপর গড়িয়ে চলে গেল টার্মিনাল ভবনের কাছাকাছি, উজ্জ্বল আলোর মাঝখানে। সাদা গায়ে, ফিউজিলাজের দু'পাশে, একটা করে রক্তবর্ণ ক্রসচিহ্ন কার না চোখে পড়বে।

পাঁচজন ক্রু, দুজন আরদালি, দুজন নার্স ও দুজন ডাক্তার আছেন ওটায়। কাগজ-পত্র অনুসারে সবাই তাঁরা থাই নাগরিক, চেহারায় তাই জাতিগত থাই বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট, তবে ওঅর্ক পারমিট নিয়ে দীর্ঘদিন সিঙ্গাপুরে অবস্থান করছেন। প্লেনের গায়ে, ক্রসচিহ্নের নীচে, বড় বড় নীল হরফে ইংরেজিতে লেখা: SINGAPORE FLYING AMBULANCE.

দুজন আরদালি, একজন নার্স ও দুজন ডাক্তার ফ্লাইং অ্যামবুলেন্স থেকে নেমে কাস্টমস শেডের দিকে এগোলেন, রোগিণীকে আনতে বনানীর ডিপ্লোম্যাটিক জোন-এ যাবেন তাঁরা।

কাস্টমস অফিসাররা জরুরি পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন, সবার আগে চেক করে ওঁদের পাসপোর্টে সিল মেরে দিলেন, জানেন ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই কোমা-য় থাকা কোনও এক রোগিণীকে নিয়ে আবার ওঁরা সিঙ্গাপুরে ফেরার জন্য ফ্লাই করবেন। সবার কাছে থাই পাসপোর্ট, অথচ আসছেন সিঙ্গাপুর থেকে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ অফিসাররা জানেন, সিঙ্গাপুরের অনেক হাসপাতালে বিভিন্ন দেশের ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী ওঅর্ক পারমিট নিয়ে বছরের পর বছর চাকরি করেন।

টার্মিনাল ভবন হয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এল পাঁচজন থাই। রাস্তার ওপারে একটা অ্যামবুলেন্স অপেক্ষা করছে ওদের জন্য, মাথায় লাল-নীল আলো জ্বলছে আর নিভছে, গায়ে লেখা: ইমার্জেন্সি অ্যামবুলেন্স সার্ভিস, মগবাজার, ঢাকা।

পাঁচ থাই রাস্তা পেরুচ্ছে, সামনে ডাক্তার ও মেইল নার্স তিনজন, দেখতে পেয়ে দরজা খুলে অ্যামবুলেন্স থেকে নীচে নামল ড্রাইভার। তার বয়স হবে বত্রিশ। গায়ের রঙ কালো, স্বাস্থ্য ভাল। মুখে আধ ইঞ্চি লম্বা দাড়ি, গোঁফ জোড়া ঘন ও চওড়া। তার দুই গালেই গভীর ও শুকনো ক্ষতচিহ্ন রয়েছে, ওগুলোর উপর দাড়ি গজায়নি – দেখা যায় পরিষ্কার।

ছোট্ট গ্রুপটা কাছাকাছি চলে আসতে অ্যামবুলেন্সের স্লাইডিং দরজা খুলে দিল সে। মাথা ঝুঁকিয়ে সৌজন্য প্রকাশ করলেন ডাক্তার, আর সবাইও কোনও কথা না বলে মাথা নিচু করে উঠে পড়ল গাড়িতে।

নিজের সিটে উঠে দরজা বন্ধ করল ড্রাইভার। সব কটা জানালা বন্ধ, ভিতরটা এয়ারকুল্ড্। ঘাড় ফিরিয়ে থাই অতিথিদের দিকে তাকাল সে। মুখে হাসি নেই। এক ধরনের ভয় মেশানো সমীহের ভাব নিয়ে অপেক্ষা করছে সে।

'আমরা থাই থান্ডার,' ডাক্তারদের ড্রেস পরা এক লোক ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল। অত্যন্ত শান্ত ও ঠাণ্ডা চেহারা তার, শুধু চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। তার ডান কপালের পাশে একটা

www.MurchOna.com

লাল জরুল আছে। থাইল্যান্ডে থান্ডার হলো কুখ্যাত একটা মাফিয়া সংগঠন। 'আমি চিফ, চক্রি চুয়ান। আপনি কি গালকাটা রুস্তম?'

অনভ্যস্ত ইংরেজিতে বলল ড্রাইভার, 'হ্যাঁ, আমি রুস্তম।'

'কোড বলুন, প্লিজ,' চক্রি চুয়ান বলল। 'আমারটা আমি বলছি – ডাবল জিরো, ট্রিপল থ্রি।'

'ট্রিপল থ্রি, ডাবল জিরো,' নিজের কোড জানাল ড্রাইভার।

'ঠিক আছে, গাড়ি ছাড়ুন তা হলে,' বলল থান্ডার লিডার। 'শহরের ভেতর ঢুকি আগে।' রুস্তম গাড়ি ছাড়ার পর আবার বলল, 'এখানে আপনাকে কে পাঠাল? আপনার কাজটাই বা কী?' এখনও ড্রাইভার রুস্তমকে পরীক্ষা করছে সে।

'বাংলাদেশ সিন্ডিকেট থেকে আমার বস্ এখানে আমাকে পাঠিয়েছেন, মিস্টার চুয়ান,' থেমে থেমে, বুঝে-শুনে জবাব দিচ্ছে রুস্তম; বস্ তাকে সাবধানে থাকতে বলে দিয়েছে, কিছু ভুল-ভাল করে ফেললে বছরে যে কয়েক কোটি টাকার ড্রাগস আমদানির ব্যবসা হচ্ছে সেটা ওদেরকে হারাতে হতে পারে।

'আপনার বসের নাম?'

'জহুরুল আব্বাসী,' ধীরে ধীরে গাড়ি চালাচ্ছে রুস্তম, শান্ত ভাবে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে।

'আপনাকে ঠিক কী দায়িত্ব দিয়ে তিনি পাঠিয়েছেন?'

'আপনাদের সবরকম সহযোগিতা করতে বলে দিয়েছেন। যেখানে যেতে চান সেখানে নিয়ে যাব,' জবাব দিল রুস্তম, 'যাই করতে চান, সাহায্য করব আমি।' একটু থেমে গলায় একটু জোর এনে সে আবার বলল, 'আসলে আমি ড্রাইভার নই, বাংলাদেশ সিন্ডিকেটের উঁচু কোনও পদে আছি। আপনাদের কাজটা গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্যেই দায়িত্ব দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন বস্। আমার ওপর আপনারা ভরসা রাখতে পারেন।'

'নিশ্চয়ই জানেন কোথায় যেতে চাই আমরা? ভেরি গুড, নিয়ে চলুন সেখানে।' সিটে হেলান দিল চক্রি চুয়ান।

'না, মিস্টার চুয়ান,' বলল রুস্তম। 'আপনাদের গন্তব্য বা কাজ সম্পর্কে আমাকে কোনও ধারণা দেয়া হয়নি। বস্ বলে দিয়েছেন, আমাকে শুধু আপনার নির্দেশ পালন করতে হবে।'

'কিন্তু আপনার তো জানার কথা যে আমাদের একটা মাইক্রোবাস দরকার হবে,' বলল চুয়ান।

'হ্যাঁ, জানি, মিস্টার চুয়ান,' বলল গালকাটা রুস্তম। 'মাইল দুয়েক সামনে পার্ক করা আছে ওটা, কয়েকটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর-এর সামনে। পাঁচ সিটের মাইক্রোবাস, নীল রঙের। এই নিন চাবি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার গালকাটা,' রিঙসহ চাবি নিয়ে বলল চক্রি চুয়ান।

অস্বস্তি বোধ করায় তাড়াতাড়ি তাকে শুধরে দিল রুস্তম, বলল, 'নামের সবটুকু নয়, শেষটুকু বললেই চলবে।'

'ঠিক আছ, মিস্টার কাটা মাল,' সহাস্যে বলল চক্রি চুয়ান।

'না-না, মাল নয়, মাল নয় – রুস্তম।'

'সরি,' বলল চুয়ান। ডাক্তারি ব্যাগ খুলে তুলোর একটা বড়সড় রোল ধরল সে, সেটার ভিতর থেকে বেরুল একটা প্যাকেট। 'এই টাকাটা রাখুন, আপনার বস্ মিস্টার আব্বাসীর জন্যে।'

প্যাকেটা নিয়ে জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিল রুস্তম। 'ধন্যবাদ।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল ওরা।

তারপর হঠাৎ বলল চুয়ান, 'আমরা একটা তালিকা পাঠিয়েছিলাম...'

'আপনাদের যা যা দরকার তার কিছু আছে এই গাড়িতে, বাকি সব পাবেন মাইক্রোবাসে – সিটের সাইড পকেট আর ব্যাকসিটের তলায়,' বলল রুস্তম।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

কী কী আছে দেখে নিয়ে নিজের পকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করে চোখ বুলাল চক্রি চুয়ান। এই ম্যাপ ঢাকা থেকে ফ্যাক্স করে পাঠানো হয়েছে তাকে।

ম্যাপে ঢাকার ডিপ্লোম্যাটিক জোনের দুটো বাড়ি দেখা যাচ্ছে। একটা থাই দূতাবাস, অপরটি ডক্টর মির্জা শামসুন্নাহার নামে এক বাংলাদেশী ভদ্রমহিলার বসতবাড়ি – নাহার ভিলা। দুই বাড়ির মাঝখানে শুধু একটা সরু প্যাসেজ। দুই বাড়িরই পিছন দিকে প্রচুর গাছপালা রয়েছে, লক্ষ করল থাই থান্ডারের লিডার। পাঁচিল টপকানো কোনও সমস্যা নয়, ভাবল সে, কারও চোখে ধরা পড়ারও কোনও ভয় নেই।

এরপর একটা নকশা পরীক্ষা করল চুয়ান, এটাও ঢাকা থেকে পাঠানো হয়েছে তাকে। ওটায় নাহার ভিলার কোথায় কী রয়েছে সব আঁকা আছে। ফুটনোটে বলা হয়েছে শুক্রবার ডিনারের সময় ভিলায় উপস্থিত থাকবে মাত্র পাঁচজন মানুষ।

'এবার, মিস্টার কাটা রুস্তম, আমার জানামতে আপনার কাছে একটা রেডিও সেট থাকার কথা।'

'আছে, মিস্টার চুয়ান,' বলে ড্রাইভিং সিটের পকেট থেকে মিনি সাইজের একটা রেডিও সেট বের করল রুস্তম।

সেটা নিয়ে কোলের উপর রাখল চুয়ান। মাথায় হেড সেট পরে অন করল সেটটা, নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়ার জন্য নব ঘোরাচ্ছে।

কয়েক সেকেন্ড পরেই যোগাযোগ ঘটল। যান্ত্রিক হলেও, বাংলাদেশ সিন্ডিকেটের চিফ জহুরুল আব্বাসীর কণ্ঠস্বর পরিষ্কার চিনতে পারল চক্রি চুয়ান, দীর্ঘদিন হলো এই লোকের সঙ্গেই ড্রাগ-এর ব্যবসা করছে ওরা। তারপরেও নিজের কোড বলল সে। 'ডাবল জিরো, ডাবল ওয়ান। আপনারটা, প্লিজ?'

'ডাবল ওয়ান, ডাবল জিরো,' আন্তরিক ও মার্জিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল খুদে স্পিকার থেকে।

'হাই!'

'হ্যালো!'

'ডক্টর 'এন' কি আজও ডক্টর 'এস'-এর বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন?' দ্রুত প্রশ্ন করল চক্রি চুয়ান।

'মিনিট বিশেক আগে রিপোর্ট পেয়েছি, ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি থেকে রওনা হয়েছেন ডক্টর এন।' আব্বাসীও দ্রুত উত্তর দিচ্ছে, দুজনের কেউই ইথারে বেশিক্ষণ থাকতে চাইছে না।

ঢাকা শহরের একটা ম্যাপে চোখ বুলাচ্ছে চুয়ান। সে আন্দাজ করে নিল, এতক্ষণে ডক্টর নাদিরা নিশ্চয়ই নাহার ভিলায় পৌঁছে গেছেন। 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।'

রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ওদের অ্যামবুলেন্স এরইমধ্যে কয়েকটা বাঁক নিয়েছে। সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে গালকাটা রুস্তম।

হেড গিয়ার সহ রেডিও সেটটা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে চুয়ান বলল, 'কী করতে হবে বলছি, মন দিয়ে শুনুন, মিস্টার কাটা রুস্তম।'

'ইয়েস, মিস্টার চুয়ান,' রাস্তার উপর চোখ রেখে বলল রুস্তম।

ব্যাক সিট থেকে তার কোলের উপর ম্যাপের ফ্যাক্স কপিটা ফেলল চুয়ান, তারপর বলল, 'মাইক্রোবাসে চড়ে হারিয়ে যাব আমরা। আপনি নাহার ভিলার আশপাশে কোথাও অপেক্ষা করবেন। যেই আমি আপনাকে জানাব সময় হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে অ্যামবুলেন্স নিয়ে নাহার ভিলার ভেতরে ঢুকে পড়বেন আপনি।'

কোল থেকে ম্যাপটা তুলে নিয়ে দ্রুত চোখ বুলাল রুস্তম। 'ওই ভিলায় দারোয়ান নেই? গেট খোলা না পেলে?'

'দারোয়ান নয়, সেনাবাহিনীর সদস্যরা পাহারা দিচ্ছে বাড়িটা,' বলল চক্রি চুয়ান। 'ওদেরকে বলবেন ফোন করে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

অ্যামবুলেন্স চাওয়া হয়েছে, এক্ষুনি হার্ট অ্যাটাক-এর রোগিণীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তারপর পরিস্থিতি বুঝে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে ভেতরে ঢুকবেন। আমরা বাড়ির ভেতরেই থাকব।'

সেনাবাহিনীর কথা শুনে মনে মনে ঘাবড়ে গেলেও, চেহারায় সে উদ্বেগ ফুটতে দিল না রুস্তম। মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলল, 'ঠিক আছে।'

'ভেরি গুড,' খুশি হলো চক্রি চুয়ান। 'মিস্টার কাটা রুস্তম, এবার আমার বন্ধুদের খবর বলুন। ওরা সব ভাল তো?'

'ওই পাঁচ থাই, মানে, যারা ঠিক আপনাদের মত দেখতে...' শুরু করল রুস্তম ।

'না, মিস্টার কাটা রুস্তম, তা কী করে হয় – সবাই আমরা আলাদা দেখতে।'

'আমার চোখে তো একই রকম লাগে। যাই হোক, কাল রয়াল থাই এয়ারলাইন্সের সন্ধ্যার ফ্লাইটে ভালভাবেই পৌঁছেছেন আপনার পাঁচ বন্ধু,' জানাল গালকাটা রুস্তম। 'তবে কী কাজে এসেছেন বা কোথায় উঠেছেন আমার জানা নেই। আপনাদের মত ওঁদেরকেও যা-যা চাওয়া হয়েছে দেয়া হয়েছে সব।'

'পেমেন্ট?'

'পেয়ে গেছি।'

'ভেরি গুড। স্পিড বাড়ান, মিস্টার কাটা রুস্তম,' নির্দেশ দিল চুয়ান।

স্পিড না বাড়িয়ে রুস্তম বলল, 'সামনেই বাঁক।' বাঁকটা ঘোরার পর ফুটপাথ ঘেঁষে অ্যামবুলেন্স দাঁড় করাল সে। দুশো গজ দূরে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলো দেখা যাচ্ছে। সেদিকে চিবুক তাক করে বলল, 'ওই দেখা যায় আপনাদের নীল মাইক্রোবাস।'

*

সন্ধ্যা ঠিক সাড়ে সাতটায় কাঁটাতারের বেড়া কেটে বিমানবন্দরের ভিতর ঢুকল থাই থান্ডারের প্রথম গ্রুপটা। এরাও সংখ্যায় পাঁচজন, প্রত্যেকের হাতে একটা করে ব্রিফকেস। গালকাটা রুস্তম ও চক্রি চুয়ান এদের নিয়েই আলাপ করছিল অ্যামবুলেন্সে – রয়াল থাই এয়ারলাইন্স-এর একটা বোয়িং-এ চেপে গতকাল ঢাকায় এসেছে।

ফ্লাইং অ্যামবুলেন্স ও টার্মিনাল ভবন থেকে সবচেয়ে দূরের বেড়া কেটে ভিতরে ঢুকেছে এরা পাঁচজন। চাঁদ-তারা কিছুই নেই আকাশে, বিমানবন্দরের এদিকটা অন্ধকারে ঢাকা।

বেড়া কাটবার পর তিন মিনিট হাঁটল ওরা। দুই কি আড়াইশো গজ দূরে আলোকিত একটা হ্যাঙ্গার দেখতে পেল। ওরা জানে, স্পেশাল একটা হ্যাঙ্গার ওটা। বাইরে নয়, আলো জ্বলছে হ্যাঙ্গারের ভিতরে। তবে সেই আলোর আভায় বাইরে টহলরত কয়েকটা ছায়ামূর্তিকে দেখা গেল পরিষ্কার। সামরিক বাহিনীর দুটো অস্থায়ী তাঁবুও রয়েছে হ্যাঙ্গারে ঢোকার মুখ থেকে বিশ গজ বাম দিকে।

বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের অনুরোধে এই বিশেষ হ্যাঙ্গারটা পাহারা দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনী থেকে পাঠানো হয়েছে গার্ডদের। যদিও কোনও ধারণা নেই হ্যাঙ্গারের ভিতরের কোন্ জিনিসটাকে পাহারা দিচ্ছে তারা। শুধু জানে, সিকিউরিটি কোড ছাড়া কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া যাবে না; আর কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া একটা স্ক্রু পর্যন্ত হ্যাঙ্গার থেকে বের করা যাবে না।

কালো কাপড়ের সুট পরা থাই পাঁচজন ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে পড়েছে। চোখে বিনকিউলার তুলল টিম লিডার তাইম আনন্দ। আঙুলগুলো স্থির রাখতে পারে না সে, বিনকিউলারের গায়ে তবলা বাজাচ্ছে। হ্যাঙ্গারের বেশ খানিকটা ভিতরে লালচিনের তৈরি দুটো জেট প্লেন 'ঈগল' দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এগুলো লালচিনের কাছ থেকে উপহার হিসাবে পেয়েছে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

বাংলাদেশ। দুটো ঈগলের সঙ্গে তিনজন করে ছয়জন ক্রুও এসেছে ঢাকায়, বাংলাদেশী পাইলটদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য।

ডক্টর নাদিরার অনুরোধে ঈগল দুটোর কাছে সব সময় ওই ক্রুদের একটা গ্রুপকে প্রস্তুত রাখা হয়, কোনও কাজ থাকুক বা না থাকুক।

বাকি তিনজনের থাকার কথা কাছের একটা থ্রি-স্টার হোটেলে। টিম লিডার খবর নিয়েছে; তিনজনই আছে নিজ নিজ কামরায়।

থাই থান্ডারের সদস্যরা জানে ওগুলোর মধ্যে একটা ঈগলকে ডেভেলপ করেছেন বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরা। ওটার নাম দেওয়া হয়েছে দুরন্ত। ওটাই তাদের টার্গেট, থাকার কথা A সেকশনে।

বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের লোগো আঁকা ঈগল দুটোর ডানে-বাঁয়ে ছোটবড় আরও তিনটে প্লেন দেখা যাচ্ছে। তবে ক্রু তিনজনের কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তারা হয়তো কোনও ঈগলের ভিতর কলকব্জা পরীক্ষা করছে, কিংবা হ্যাঙ্গারের অন্যপ্রান্তে বসে আড্ডা দিচ্ছে।

চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে তাইম আনন্দ নির্দেশ দিল, 'তৈরি হও।'

যে-যার অস্ত্র চেক করে নিচ্ছে বিশেষ ট্রেনিং পাওয়া থাই থান্ডার সদস্যরা।

'অ্যাকশন শুরু হবে এখন থেকে ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর,' হাতঘড়ি দেখে সবাইকে জানাল আনন্দ। 'ভেতরে ঢুকে নির্বিঘ্নে কাজ সারার জন্যে বাইরের সব কজন গার্ডকে অচল করে দিতে হবে। খেয়াল রাখবে, ওদের কেউ যাতে চিৎকার দিতে না পারে। কোনও প্রশ্ন?'

এ-ধরনের অ্যাকশনে অভিজ্ঞ সবাই, কারও কোনও প্রশ্ন নেই।

'আমরা হ্যাঙ্গারের যতটা সম্ভব কাছাকাছি পজিশন নেব,' বলল সহকারী টিম লিডার হো টাকসিন। 'তা হলে টহলের ছকটা ধরতে পারব, দেখতে পাব হ্যাঙ্গারের ভেতরে কে কী করছে না করছে।'

নিঃশব্দ পায়ে হেঁটে হ্যাঙ্গারের ত্রিশ গজের মধ্যে চলে এল ওরা। লিডারের নির্দেশে শুয়ে পড়ল সবাই, আরও পাঁচ গজ এগোল ক্রল করে।

'সিকিউরিটি বেশ কড়া,' চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে বলল টিম লিডার। 'তবে... সম্ভব।'

প্রথম তাঁবুর ভিতর শুধু একজন মেজর। দ্বিতীয় তাঁবুটা কাছেই, ভিতরে মোট তিনজন সেপাই ও একজন হাবিলদার। বিশ্রামে আছে ওরা।

'দেখতেই পাচ্ছ,' ফিসফিস করল লিডার, 'তিনজনের দুটো গ্রুপ হ্যাঙ্গারটাকে ঘিরে টহল দিচ্ছে, দুইজন গেটের দু-পাশে দাঁড়িয়ে ডিউটি দিচ্ছে। আমাদের কাবু করতে হবে মেজরসহ মোট তেরোজনকে।'

'আমরা কি জানি পালাবদল কটার সময়?' দলের সদস্য ফিবুন সংগত প্রশ্ন করল।

'জানলে খুব ভাল হত,' বলল সহকারী টিম লিডার হো টাকসিন, হাতঘড়ির উপর চোখ। 'পঁয়ত্রিশ মিনিট পর অ্যাকশন শুরু, তাই তো? ঠিক আছে, বস।'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

দুই

অ্যামবুলেন্স থেকে নেমে বাকি দুশো গজ হেঁটে এল চুয়ানের নেতৃত্বে থাই থান্ডারের মেডিকেল গ্রুপ। সঙ্গে চাবি আছে, দরজা খুলে মাইক্রোবাসে চড়ল তারা। আলো জ্বেলে ভিতরটা একবার দেখে নিল, তারপর অন্ধকারে কাপড় পাল্টাল। প্রত্যেকে কালো সুট পরল, নিজেদের ড্রেস খুলে ভরে রাখল ব্রিফকেসে। যে যার অস্ত্র কিছু সঙ্গে রাখল, কিছু রাখল ব্রিফকেসের ভিতর।

ড্যাশ বোর্ড থেকে পাওয়া রোড ম্যাপে চোখ রেখে গাড়ি চালাচ্ছে চুয়ান। নাহার ভিলার সামনে দিয়ে যাচ্ছে তারা। লোহার গ্রিল লাগানো গেটের সামনে দুজন লোককে পাহারায় দেখতে পেল। অলস পায়ে পায়চারি করছে এক সিপাই, কাঁধে রাইফেল। লাইটপোস্টে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন হাবিলদার – এক পায়ে ভর দিয়ে, অপর পা অনবরত নাচাচ্ছে সে, হিপ হোলস্টারে পিস্তল। ক্যাপটেন বা তার আর্মারড কারটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

সেনাবাহিনীর এই সদস্যরা পাহারা দিচ্ছে ডক্টর নাদিরাকে। তবে তিনি আসলে কে, কেন তাঁকে পাহারা দিতে হবে ইত্যাদি কিছুই তাদের জানা নেই।

নাহার ভিলাকে পিছনে ফেলে কিছুটা এগোবার পর ডানদিকে বাঁক ঘুরল নীল মাইক্রোবাস, এই সময় ওদেরকে পাশ কাটাল একটা আর্মারড কার, ড্রাইভারের পাশের সিটে সতর্ক ভঙ্গিতে বসে রয়েছে তরুণ ক্যাপটেন – তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখল ওদের নীল গাড়িটাকে।

ত্রিশ গজ এগোবার পর ডান পাশে পড়ল সরু প্যাসেজ, নাহার ভিলা ও থাই দূতাবাসের পিছন দিয়ে চলে গেছে। ঘাড় ফিরিয়ে শুধু দেখে রাখল থাই থান্ডারের সদস্যরা। ডানদিকে আরেকটা বাঁক ঘুরে থাই দূতাবাসের সামনে চলে এল তারা।

দূতাবাসের গেট খোলা। গেটের বাইরে তিনজন বাংলাদেশী পুলিশ একটা বেঞ্চে বসে আছে, হাতে রাইফেল। গেটের ভিতর দুজন থাই গার্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে, কাঁধ থেকে ঝুলছে কারবাইন, হিপ হোলস্টারে গোঁজা পিস্তল। এই থাই গার্ডদের সঙ্গে সিভিল ড্রেস পরা একজন থাই অ্যাটেনড্যান্ট গার্ড রুমের ভিতর একটা চেয়ারে বসে রয়েছে। হাতে কাগজ-পত্র নিয়ে বেশ কিছু লোক প্রায় ছেঁকে ধরেছে তাকে। গেটের বাইরে বেশ অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

নীল মাইক্রোবাসটা গেটের ঠিক সামনে থেমেছে। একজন থাই গার্ড এগিয়ে এল। তার হাতে একগাদা কাগজ ধরিয়ে দিল চক্রি চুয়ান । সবই নকল, তবে ধরবার উপায় নেই। ওগুলো পড়লে বোঝা যাবে তারা পাঁচজন থাই ব্যবসায়ী, দর ও দেনা-পাওনা নিয়ে বাংলাদেশী একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের বিরোধ চলছে, দূতাবাসের কমার্স সেক্রেটারির পরামর্শ ও সমাধান পাওয়ার আশায় এসেছে তারা। তারা যে আসবে, সেটা ভদ্রলোককে আগেই জানানো হয়েছে।

বিশ মিনিট পর গার্ডের কাছ থেকে নিয়ে কাগজগুলোর উপর চোখ বুলাল সিভিল ড্রেস পরা থাই অ্যাটেনড্যান্ট। ব্যাপারটা তার জানা আছে। চেয়ার ছেড়ে মাইক্রোবাসের পাশে এসে দাঁড়াল সে। 'হ্যাঁ, আপনাদের আসার কথা,' চুয়ানকে বলল সে। 'কিন্তু

www.MurchOna.com

কমার্স সেক্রেটারি তো চলে গেছেন। আপনারা দয়া করে কাল সকালে আসুন।'

মাথা নেড়ে হাসল চুয়ান। 'কমার্স সেক্রেটারির সঙ্গে ফোনে যা কথা হবার হয়ে গেছে আমাদের। এখন সরাসরি অ্যামব্যাসাডরের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

'কিন্তু তিনিও তো নেই, মিসেসকে নিয়ে ডিনার খেতে বেরিয়েছেন,' বলল অ্যাটেনড্যান্ট।

চুয়ানের মুখে হাসিটা আরও সরল ও বিনীত হয়ে উঠল। 'আমরা অপেক্ষা করব। তবে এই গাড়িতে বসে নয়।'

শ্রাগ করল অ্যাটেনড্যান্ট। একজন গার্ডকে ডেকে বলল, 'ওঁদেরকে ওয়েটিং রুমে পৌঁছে দাও।'

গার্ডের পিছু নিয়ে বাগানের ভিতর দিয়ে এগোল থাই থান্ডারের গ্রুপটা। দেশি-বিদেশি বেশ কিছু লোককে পাশ কাটাল তারা, ভাবল নিশ্চয়ই অ্যামব্যাসাডরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ওয়েটিং রুমেও কয়েকজন লোককে বসে থাকতে দেখা গেল। গার্ড ওদেরকে বসতে বলে ফিরে গেল গেটে।

একটু পর এক এক করে ওয়েটিং রুম থেকে বাগানে বেরিয়ে এল থাই থান্ডারের সদস্যরা। বাগানে লোকজন থাকলেও, বিশেষভাবে কেউ ওদেরকে লক্ষ করছে না। অলস পায়ে হাঁটতে হাঁটতে দালানটার পিছনদিকে চলে এল ওরা।

এদিকে প্রচুর গাছপালা, দুই দালানের পিছনদিকটাকে জঙ্গলের মত লাগছে দেখতে। দিনের বেলা পাঁচিল রঙ করবার কাজ হয়েছে, মই সহ বেশ কিছু সরঞ্জাম পড়ে থাকতে দেখল চুয়ান। তার ইঙ্গিত পেয়ে মইটাকে খাড়া করে পাঁচিলে উঠল সঙ্গীরা, তারপর সেটাকে সেতু বানিয়ে প্যাসেজ পেরুল, নাহার ভিলাতে নামলও ওটার সাহায্যে – তারপর শুইয়ে রাখল দেয়ালের গা ঘেঁষে।

নীচে নেমেই ব্রিফকেস খুলে মুখে গ্যাস-মাস্ক পরল ওরা।

গাছপালা ও ঘেরা বাগান পার হয়ে সার্ভেন্টস কোয়ার্টার। আধ বুড়ি এক চাকরানি দরজার দিকে পিছন ফিরে চৌকিতে বসে চুন লাগাচ্ছে পানে। তার মুখে হাতচাপা দিল চুয়ান, অপর হাতে ধরা হাইপডারমিক সিরিঞ্জের সুইটা ঘ্যাচ করে ঢুকিয়ে দিল বাহুতে। তিন সেকেন্ড ধস্তাধস্তি করল মহিলা, তারপর জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল চৌকির উপর। দু'ঘণ্টার আগে তার হুঁশ ফিরবে না।

দুই থাই থান্ডার গুণ্ডা ধরাধরি করে মেঝেতে নামাল অজ্ঞান মহিলাকে, পা দিয়ে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল চৌকির নীচে।

এরপর কিচেন। প্রৌঢ় বাবুর্চি ও তরুণী কাজের বুয়া রান্নার কাজে ব্যস্ত। পাঁচ বিদেশি ভিতরে ঢুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপর, গলা টিপে ধরায় কেউ কোনও শব্দ করতে পারছে না। হাত-পা ছুঁড়ল ঠিকই, তবে ওই মাত্র তিন সেকেন্ডের জন্য, যতক্ষণ না ইঞ্জেকশন কাজ শুরু করল। এদেরও দু-ঘণ্টার আগে জ্ঞান ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই। অসাড় দেহ দুটি একপাশে সরিয়ে রাখল ওরা, যেন বাইরে থেকে চট্ করে চোখে না পড়ে।

এরপর কিচেন হয়ে করিডরে বেরুল, গেস্ট রুম ও বেডরুমকে পাশ কাটিয়ে চলেছে লিভিং রুমের দিকে। একজন সহকারীকে নিয়ে সবার সামনে রয়েছে চক্রি চুয়ান। চুয়ানের এক হাতে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল, অপর হাতে গ্যাস বোমা। সহকারীর হাতে লম্বা চকচকে ছোরা। তুলো দিয়ে জড়ানো ক্লোরোফর্ম ভর্তি টিউবটা কোটের সাইড পকেটে রেখেছে সে, প্রয়োজনের সময় ঝট করে যাতে বের করতে পারে।

গেস্ট রুম ও বেডরুমের দরজা খোলা। পাশ কাটাবার সময় চুয়ান ও তার সহকারী ধানাই ঠাকুর দেখল গেস্ট রুম খালি। তারপর আধ সেকেন্ড সময়ও পাওয়া গেল না।

বেডরুম থেকে বেরিয়ে এসে ওদের একেবারে সামনে পড়ে গেলেন প্রফেসর ডক্টর শামসুন্নাহার, হাতে একটা অ্যালবাম। কালো সুট ও গ্যাস মাস্ক পরা এতগুলো সশস্ত্র মানুষকে হঠাৎ

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

সামনে দেখে আঁতকে উঠলেন তিনি, হাত থেকে পড়ে গেল অ্যালবামটা, নিজের অজান্তেই চিৎকার করতে যাচ্ছেন।

চুয়ান রিয়্যাক্ট করবার সময়ই পেল না। ছোরার এক কোপে ভদ্রমহিলার কণ্ঠনালী বিচ্ছিন্ন করে দিল তার সহকারী ধানাই ঠাকুর। মেঝেতে ঢলে পড়লেন তিনি, তাঁর সঙ্গে নিচু হয়ে পাশেই হাঁটু গাড়ল খুনি, উথলে বেরিয়ে আসা রক্তের ভিতর ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে ছোরার ফলাটা চালাচ্ছে এখনও। মুণ্ডুটা শরীর থেকে আলাদা না হওয়া পর্যন্ত থামল না সে।

অ্যালবামটা খুলে গেছে, শিশু শামসুন্নাহার ও নাদিরার সাদা ফ্রক রাঙা হয়ে উঠল তাজা রক্তে।

ডক্টর শামসুন্নাহারের পতন ও করিডরের মেঝেতে জুতোর ঘষা লাগায় বাড়ির নীরবতা ভেঙে গেছে। লিভিং রুম থেকে ডক্টর নাদিরার উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আপা? আপা, তুমি কি পড়ে গেলে নাকি?' কামরা থেকে বেরিয়ে আসছেন তিনি।

গল্প করতে করতে দুই প্রৌঢ়া নিজেদের শৈশবে ফিরে গেছেন। এক সময় শামসুন্নাহার বললেন, 'তুই বোস, পুরানো একটা ছবির অ্যালবাম নিয়ে আসি – আমার তখন দশ বছর বয়েস, তোর নয় মাস; তোকে আমি কোলে নিয়ে বসে আছি।'

হেসে উঠলেন নাদিরা। 'এত পুরানো ছবি কোথায় পেলে, আপা?'

'বলছি,' বলে লিভিং রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন শামসুন্নাহার। পাঁচ মিনিটও হয়নি, করিডর থেকে কিছু একটা পড়ে যাওয়ার আওয়াজ ভেসে এল। বোনকে ডাকলেন তিনি। কিন্তু কোনও সাড়া পেলেন না।

উদ্বিগ্ন হয়ে সোফা ছাড়লেন ডক্টর নাদিরা, দ্রুত লিভিং রুম থেকে করিডরে বেরুচ্ছেন।

তাঁর কণ্ঠস্বর ও পায়ের আওয়াজ শুনে এরইমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে চক্রি চুয়ানের সহকারী ধানাই ঠাকুর। একহারা কাঠামো তার, চোখে চশমা, চেহারায় আঁতেল ভাব। ছোরার ফলা থেকে টপ টপ করে রক্তের ফোঁটা ঝরছে। চট্ করে সেটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে লাফ দিয়ে লাশ ডিঙিয়ে চৌকাঠের পাশে দেয়াল ঘেঁষে সিধে হয়ে দাঁড়াল। কোটের সাইড পকেট থেকে ক্লোরোফর্মের টিউবটা বের করে ফেলেছে সে ইতিমধ্যেই।

টিউবের মাথায় ছোট্ট একটা বোতাম, সেটায় আঙুল রেখেছে ধানাই ঠাকুর। ঠিক এই সময় চোখে চশমাটা পরতে পরতে চৌকাঠ পেরিয়ে করিডরে বেরিয়ে এলেন ডক্টর নাদিরা। হাতের টিউবটা তাঁর মুখের দিকে তাক করে বোতামে চাপ দিল সে। কী ঘটছে বুঝতে না পারলেও, লোকগুলোর মুখে মাস্ক দেখে দম আটকাবার চেষ্টা করলেন ডক্টর নাদিরা, কিন্তু তার আগেই ফুসফুসে পৌঁছে গেছে ক্লোরোফর্ম। দুই কি তিন সেকেন্ড পর, তার বেশি নয়, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরা জ্ঞান হারালেন।

তাঁকে একটা চেয়ারে বসানো হলো। বন্ধ চোখ দুটো টেপ দিয়ে খোলা রাখার ব্যবস্থা করল ধানাই ঠাকুর। টেপের টুকরোগুলো ডক্টর নাদিরার গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে আছে। পোলারয়েড ক্যামেরা দিয়ে দ্রুত তাঁর একটা পাসপোর্ট সাইজ ফটো তুলল চক্রি চুয়ান। এই ফটো এখনই একটা জাল পাসপোর্টে সাঁটা হবে।

এরপর ধানাই ঠাকুরকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এল আরও দুজন। নামাজের ভঙ্গিতে মেঝেতে বসে ঊরুর উপর ব্রিফকেস রাখল একজন, দ্রুত হাতে সেটা খুলে বের করল অক্সিজেন মাস্ক, স্যালাইন ভর্তি ব্যাগসহ অন্যান্য সরঞ্জাম। আরেকজনের ব্রিফকেস থেকে বেরুল মিনি অক্সিজেন বটল। ডক্টর নাদিরাকে রোগিণী বানাবার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল তারা, শুধু একজন বাদে।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

কোটের পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে গালকাটা রুস্তমের মোবাইল নম্বরে ডায়াল করছে চক্রি চুয়ান ।

তিন

নাহার ভিলার গেটের বাইরে, আর্মারড কারের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাপটেন জাহিদ। চোখে উজ্জ্বল আলো পড়তেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। একটা গাড়ি বাঁক ঘুরছে এদিকে – তারই হেডলাইটের আলো।

গাড়ির ছাদে লাল-নীল ও সাদা আলোর বন্যা বইয়ে দিয়ে নাহার ভিলার দিকে অ্যামবুলেন্স চালাচ্ছে গালকাটা রুস্তম। গতি বেশি নয়, খানিক এগিয়ে হেডলাইটের আলো ডিপ করল, গার্ডরা যাতে নার্ভাস হয়ে না পড়ে।

অ্যামবুলেন্সের মন্থর গতি, ড্রাইভারের সতর্ক আচরণ সন্দিগ্ধ করে তুলল ক্যাপটেন জাহিদকে। 'সাবধান,' হাবিলদার কামরান ও সিপাই জব্বারের উদ্দেশে বিড়বিড় করল সে। আর্মারড কারের ড্রাইভিং সিটে বসা ড্রাইভারও নির্দেশ শুনে সতর্ক হয়ে উঠল।

ঠোঁটের নড়াচড়া দেখেই অ্যামবুলেন্সের ড্রাইভিং সিটে বসা গালকাটা রুস্তম বুঝে নিল কী বলল ক্যাপটেন।

নাহার ভিলার গেটের কাছাকাছি, আর্মারড কারের পিছনে অ্যামবুলেন্স থামাল সে, জানালা দিয়ে মাথা বের করে বাড়ির নেমপ্লেট পড়বার ভান করল, তারপর বলল, 'গাড়িটা দয়া করে সরাবেন, সার? আমাকে নাহার ভিলায় ঢুকতে হবে।'

দুই কোমরে হাত রেখে অ্যামবুলেন্সের পাশে এসে দাঁড়াল ক্যাপটেন জাহিদ, ডান হাতের আঙুলগুলো হিপ হোলস্টারে গুঁজে রাখা পিস্তলের বাঁট ছুঁয়ে আছে। 'কী বললেন? আবার বলুন।'

বিনয়ের সঙ্গে হাসল গালকাটা রুস্তম। 'নাহার ভিলা থেকে আমাদের অফিসে ফোন করা হয়েছে, সার। সিরিয়াস কেস, পেশেন্টকে ইমিডিয়েটলি ধানমণ্ডি ইবনে সিনা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।'

ভ্রূ কোঁচকাল ক্যাপটেন। 'স্ট্রেঞ্জ! বাড়ির ভেতর কে কখন অসুস্থ হলেন যে অ্যামবুলেন্স ডাকতে হবে?' ঘাড় ফিরিয়ে হাবিলদার ও সিপাইয়ের দিকে তাকাল সে। 'তোমরা কিছু জানো?'

'অসুস্থ? না!' হাবিলদারকে অত্যন্ত বিচলিত দেখাল। সিপাই হতভম্ব।

অ্যামবুলেন্স ড্রাইভারের দিকে ফিরল ক্যাপটেন। 'কোথাও ভুল করেছেন। আমরা অনেকক্ষণ হলো নাহার ভিলা পাহারা দিচ্ছি। বাড়ির কেউ অসুস্থ হলে প্রথমে আমাদেরকেই জানানোর কথা।'

'এই দেখুন, অফিস থেকে এই কাগজটা দিয়েছে আমাকে,' বলল গালকাটা রুস্তম, শার্টের বুক পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে বাড়িয়ে ধরল সে।

সেটা নিয়ে পড়ল ক্যাপটেন – 'হার্ট-অ্যাটাকের কেস। রোগিণীর জ্ঞান নেই। যত তাড়াতাড়ি পারো হসপিটালে পৌঁছে দিতে হবে।' নীচে নাহার ভিলার ঠিকানা।

'তাই তো।' চিন্তিত হয়ে উঠল ক্যাপটেন জাহিদ। 'আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি দেখছি,' বলে ঘুরল সে, তারপর ইঙ্গিতে হাবিলদারকে সাবধান করে বাড়ির ভিতর ঢুকল, তার পিছু নিল রাইফেলধারী সিপাই ও আর্মারড কারের ড্রাইভার।

ভিতরে ছোট্ট একটা গাড়িপথ, তবে বাঁক নিয়ে চোখের

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

আড়ালে চলে গেছে, দু'পাশে কেয়ারি করা বাগান। তারপর কয়েকটা ধাপের উপর সদর দরজা।

দরজায় নক করল ক্যাপটেন জাহিদ। সঙ্গে সঙ্গে কপাট খুলে গেল। চোখের পলকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল সশস্ত্র থাই থান্ডারের খুনিরা।

বয়স কম, বিপদ টের পেয়ে ক্যাপটেন জাহিদের শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। তার হাত ও পা ঝাপসা দেখাল, দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করা গেল না। কোত্থেকে আঘাতটা এল টেরই পায়নি, লাথি ও ঘুসি খেয়ে ছিটকে পড়ল থাই থান্ডারের দুজন সদস্য। পিস্তলের বাঁটে হাত চলে গেছে ক্যাপটেনের, আর এক সেকেন্ড সময় পেলে বিদেশী শত্রুদের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে সে।

কিন্তু তার আগেই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ট্রিগার টেনে দিল চক্রি চুয়ান। সাইলেন্সার থাকায় ঢব করে ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো শুধু, গেট থেকে কারও শুনতে পাওয়ার কথা নয়। লাশটা পাকা মেঝেতে পড়ে যাওয়ার আগেই ধরে ফেলা হলো।

একই সঙ্গে মারা গেল আর্মারড কারের ড্রাইভারও। গলায় ছুরি চালিয়ে তাকে জবাই করেছে ধানাই ঠাকুর।

ঠিক দুই মিনিট পর হাবিলদার শুনতে পেল তার নাম ধরে ডাকছে সিপাই। 'হাবিলদার সাব, অ্যামবুলেন্স আসতে দিন। আপনিও চলে আসেন, এখানে কাজ আছে,' বাড়ির সদর দরজা থেকে কথা বলছে সিপাই, তার শিরদাঁড়ায় পিস্তলের মাজল ঠেকিয়ে রেখেছে ধানাই ঠাকুর।

সিপাই জব্বারের ডাক শুনে এক কি দু'সেকেন্ড ইতস্তত করল হাবিলদার কামরান। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে গালকাটা রুস্তমকে ইঙ্গিত করল গেট দিয়ে ভিতরে ঢোকার, নিজেও গাড়ি পথ ধরে এগোচ্ছে দ্রুত পায়ে।

বাঁকের কাছে, গাছপালার আড়ালে, ছুরি হাতে তাকে জবাই করবার জন্যে অপেক্ষা করছে চক্রি চুয়ান। লম্বা-চওড়া হাবিলদার ঠিক যখন পাশ কাটাচ্ছে তাকে, ঝোপের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল সে। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে চোখের পলকে নাগালের বাইরে চলে গেল টার্গেট।

ঝোপের পাতা নড়ে ওঠা মাত্র স্যাঁৎ করে এক পাশে সরে গিয়ে কারাতের আক্রমণাত্মক একটা ভঙ্গি নিল হাবিলদার কামরান, পরমুহূর্তে ফ্লাইং কিক মেরে গুঁড়িয়ে দিল চক্রি চুয়ানের ছোরা ধরা বাম হাতের কবজি। ওটায় জড়ানো ছিল প্ল্যাটিনামের তৈরি একটা ব্রেসলেট, হুক খুলে যাওয়ায় ছিটকে অন্ধকার ঝোপের ভিতর গিয়ে পড়ল সেটা।

শেষ রক্ষা হলো না, আচমকা ছুটে এসে অ্যামবুলেন্সটা চাপা দিল হাবিলদারকে। গাড়ির ধাক্কায় প্রথমে ছিটকে পড়ল সে। পরমুহূর্তে একটা চাকা তার মাথার উপর উঠে পড়ল। খুলি ফেটে মগজ বেরিয়ে পড়ায় মৃত্যু হলো প্রায় তৎক্ষণাৎ।

এরপর সিপাই জব্বারের মাথার পিছনে একটা গুলি করল ধানাই ঠাকুর, লাশটা ধরে ফেলল মেঝেতে পড়ার আগেই, শুইয়ে দিল দরজার গোড়ায়।

ইতিমধ্যে অ্যামবুলেন্স ঘুরিয়ে নিয়েছে গালকাটা রুস্তম। সেটা থেকে স্ট্রেচারটা বের করে নিয়ে আবার বাড়ির ভিতর ঢুকল থাই থান্ডারের খুনিরা। এক মিনিট পরেই বেরিয়ে এল তারা, স্ট্রেচারে শুয়ে রয়েছেন অচেতন ডক্টর নাদিরা, মুখে অক্সিজেন মাস্ক, হাতের শিরায় ঢোকানো স্যালাইন পুশ করবার সুই।

ইতিমধ্যে থাই থান্ডারের পাঁচ মাফিয়া সদস্য যে যার ব্রিফকেস থেকে বের করে ডাক্তার, মেইল নার্স ও আরদালির ড্রেস পরে নিয়েছে আবার। 'ইয়েস, কাটা রুস্তম, ইয়েস!' বলল চক্রি চুয়ান, ভাঙা কবজির ব্যথা সহ্য করবার জন্য দাঁতে দাঁত চেপে আছে সে। 'গাড়ি ছাড়ুন!'

অ্যামবুলেন্স নিয়ে নাহার ভিলা থেকে বেরিয়ে এল গালকাটা রুস্তম। কিছু দূর আসবার পর সাইরেন অন করল সে, ফুলস্পিড

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

তুলে ছুটছে এয়ারপোর্টের দিকে।

জিয়া বিমানবন্দর।

থাই থান্ডারের প্রথম গ্রুপ ঘড়ির কাঁটা ধরে রাত ঠিক আটটা পনেরো মিনিটে অ্যাকশনে গেল। তার আগে সবাই গ্যাস মাস্ক পরে নিয়েছে।

হ্যাঙ্গারটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে তিন সিপাইয়ের দুটো গ্রুপ। প্রতিবার চক্কর দিতে সময় লাগছে দশ মিনিট। এক গ্রুপ ঘুরে যাওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাচ্ছে দ্বিতীয় গ্রুপ। এই মাত্র বাঁক ঘুরে চোখের আড়ালে চলে গেল টহলদার প্রথম গ্রুপ। ঠিক পাঁচ মিনিট পর এখান দিয়ে যাবে দ্বিতীয় গ্রুপ।

হ্যাঙ্গারের গেটে পাহারা দিচ্ছে দুই সিপাই। ধরা-বাঁধা কোনও নিয়ম নেই, যখন খুশি নিজের তাঁবু থেকে বেরিয়ে জিপ নিয়ে নিজেও এক চক্কর ঘুরে আসছেন মেজর খোদা বক্স। বাকি সিপাইরা তাঁবুর ভিতরে শুয়ে-বসে আছে। তাদের সঙ্গেই রয়েছে হাবিলদার।

আটটা আঠারো মিনিটেও এরকম একবার বেরুলেন মেজর খোদা বক্স। কোণ ঘুরে তাঁর জিপ হ্যাঙ্গারের আড়ালে চলে গেছে, এই সময় টিম লিডার তাইম আনন্দের নির্দেশে থান্ডার খুনিদের একজন একটা গ্যাস বোমা ছুঁড়ল হ্যাঙ্গারের বিশ গজ বাম দিকে, দ্বিতীয় তাঁবু লক্ষ্য করে।

তাঁবুর ভিতর এই মুহূর্তে হাবিলদার সহ তিন সিপাই খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করছে, পটকা ফাটার মত আওয়াজ শুনে পলকের জন্য স্থির হয়ে গেল তারা। পরমুহূর্তে যে-যার অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল। তবে কারও আঙুলই অস্ত্রের নাগাল পেল না, অদৃশ্য গ্যাস ফুসফুসে ঢোকা মাত্র জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল তারা।

বিশ গজ দূর থেকে দ্বিতীয় তাঁবুর সিপাইদেরকে কাত হয়ে পড়ে যেতে দেখল তাদের দুই সঙ্গী, যারা হ্যাঙ্গারের মুখে পাহারা দিচ্ছে। কিছু না ভেবেই সাহায্যের জন্য ছুটল তারা। ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে গ্যাস – মাত্র পাঁচ কি সাত গজ এগোতে পারল ওরা, তারপর কিছু বুঝে ওঠার আগে ফুসফুসে বিষ নিয়ে জ্ঞান হারাল।

আরও দুই মিনিট পর প্রথম টহল পার্টি ও মেজরকে প্রায় একই সঙ্গে ফিরে আসতে দেখল থান্ডাররা। জিপটা শম্বুকগতিতে চালাচ্ছেন মেজর, তিন সিপাই জিপের পিছু নিয়ে হেঁটে আসছে। হ্যাঙ্গারের মুখ থেকে ত্রিশ গজ দূরে এখনও, এই সময় পরপর দুটো নার্ভ গ্যাস ছুঁড়ল ফিবুন সংগত। একটা জিপ লক্ষ্য করে, অপরটা জিপের গজ দশেক পিছনের টহল পার্টিকে লক্ষ্য করে।

সম্ভবত ষষ্ঠইন্দ্রিয় সতর্ক করে দেওয়ায় নিজের অজান্তেই সাবধান ছিলেন মেজর। গ্যাস বোমাটা অর্ধেক পথও পেরোয়নি, তাঁকে লক্ষ্য করে কিছু একটা ছোঁড়া হয়েছে বুঝতে পেরে জিপের ড্রাইভিং সিট থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন তিনি, হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তলটা।

টারম্যাক ধরে আগের মতই মন্থর গতিতে এগোচ্ছে জিপ। টিম লিডারের ইঙ্গিত পেয়ে থাই ড্রাগনের একজন ছুটল ওটার দিকে। লাফ দিয়ে ড্রাইভিং সিটে উঠল সে। হ্যাঙ্গারের হাঁ করা প্রকাণ্ড মুখটাকে পাশ কাটিয়ে তাঁবু দুটোর দিকে যাচ্ছে জিপ।

টারম্যাকে নেমে পড়ার আগেই মেজরের কানে এসেছে মৃদু একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ। দুটো গড়ান দিয়ে এক ঝটকায় সিধে হলেন। চমকে উঠে দেখলেন তাঁর পাঁচ হাত সামনে হাতির শুঁড়ের মত দেখতে গ্যাস মাস্ক পরা এক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতের সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা তাঁর দিকে তাক করা। দম আটকে রেখে চট্ করে হাঁটু গাড়লেন টারম্যাকে, ডান হাতে বেরিয়ে এসেছে তাঁর সার্ভিস রিভলভার।

'দুপ!'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

সোজা এসে হৃৎপিণ্ডে ঢুকল তপ্ত সীসা। চমকে উঠলেন মেজর, মাথাটা নিচু হয়ে গেল, দেখলেন টারম্যাকটা উঠে আসছে তাঁর দিকে। ঠাস করে শব্দ হলো কপালটা ঠুকে যাওয়ায়, পরমুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল জগৎটা। কাত হয়ে ঢলে পড়ে গেলেন টারম্যাকে।

জিপের দশ গজ পিছনে থাকা তিন সিপাই কিছু বুঝে ওঠার আগেই গ্যাসের প্রভাবে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

টহলে রয়েছে আর তিনজন সিপাই।

সহকারী টিম লিডার হো টাকসিন হ্যাঙ্গারের মুখ থেকে কিছুটা এগিয়ে গেল, সঙ্গে ফিবুন সংগত। তিনজোড়া বুটের আওয়াজ এগিয়ে আসছে শুনে হ্যাঙ্গারের গা ঘেঁষে টারম্যাকের উপর শুয়ে পড়ল দুজনেই।

একটু পরেই হ্যাঙ্গারের কোণ ঘুরে প্রহরীদের গ্রুপটাকে এগিয়ে আসতে দেখল হো টাকসিন। নিচু গলায় ফিবুন সংগতের কাছ থেকে একটা গ্যাস বোমা চেয়ে নিল সে। বিশ গজের মধ্যে চলে আসতে সিপাইদের লক্ষ্য করে ছুঁড়ল সেটা।

চোখের কোণ দিয়ে এক সিপাই দেখল, টারম্যাকের মেঝে থেকে কারও হাত কিছু একটা ছুঁড়েছে। 'সাবধান!' অভ্যাসবশত হুঁশিয়ার করল সে, দৌড় দিল সামনের দিকে। পটকা ফাটার মত মৃদু একটা শব্দ ঢুকল কানে। পরমুহূর্তে টারম্যাকের পাকা মেঝেতে আছড়ে পড়ল তার অচেতন শরীর।

কী হচ্ছে কারও কোনও ধারণা নেই, অপর দুজন সিপাই ছুটে পালাবার চেষ্টা করল। যেদিকে ছুটল সেদিকে অদৃশ্য নার্ভ গ্যাস এখনও ছড়ায়নি, স্লো মোশনে তিন কি চার পা এগোতে পারল মাত্র। তাদের জন্য দুজন থাই তৈরি হয়ে আছে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল নিয়ে। ঢব ঢব ভোঁতা আওয়াজ হলো দুটো। সব শেষ।

যারা মারা গেছে ও যাদের জ্ঞান নেই, কোনও রকম বাছবিচার না করে সবাইকে পণ্য ভর্তি বস্তার মত গাদাগাদি করে তোলা হলো ছাদ-খোলা জিপে – জ্যান্ত মানুষের উপর লাশের স্তূপ তৈরি হলো। সেই স্তূপে সওয়ার হলো চার থাই থান্ডার সদস্য। বাকি একজন, টিম লিডার তাইম আনন্দ, ড্রাইভিং সিটে বসেছে। জিপ ছেড়ে দিল সে। ঢুকে পড়ল হ্যাঙ্গারের ভিতর।

এখনও ক্রুদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। জিপ থামিয়ে হাঁটুর উপর হ্যাঙ্গারের একটা নকশার ভাঁজ খুলল টিম লিডার তাইম আনন্দ, সেটার সঙ্গে হ্যাঙ্গারের ভিতরের দৃশ্যের হুবহু মিল দেখতে পাচ্ছে সে। ঈগল দুটোকে একই সরলরেখার উপর রাখা হয়েছে, মাঝখানে বিশ গজের মত ব্যবধান।

ডেভেলপ করা ঈগল রয়েছে A সেকশনে, অর্থাৎ সামনের দিকে, দরজার দিকে মুখ করে। অপর ঈগল রয়েছে B সেকশনে, প্রথমটার পিছনে।

জিপের ইঞ্জিন খুব কম আওয়াজ করছে, ফলে বেইজিং থেকে আসা ক্রুরা একেবারে শেষ মুহূর্তে টের পেল, যখন আর কিছুই করবার নেই। A সেকশনে রয়েছে তারা, ডেভেলপ করা ঈগলের পিছন দিকে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সামনে চলে আসছে তিনজনই, ভাবছে মেজর খোদা বক্স নিশ্চয়ই কোনও জরুরি বিষয়ে আলাপ করতে চান।

আরেকটু এগোতেই কয়েকটা সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তলের মুখে পড়ে গেল তারা। হো টাকসিন কোনও আওয়াজ করতে নিষেধ করল তাদেরকে। জিপ থেকে নেমে পঞ্চাশ গজ হেঁটে হ্যাঙ্গারের দরজার কাছাকাছি ফিরে গেল টিম লিডার তাইম আনন্দ। স্মোক স্ক্রিন তৈরি করবার জন্য একটা বোমা ফাটাল সে। মুহূর্তে ঘন ধোঁয়া আড়াল করল এপাশের সমস্ত কার্যকলাপ।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে বিমানবন্দরের আরেক প্রান্ত দিয়ে টারম্যাকে ঢুকল সেই অ্যামবুলেন্সটা, চালিয়ে আনছে গালকাটা রুস্তম। অজ্ঞান ডক্টর নাদিরাকে নিয়ে গাড়ির ভিতর রয়েছে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

ডাক্তার, নার্স ও আরদালির ড্রেস পরা থাই থান্ডারের দ্বিতীয় গ্রুপটা। চিফ চক্রি চুয়ানের নির্দেশে ফ্লাইং অ্যামবুলেন্সের দিকে ছুটছে ওটা।

ওদিকে গাঢ় ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেছে স্পেশাল হ্যাঙ্গারের ভিতরটা। একের পর এক অনেকগুলো বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল টার্মিনাল-ভবন থেকে। দশ মিনিট পর বেজে উঠল কান ফাটানো ফায়ার অ্যালার্ম। ইতিমধ্যে স্মোক-স্ক্রিনের ধোঁয়া অনেক হালকা হয়ে এসেছে, তার ভিতর কমলা আগুনের লকলকে শিখা অনেক দূর থেকেও দেখতে পেল এয়ারপোর্ট ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ফায়ার অ্যালার্ম বাজার সঙ্গে সঙ্গে পানি ও ফোম নিয়ে রওনা হয়েছে তারা। তাদের পিছু নিয়ে জিপ ও কার নিয়ে ছুটে আসছে পাইলট ও গ্রাউন্ড টেকনিশিয়ানদের কয়েকটা গ্রুপ।

টার্মিনাল ভবন ও কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে লাউডস্পিকারে বার বার সংশ্লিষ্ট বিমানগুলোর পাইলট ও ক্রুদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে, আগুন ছড়িয়ে পড়বার আগেই যে যার প্লেন নিয়ে যেন আকাশে উঠে পড়ে।

এয়ারপোর্টের চারদিকে অনেকগুলো প্লেন ছিল, একের পর এক আকাশে উঠে যাচ্ছে সব, সেগুলোর মধ্যে গায়ে ক্রসচিহ্ন আঁকা এবং মাউন্ট এলিজাবেথ ফ্লাইং অ্যাম্বুলেন্স লেখা প্লেনটাও রয়েছে, কাগজ-পত্র অনুসারে রোগিণীকে নিয়ে সিঙ্গাপুরে ফিরে যাবে ওটা।

তবে ওই ফ্লাইং অ্যাম্বুলেন্স আকাশে ওড়ার আগে থাই ক্রুরা ওটার গা থেকে ক্রসচিহ্ন ও হাসপাতালেন নাম লেখা তুলে নিয়েছে। পুরু একটা কাগজের উপর এঁকে ও লিখে প্লেনের গায়ে সেঁটে রাখা হয়েছিল ওটা, খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখলেও কিছু বোঝার উপায় ছিল না।

কাগজটা সরিয়ে ফেলতে নীচের লেখাগুলো বেরিয়ে পড়েছে:

BLUE BIRD AIRWAYS.

এয়ারপোর্টের দূর প্রান্তের স্পেশাল হ্যাঙ্গারের পিছনের গেট দিয়ে চারটে প্লেন নিরাপদেই বেরিয়ে এল, একে একে উড়ে গেল আকাশে। ওগুলোর মধ্যে একটা ঈগলও রয়েছে।

স্মোক-স্ক্রিনের ধোঁয়া সরে যাওয়ায় হ্যাঙ্গারের ভিতর এখন শুধু একটা ঈগলকে দেখতে পাচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। A সেকশনে আগুনের একটা প্রকাণ্ড বল এখন ওটা, দাউ দাউ করে জ্বলছে। ভিতরে এত বেশি বিস্ফোরক ছিল যে আগুন নেভার পর ছাই ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাবে না কেউ। ছাইয়ে পরিণত হচ্ছে ওটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সামরিক বাহিনীর একটা জিপও। ওটার দশ-বারোজন আরোহীও পুড়ছে, জ্যান্ত ও মরা একসঙ্গে।

ফুয়েল পুড়ে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা কোনওভাবেই A সেকশনের আগুনটা নেভাতে পারল না। পঁয়তাল্লিশ মিনিট ফোম ছিটাবার পর আগুন নিভল বটে, কিন্তু ঈগলটার কোনও কিছুই অবশিষ্ট পাওয়া গেল না, ইস্পাত পর্যন্ত গলে গেছে। একই অবস্থা আরোহী সহ মেজর খোদা বক্সের জিপটারও।

ইতিমধ্যে টার্মিনাল ভবন ও কন্ট্রোল টাওয়ারে এয়ারপোর্ট আর সেনাবাহিনীর সিকিউরিটি অফিসাররা ভিড় করেছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে হোটেল থেকে আসা চিনা ক্রুদের অপর গ্রুপটাও। আগুন নেভার খবর পেয়ে সবাই স্পেশাল হ্যাঙ্গারের ক্ষয়ক্ষতি দেখতে গেল।

চিনা ক্রুরা হতভম্ব হয়ে দেখল, A সেকশনে যে ঈগলটা নিয়ে কাজ করছিলেন ডক্টর নাদিরা, সে-জায়গায় পড়ে আছে গলে যাওয়া অ্যালয় ও ইস্পাতের স্তূপ, দেখে বোঝার উপায় নেই, কিছুক্ষণ আগেও ওটা একটা প্লেন ছিল। এমনকী হ্যাঙ্গারের মেঝে পর্যন্ত পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে।

আগুন লাগবার প্রায় এক ঘণ্টা পর কন্ট্রোল টাওয়ারের অল

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

ক্লিয়ার সিগনাল পেয়ে এক এক করে কয়েকটা প্লেন ফিরে এল টারম্যাকে। চার-পাঁচটা প্লেন চট্টগ্রাম ও কোলকাতায় চলে গেছে। ফিরে আসা জেটগুলোর মধ্যে B সেকশনের সেই ঈগলটাও আছে, বাকি প্লেনগুলোর মত ওটাকেও এতক্ষণ এয়ারপোর্টকে ঘিরে বিরাট বৃত্ত রচনা করে চক্কর দিতে দেখেছেন এয়ারপোর্ট ও সেনাবাহিনীর সিকিউরিটি অফিসাররা। তাঁরা ধরে নিলেন, নিজেদের ঈগল জ্বলছে দেখে চিনা ক্রুদের প্রথম গ্রুপটাই বাঁচাবার জন্য ওটাকে আকাশে তুলেছিল।

ঈগলটা ল্যান্ড করল আগুন লাগা স্পেশাল হ্যাঙ্গারের কাছ থেকে অনেকটা দূরে।

চিনা ক্রুদের দ্বিতীয় গ্রুপ ল্যান্ড করা ঈগলের দিকে হনহন করে এগোল, প্রথম গ্রুপের সঙ্গে কথা বলে জানতে চেষ্টা করবে হ্যাঙ্গারের ভিতর ঠিক কী ঘটেছিল, কীভাবে আগুন ধরল। কারণ, ওরাই তো প্রত্যক্ষদর্শী, আগুন লাগবার সময় হ্যাঙ্গারের ভিতর ছিল।

কিন্তু ঈগলটার কাছে এসে কাউকেই ওরা দেখতে পেল না। না বাইরে, না ভিতরে।

চারদিকে খবর পাঠানো হলো। লাউডস্পিকার থেকে বলা হলো, ঈগল নিয়ে সদ্য নেমে আসা চিনা ক্রুরা যেন কন্ট্রোল টাওয়ারে উপস্থিত সেনাবাহিনী অথবা এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি অফিসারকে রিপোর্ট করে।

আরও এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল। সিকিউরিটি কর্মকর্তারা অস্থির হয়ে উঠলেন। চিনা ক্রুদের প্রথম গ্রুপটার কোনও খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না – এয়ারপোর্টের কোথাও নেই ওরা, নিজেদের হোটেলেও ফিরে যায়নি।

আগুন লাগার পর দেড় ঘণ্টা পার হতে চলেছে। ডেভেলপ করার কাজ চলছিল যেটায়, সেই ঈগল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে; এই খবরটা সবচেয়ে আগে যাঁকে দেওয়ার কথা, এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির অফিস থেকে এতক্ষণে তাঁকে ফোন করা হচ্ছে।

কিন্তু ফোনে ডক্টর নাদিরাকে পাওয়া গেল না – না তাঁর ক্যান্টনমেন্টের বাড়িতে, না তাঁর বোন ডক্টর শামসুন্নাহারের বনানীর বাড়িতে। রিসিভারই তুলছে না কেউ।

দু'এলাকার থানাকে খবর নিতে বলা হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে জানা হয়ে গেল সব। বনানীর নাহার ভিলায় পাওয়া গেল ডক্টর শামসুন্নাহার ও সৈনিকদের লাশ। তিন চাকর-চাকরানীর জ্ঞান ফিরল দু'আড়াই ঘণ্টা পর। কিন্তু জেরার উত্তরে কিছুই তারা বলতে পারল না।

তদন্তের শুরুতেই জানা গেল নাহার ভিলার ঠিক পিছনেই রয়েছে থাই দূতাবাস, একটা নীল মাইক্রোবাসে চড়ে দূতাবাসপ্রধানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল পাঁচজন থাই ব্যবসায়ী। তাদেরকে দূতাবাসের ভিতর ওয়েটিং রুমে বসানো হয়েছিল।

পরে ওই পাঁচ থাইয়ের খোঁজ করা হয়। কিন্তু কোথাও তাদেরকে দেখা যায়নি। মাইক্রোবাসটা অবশ্য দূতাবাসের বাইরে রয়েই গেছে। তদন্তে জানা গেল, একটা নাম করা রেন্ট-আ-কার কোম্পানির গাড়ি ওটা, ভাড়া করেছিল শাহিন নামে সুদর্শন এক তরুণ। তরুণের ঠিকানায় গিয়ে জানা গেল শাহিন নামে সেখানে কেউ থাকে না।

পুলিশ, সিআইডি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স উপসংহারে পৌঁছাল, নিশ্চয়ই কুখ্যাত কোনও থাই অপরাধী চক্র ধরে নিয়ে গেছে ডক্টর নাদিরাকে। সেই সঙ্গে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে তাঁর সাধনার ফসল দুরন্ত ঈগলকে।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

চার

দুদিন পর। থাইল্যান্ড। দোই ইনথানন।

মায়ানমার সীমান্ত সংলগ্ন এই পাহাড়শ্রেণী মাইলের পর মাইল বিস্তৃত। আজ সকাল থেকে একটানা চেষ্টা করে আড়াই হাজার ফুট ওঠার পর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ইমরুল কায়েস, রানা এজেন্সির ব্যাংকক শাখার প্রধান। এই মুহূর্তে একটা পাথরের উপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছে ও।

কায়েসের অনেকদিনের ইচ্ছে দোই ইনথাননের চূড়ায় উঠবে। এক হপ্তার ছুটি পাওনা ছিল, দরখাস্ত লিখে ঢাকায় পাঠিয়ে দিতেই মঞ্জুর হয়ে গেল সেটা। এই সুযোগটাই কাজে লাগাচ্ছে ও। সহকারী লাবণী সামাদকে অফিসের দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ব্যাংকক থেকে একাই চলে এসেছে পাঁচশো মাইল দূরে, দোই ইনথাননের কোলে। হেলিকপ্টার সার্ভিস থাকায় মাত্র আড়াই ঘণ্টা সময় লেগেছে তার আসতে।

ওর থাই প্রেমিকা মোহনার কাছে গোটা ব্যাপারটা গোপন রেখেছে কায়েস। কারণ, বললে সে-ও ওর সঙ্গে আসবার জন্য জিদ ধরত। ওর মত তারও ভারি শখ দোই ইনথাননের চূড়ায় উঠবে। কিন্তু বিশেষ একটা কারণে তাকে পাহাড়ে উঠতে দিতে রাজি নয় কায়েস। না, সেরকম কোনও ঝুঁকি তাকে নিতে দিতে পারে না ও।

কাল সকাল থেকে এই পাহাড়ে রয়েছে ও। কাল ও আজ মিলিয়ে পাঁচ হাজার ত্রিশ ফুট উঠতে পেরেছে।

দোই ইনথাননই থাইল্যান্ডের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়, আট হাজার পাঁচশো ত্রিশ ফুট উঁচু। চূড়ায় পৌঁছাতে হলে এখনও দুই হাজার পাঁচশো ফুট উঠতে হবে। এদিকে লোকজন থাকার কথা নয়, অন্তত অনেকক্ষণ হলো কারও সাড়া-শব্দ পাচ্ছে না ও।

ঘড়িতে এখন থাই সময় দুপুর দুটো, পথ হারিয়ে না ফেললে দিনের আলো থাকতে থাকতে চূড়ায় ওঠা হয়তো সম্ভব, কিন্তু নামতে নির্ঘাত সন্ধে পার হয়ে যাবে। মনে পড়ল আজ সন্ধ্যা সাতটায় ওর ব্যাংকক স্যুইটে এসে বসে থাকবে মোহনা। তার সঙ্গে সেরকমই কথা হয়ে আছে। প্রিয়জনকে না জানিয়ে এত দূরে একা চলে আসবার অপরাধ খণ্ডন করবার জন্য তাকে অন্তত একটা ফোন তো করতে হবে, নাকি!

কায়েসের ওঠার গতি অত্যন্ত ধীর। পাঁচ-সাত ঘণ্টার দূরত্ব পার হতে তিন গুণ বেশি সময় লেগে যাচ্ছে।

দেরি হওয়ার অবশ্য একাধিক কারণ আছে। রহস্যময় কী যেন একটা ব্যাপার আছে এই পাহাড়ে। ওঠার পথে কয়েকটা পাহাড়ী বসতিতে আগুন জ্বলতে দেখেছে কায়েস, বসতির থাই বাসিন্দারা আতঙ্কে দিশেহারা, কারণ আগুন লাগার কোনও কারণই তারা ধরতে পারছে না। ওকে তারা কিছু অগ্নিদগ্ধ গাছপালা দেখিয়েছে, ওগুলো নাকি ওদের চোখের সামনে বিনা বজ্রাপাতে, বিনা কারণে হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে।

তা ছাড়া, পাহাড়ী এই ট্রেইল কায়েস চেনে না, ফলে প্রায়ই পথ হারিয়ে ফেলছে। দেরি হওয়ার আরেকটা কারণ, আশপাশে চিনা লোকজনের উপস্থিতি টের পেলে সরে গিয়ে অন্য পথ ধরতে

www.MurchOna.com

হচ্ছে ওকে। কারণ হুমকিটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ওর।

সরকার অনুমোদিত, অর্থাৎ রেজিস্টার্ড গাইড ছাড়া দোই ইনথাননের মূল চূড়ায় ওঠা নিষেধ। কারণটা আর কিছু নয়, থাই পর্যটন মন্ত্রণালয় চায় না ট্যুরিস্টরা পথ হারিয়ে কোনও রকম বিপদে বা দুর্ঘটনায় পড়ুক।

কাল সকালে এই নিয়ম পালন করতে গিয়েই গুণ্ডা টাইপের কয়েকজন চিনার সঙ্গে লেগে গেছে কায়েসের।

সরকারী বেস ক্যাম্পের আশপাশেই ঘোরাফেরা করে গাইডরা। ওর মত আরও কিছু লোক শখ করে পাহাড়ে চড়তে এসে তাদের খোঁজ করছিল। কিন্তু একজন গাইডকেও পাওয়া যায়নি।

কাছেপিঠে পুলিশের কিছু সিপাইকে দেখা গেছে, প্রথমে তারা ট্যুরিস্টদের প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, তারপর কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে শুনতে না পাওয়ার ভান করে ওখান থেকে সরে গেছে। অবাক কাণ্ড!

পাহাড়ে চড়তে আসা লোকের ভিড় ধীরে ধীরে বাড়ছিল। হঠাৎ কোত্থেকে একদল চিনা এসে সবাইকে লক্ষ্য করে বলল: বিশেষ কারণে স্থানীয় প্রশাসন দুই মাসের জন্য দোই ইনথানন পাহাড়ে ওঠা নিষিদ্ধ করেছে, কাজেই আপনারা চলে যান।

থাইল্যান্ডে প্রচুর চিনা বাস করে, জানা আছে কায়েসের। তাই ওদেরকে দেখে অবাক হয়নি ও। তবে অবাক হয়েছে থাই লোকজনের অভাব দেখে।

এক ভারতীয় ট্যুরিস্ট ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছেন, কাগজে কিছু ছাপা হয়নি, টিভির নিউজেও কিছু বলেনি, তা হলে কী করে বুঝব নিষিদ্ধ করা হয়েছে?

কায়েস জানতে চেয়েছে, বিশেষ কারণটা কী।

ব্যস, মারমুখো হয়ে উঠেছে চিনারা। হুমকি দিয়ে বলেছে, এই মুহূর্তে বেস ক্যাম্প ছেড়ে না গেলে পরে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না।

কথাটা শুনে নিজের উপর রাগ হয়েছে কায়েসের, পিস্তলটা সঙ্গে করে আনেনি বলে। তবে একটু পরেই বুঝল, না এনে ভালই করেছে।

সেই ভারতীয় ভদ্রলোক তাদের হুমকি অগ্রাহ্য করে পাহাড়ে ওঠার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, ইঙ্গিতে কায়েসকে পিছু নিতে বলে উঠতেও শুরু করে দিলেন তিনি। চিনাদের আসল চেহারা বেরিয়ে এল ঠিক তখনই। তিন-চারজন একযোগে শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে, পাঁচ-সাতটা ফাঁকা আওয়াজ করে জানিয়ে দিল তাদের কথা অমান্য করা হলে পরিণতি সত্যি ভাল হবে না।

ভারতীয় ভদ্রলোকসহ বাকি সবাই ভয় পেয়ে দ্রুত বেস ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেছেন। কায়েসও কিছু দূর পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে ছিল, কিন্তু বেস ক্যাম্প চোখের আড়ালে হারিয়ে যেতেই আরেক দিক থেকে পাহাড়ে চড়তে শুরু করেছে ও। পাহাড়ে দু'দিন কাটাবার জন্য যা যা লাগার কথা সবই আছে সঙ্গে, কাজেই জানে, ওর কোনও সমস্যা হবে না।

তা হচ্ছেও না। তবে পাহাড়ে উঠতে দিতে না চাওয়ার পিছনে কী কারণ থাকতে পারে সেটা এখনও কায়েসের বোধগম্য হচ্ছে না। প্রশ্নটা খোঁচাচ্ছে ওকে।

গুণ্ডাগুলোকে কুখ্যাত টং-এর লোক বলে মনে হয়েছে ওর। প্রচুর সংখ্যায় চিনা যেখানে থাকবে, টং-এরও সেখানে শাখা গজাবে। সে যাই হোক, ভাবল কায়েস, অকারণে কিংবা সামান্য কারণে ওদের ওরকম সিরিয়াস হয়ে ওঠার কথা নয়।

দশ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা হলো কায়েস। এবং অন্যমনস্ক থাকায় পথ ভুল করল। সরু ট্রেইল ধরে মিনিট কয়েক হাঁটার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো ওকে। কারণ সামনে ট্রেইলের আর কোনও অস্তিত্বই নেই। ভ্রূ কুঁচকে এদিক ওদিক

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

তাকাচ্ছে, ডানদিকে পাহাড়প্রাচীরের গায়ে একটা ফাঁক দেখতে পেল।

পাথুরে জমিনের আঁকাবাঁকা ফাটলে কিছু কাঁটা-ঝোপ জন্মেছে, সেগুলো টপকে সেদিকে এগোল কায়েস। বিশ-ত্রিশ গজ এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়াতে হলো ওকে। সামনে আর কিছু নেই, ঝপ করে নেমে গেছে পাহাড়ের গা।

অনেক নীচে সবুজ উপত্যকা দেখা যাচ্ছে, ঘন বনভূমিতে ঢাকা। সবুজ সেই চাদরের গায়ে রোদ লাগায় কী যেন একটা ঝিক্ করে উঠল। গলায় ঝুলছে বিনকিউলার, দু-হাতে ধরে সেটাকে চোখে তুলল ও।

বহুদূরে একটা নদী দেখা যাচ্ছে। ওটা নিশ্চয়ই পিং নদী, ব্যাংকক হয়ে সাগরে গিয়ে পড়েছে। তারপর, বনভূমির মাঝখানে, বিশাল একটা দুর্গ দেখতে পেল কায়েস। কিন্তু রোদ লাগায় ঝিক করে উঠল কী ওটা?

হঠাৎ চমকে উঠল কায়েস। এ কী সর্বনাশ! এ তো কল্পনারও অতীত! হায় হায়, এখন কী হবে?

নিশ্চয়ই ভুল দেখছি, ভাবল সে। চোখ রগড়ে আবার তাকাল।

না, সেই একই দৃশ্য দেখতে পেল – সরাসরি নীচের উপত্যকায়, গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে একটা জেট প্লেন; ধূসর সবুজ রঙের প্লেনটার গায়ে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে: **দুরন্ত ঈগল, বাংলাদেশ এয়ারফোর্স** – এয়ারফোর্সের লোগোটাও পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে।

ঢাকায় নিউজ ব্ল্যাকআউট আরোপ করায় মিডিয়ায় খবরটা আসেনি, ফলে কায়েসের জানা নেই দুদিন আগে ঢাকা বিমানবন্দর ও বনানী ডিপ্লোম্যাটিক জোনে কী ঘটেছে।

দ্রুত চিন্তা চলছে ওর মাথার ভিতর। চিনারা, অর্থাৎ থাই টং কি তা হলে এ-জন্যই দোই ইনথানন পাহাড়ে কাউকে উঠতে দিচ্ছে না? ভয় পাচ্ছে লুকিয়ে রাখা বাংলাদেশী প্লেনটা দেখে ফেলবে কেউ? সন্দেহ নেই, এর মধ্যে বিরাট কোনও রহস্য আছে। চিন সরকার বাংলাদেশকে দুটো ঈগল উপহার দিয়েছে, একথা ওর জানা আছে। এটা নিশ্চয়ই তাদের একটা – কিন্তু কি কারণে ঈগলের আগে 'দুরন্ত' শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে, জানা নেই ওর।

ঝটপট ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করল কায়েস, দ্রুত হাতে টেলিফটো লেন্স ফিট করল তাতে, তারপর দুরন্ত ঈগলের কয়েকটা ফটো তুলল।

সিদ্ধান্ত নিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঢাকায় রিপোর্ট করা দরকার। চট্ করে একবার হাতঘড়ির ডায়ালে চোখ বুলাল। দুপুর আড়াইটা বাজতে চলেছে। এখনই ফিরতি ট্রেইল ধরে নামতে শুরু করলে বেস ক্যাম্পকে এড়িয়ে নিজের হোটেল স্যুইটে পৌঁছাতে তিন ঘণ্টার বেশি সময় লাগার কথা নয় ওর। থাই সময় সাড়ে পাঁচটা মানে বাংলাদেশ সময় সাড়ে চারটে।

কায়েস জানে দেশে থাকলে ওর মাসুদ ভাইকে বিসিআই হেডকোয়ার্টারে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত পাওয়া যাবে। সিদ্ধান্ত নিল, হোটেলে ফিরে নিজের স্যুইট থেকে সরাসরি ফোন করবে বিসিআই হেডকোয়ার্টারে।

তবে মোহনাকে ফোন করবে পাহাড় থেকে নীচে নেমেই, কোনও পাবলিক ফোন বুদ থেকে। এখানে কী দেখেছে টেলিফোনে তাকে কিছু বলবার দরকার নেই, শুধু বলবে আজ সন্ধ্যার হেলিকপ্টার সার্ভিস ধরে রাতেই হোটেল নন্দনকাননে পৌঁছে যাও, এখানে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

চোখে বিনকিউলার তুলে দুরন্ত ঈগলকে শেষ আরেকবার দেখে নিল কায়েস। না, কোথাও কোনও ভুল হচ্ছে না। ঘুরল ও, পাহাড় থেকে নামতে শুরু করল।

নামাটা সহজ, বেস ক্যাম্পকে সাবধানে পাশ কাটিয়ে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

পাহাড়ের নীচে নেমে আসতে মাত্র দেড় ঘণ্টা সময় লাগল কায়েসের। নামবার পথে কারও সঙ্গে দেখা না হওয়ায় ধরে নিল কেউ ওকে দেখতে পায়নি। যদি জানত চোখে বিনকিউলার তুলে গোটা এলাকার উপর নজর রাখছে থাই টং-এর চিনারা, তা হলে হয়তো আরও একটু সাবধান হত ও।

*

ঢাকা, বিসিআই হেডকোয়ার্টার। বিকেল চারটে।

ডেস্কের উপর পা তুলে দিয়ে চোখ বুজে আছে রানা। মনে মনে প্ল্যান করছে মানসিক ও শারীরিক শিথিলায়ন-এর জন্য ঠিক কী করা দরকার।

সোহেল অফিসে নেই, কাজেই আজ আর গল্প জমবে না। কী একটা কাজ আছে বলে দুপুরবেলাই ছুটি নিয়ে চলে গেছে ওর প্রাইভেট সেক্রেটারি তনিমাও।

কোনও ক্লাবে সাঁতার কাটতে যাওয়া যায়...ভাগ্য ভাল হলে সুইমিংপুলেই দেখা হয়ে যেতে পারে উদ্ভিন্নযৌবনা কোনও তন্বী তরুণীর, দেশি হোক কি বিদেশি...কিংবা তাস খেলতে বসে যেতে পারে, টেবিলে থাকবে হুইস্কির একটা আধ-খালি গ্লাস...

নিজেকে ধমক দিল রানা – এই ব্যাটা, আসলে ঠিক কী চাইছিস তুই?

যার যা কাজ, উপলব্ধি করল রানা, ওর আসলে দুর্দান্ত একটা অ্যাসাইনমেন্ট দরকার। প্রতি পদে মৃত্যুর হাতছানি দেখতে চায় ও, মাথার ভিতর থাকা চাই দেশকে বিপদমুক্ত করবার কঠিন প্রতিজ্ঞা, প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতে হবে রোমাঞ্চ ও শিহরন।

কিন্তু কোথায় পাবে রানা অমন গা গরম করা একটা অ্যাসাইনমেন্ট? অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার মালিক তো একজনই, কিন্তু কে জানে কী নিয়ে গত দুদিন ধরে ক্যান্টনমেন্টে বসে সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে জরুরি মিটিং করছেন তিনি।

গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে। কেউ কিচ্ছু বলছে না।

চিন্তা করে যখন অবসাদ দূর করবার কোনও উপায় বেরুল না, হতাশায় আরও কাহিল হয়ে পড়ল রানা। এই সময় ইন্টারকম বেজে উঠল। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল ও। রাহাত খানের ভারি গলার আওয়াজ এক নিমেষে সজাগ ও সতর্ক করে তুলল ওকে। কোথায় গেল ক্লান্তি, কোথায় হতাশা, সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে এখন শুধু চাপা উত্তেজনা ও শিরশিরে রোমাঞ্চকর অনুভূতি।

'রানা?' বিসিআই চিফ প্রশ্ন করলেন।

'ইয়েস, সার!'

'এখনই একবার আমার চেম্বারে চলে এসো,' ভারী গলায় বললেন বস্।

'জী, সার,' বলল রানা, যদিও ততক্ষণে যোগাযোগ কেটে দিয়েছেন রাহাত খান। 'ইয়েস!' হিসহিস করে বলল ও, মুঠো করা হাতটা শূন্যে ঝাঁকাল বার কয়েক। মনের আশা পূরণ হতে যাচ্ছে ভেবে রীতিমত উল্লসিত। 'ইয়েস! দিস ইজ ইট!'

সব সেই আগের মতই আছে – কাঁচাপাকা ঘন ভ্রূর জঙ্গলে লুকানো সেই ত্রিকালদর্শী একজোড়া চোখ, ভারী ফ্রেমের চশমার পিছন থেকে যেন অন্তর পর্যন্ত দেখে নিচ্ছেন; হাতের পাইপ তুলতে যাচ্ছেন মুখে, চোখে ধোঁয়া লাগায় মাথাটা একটু কাত করলেন; এমনকী কপালের পাশে শিরাটাও যেন নিয়ম ধরেই লাফাচ্ছে; তারপরও পেরেকের মত শক্ত মানুষটিকে চিনতে এক সেকেন্ড বেশি সময় লাগল রানার।

রানা উপলব্ধি করল, হঠাৎ কী করে যেন বসের বয়স একলাফে অনেকটা বেড়ে গেছে।

'বসো,' প্রিয় এজেন্টকে চেম্বারে ঢুকতে দেখে বললেন রাহাত খান।

খালি চেয়ারটায় বসল রানা। শিরদাঁড়া খাড়া।

'বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরা বেগম সম্পর্কে কিছু জানো?' বসতে না

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

বসতে প্রশ্ন করলেন রাহাত খান।

'জী-না, সার,' বলল রানা।

'এটা পড়ো,' বলে রানার সামনে একটা ফাইল রাখলেন বিসিআই চিফ, তারপর রানাকে আর কোনও প্রশ্ন করবার সুযোগ না দিয়ে একটা ফোল্ডার টেনে নিয়ে ডুবে গেলেন সেটার ভিতর।

ফাইলটা কাছে টেনে আনল রানা। উপরে লেখা রয়েছে: টপ সিক্রেট। খুলে পড়তে শুরু করল ও।

ডক্টর নাদিরা বেগম। ফটোটার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল রানা। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, চেহারায় স্পষ্ট আভিজাত্য।

বহুমুখী বিরল প্রতিভার অধিকারী ভদ্রমহিলা, বিজ্ঞানের বহু শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ। ঢাকা ভার্সিটি থেকে ফিজিক্স নিয়ে মাস্টার্স ও পিএইচডি করেছেন। সব পরীক্ষাতেই অত্যন্ত ভাল রেজাল্ট করায় কয়েকটা দেশ থেকে স্কলারশিপ অফার করা হয় তাঁকে। তবে তিনি নিজে কিছুটা বাম-ঘেঁষা বলে লালচিনের প্রস্তাবটাই পছন্দ হয় তাঁর।

বেইজিং ভার্সিটিতে ন্যানো টেকনলজি ও অ্যাটম ফিউজিং লেযার নিয়ে পড়াশোনার পর ওখানেই গবেষণার কাজে হাত দেন ডক্টর নাদিরা। তখন থেকেই তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের কথা প্রকাশ পেতে শুরু করে। একের পর এক বিচিত্র বিষয়ে তাঁর বিস্ময়কর সাফল্যে তাজ্জব বনে যান চিনা বিজ্ঞানীরা।

তাঁদের সুপারিশে চিন সরকার ডক্টর নাদিরাকে নাগরিকত্ব গ্রহণ করবার অনুরোধ করেন। কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দেন তিনি। তাঁর খুব ইচ্ছে ছিল গবেষণার কাজগুলো দেশে ফিরে করবেন। ঢাকায় বেড়াতে এসে ব্যাপারটা নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলাপও করেন তিনি। সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে জানানো হয় – চিনে কাজের সুযোগ আছে, সিকিউরিটিও খুব ভাল, গেস্ট হিসাবে যেমন কাজ করছেন আপাতত করে যান। সেটা পনেরো বছর আগের কথা।

সে সময় বেইজিং সরকারের টপ সিক্রেট একটা প্রজেক্টের ডিরেক্টর ও চিফ ডিজাইনার হিসাবে নিয়োগ পান ডক্টর নাদিরা।

সেই প্রজেক্টেরই চমকপ্রদ ফলশ্রুতি হলো জেট প্লেন ঈগল। আধুনিক প্রযুক্তির জাদু দেখিয়ে দিয়েছে ওটা, যেমন – যেভাবেই লুকিয়ে রাখা হোক না কেন অ্যাডভান্সড সার্চ রেইডার সিস্টেমের সাহায্যে শত্রুপক্ষের যুদ্ধবিমান ও মিসাইল সহজেই ডিটেক্ট করতে পারবে ওটা, যে-কোনও রেইডার সিস্টেমকে ফাঁকি দিয়ে উড়তে পারবে, যে-কোনও জেট প্লেনের চেয়ে স্পিড অনেক বেশি, সৌরশক্তিতেও চলতে পারে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অগ্রাহ্য করে মহাশূন্যের বেশ কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে আসতে পারে, অনায়াসে হিট-সিকিং মিসাইলকে ফাঁকি দিতে পারে ইত্যাদি।

শুরু থেকেই চিন সরকারের এই টপ সিক্রেট প্রজেক্টের উপর সুপার পাওয়ারগুলোর গভীর আগ্রহ ও তীক্ষ্ণ নজর ছিল। প্রজেক্ট সাইট পেনিট্রেট করতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেনি ওরা। কিন্তু চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের কড়া নজরদারির কারণে ওদের প্রতিটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

তবে তৃতীয় কারও মাধ্যমে ডক্টর নাদিরাকে লোভনীয় সব প্রস্তাব পাঠানোর প্রতিযোগিতা চলতেই থাকে। প্রতি মাসে কয়েক লাখ ডলার বেতন, দামি গাড়ি, বাগান ও সুইমিংপুলসহ বিশাল অট্টালিকা, ব্যক্তিগত বিমান, যখন যা খুশি তা-ই নিয়ে রিসার্চ করবার ফ্যাসিলিটি ইত্যাদি আরও কত কী – ইচ্ছে করলেই পেতে পারেন তিনি। কিন্তু কোনও প্রস্তাবেই রাজি করানো যায়নি তাঁকে। আদর্শ ও নীতির সঙ্গে কোনওদিন তিনি আপস করেননি, করবেনও না।

পদার্থ বিজ্ঞানে বিরাট অবদান রাখার কারণে গত বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে, বিশেষ করে একটি পরাশক্তির তরফ থেকে, নোবেল প্রাইজ কমিটিকে সুপারিশ করা হয়েছিল ডক্টর নাদিরাকে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

যাতে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। ওটাও আসলে টোপ ছিল। পরাশক্তিগুলো ভেবেছিল নোবেল প্রাইজের লোভে ডক্টর নাদিরা হয়তো চিন ত্যাগ করে তাদের খপ্পরে এসে যাবেন, তখন তাঁকে নানান কৌশলে পশ্চিমা বিশ্বে রেখে দেয়ার চেষ্টা করা সহজ হবে। কিন্তু টোপটা গেলেননি তিনি।

টপ সিক্রেট প্রজেক্ট সফল হওয়ার পর পরাশক্তির অতি-আগ্রহ প্রশমনের জন্য চিন সরকার তাদের তৈরি ঈগল বেশ কয়েকটি দেশের কাছে বিক্রি করেছে, ফলে এ বিষয়ে সুপারপাওয়ারগুলোর আর তেমন জোরালো আগ্রহ নেই।

মাস কয়েক আগে বাংলাদেশকে দুটো ঈগল জেট উপহার দিয়েছে চিন সরকার। প্রতিটি প্লেনের সঙ্গে তিনজন করে ক্রু এসেছে, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ক্রুদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য। গত মাসে ছুটি নিয়ে ডক্টর নাদিরাও এসেছেন ঢাকায়। হঠাৎই একটা আইডিয়া খেলল তাঁর মাথায়।

বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল [অব] রাহাত খান ডক্টর নাদিরার দূর-সম্পর্কের আত্মীয় হন, পরামর্শ করবার জন্য তাঁর সঙ্গেই যোগাযোগ করলেন ভদ্রমহিলা। কুশলাদি বিনিময়ের পর রাহাত খানকে বললেন – তাঁর মনে হচ্ছে: এখানে প্রয়োজনীয় ফ্যাসিলিটির ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে, ঈগল জেটকে আরও অনেক ডেভেলপ করে এমন এক দুরন্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, সারা দুনিয়ায় যার কোনও জুড়ি অন্তত আগামী পঁচিশ বছরে পাওয়া যাবে না। তাঁর মাথায় দারুণ সব আইডিয়া আসছে, এখুনি কাজটা না ধরলে হারিয়ে যাবে সবগুলো।

কিন্তু লালচিনকে নিয়ে তিনি দ্বিধায় ভুগছেন। ঈগল ওঁদের প্লেন, ডেভেলপ করতে চাইলে পারমিশন নিতে হবে। আর পারমিশন চাইতে গেলেই ওঁরা বলবেন, আমাদের এখানে সিকিউরিটি খুব ভাল, ফ্যাসিলিটিজও এ-প্লাস, কাজেই ডেভলপের কাজটা আপনি বেইজিং-এ এসেই করুন। কিন্তু ততদিনে আইডিয়াগুলো যদি মাথা থেকে বেরিয়ে যায়?

বিসিআই চিফকে ডক্টর নাদিরা আরও বললেন, এই কাজ তিনি করতে চান পৃথিবীতে সামরিক ক্ষমতার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর গোটা দুনিয়ার উপর মাতব্বরি করে বেড়াচ্ছে একটিমাত্র পরাশক্তি, কারও তোয়াক্কা না করে, কারও প্রতিবাদে কান না দিয়ে যা খুশি তাই একের পর এক অন্যায় করে যাচ্ছে ওরা। এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে হলে ক্ষমতার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা দরকার। ঈগলকে ডেভেলপ করার তাঁর চেষ্টা সফল হলে সেই ভারসাম্য অনেকটাই অর্জিত হবে।

সব কথা শোনার পর রাহাত খান ডক্টর নাদিরাকে বললেন, তা হলে কাজটা তুমি আমাদের এখানেই করো। আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রী আর চিনের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স চিফের সঙ্গে কথা বলছি।

ডক্টর নাদিরা জানতে চাইলেন, প্রয়োজনীয় ফ্যাসিলিটি আর সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে?

রাহাত খান বললেন, সব আমি দেখছি। নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার সন্তোষজনক ব্যবস্থা করা গেলেই জানাব আমি তোমাকে।

সেদিনই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন তিনি, এয়ারফোর্স ও সেনাবাহিনীর সিকিউরিটি চিফের সঙ্গে বৈঠক করলেন। ঠিক হলো, ঈগল দুটো যেখানে আছে সেখানেই ডেভেলপ করবার কাজ শুরু হবে, যন্ত্রপাতি যা যা দরকার সব ওখানেই সাপ্লাই দেওয়া হবে ডক্টর নাদিরাকে। এবং ওখানে তিনি কী করছেন তা কাউকে জানানো হবে না, এমনকী সিকিউরিটি গার্ডরা পর্যন্ত কেউ কিছু জানবে না।

পরদিন মহাচিনের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স চিফ-এর সঙ্গে ওয়ায়েরলেসে সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বললেন রাহাত খান।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

ঈগলকে ডেভেলপ করবার জন্য চিন সরকারের পারমিশন চাইলেন তিনি। বললেন, বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরার এক্সপেরিমেন্ট সফল হলে ওই দুরন্ত ঈগলের কল্যাণে মহাচিন পৃথিবীর সেরা দুই সামরিক শক্তির একটিতে পরিণত হবে।

যারপরনাই খুশি হলেন মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স চিফ। প্রবল উৎসাহে বললেন, 'দেরি না করে ডক্টর নাদিরাকে আজই বেইজিঙে পাঠিয়ে দিন। মনে করুন ফুলের মালা নিয়ে বেইজিং এয়ারপোর্টে তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা।'

উত্তরে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে রাহাত খান বললেন, 'ডক্টর নাদিরার আইডিয়াটা আদৌ কাজ করবে কি না জানার জন্য ঢাকাতে, এখনই কাজ শুরু করা দরকার। আইডিয়াটা ভুলও হতে পারে। কাজটা তাঁকে করতে হবে কয়েকটা ধাপে, প্রথমটায় ব্যর্থ হলে বুঝতে হবে হলো না।'

অগত্যা মহাচিনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার জন্য সময় নিলেন সামরিক ইন্টেলিজেন্স চিফ, তারপর জানালেন, 'বেশ, তিনি যেমন চাইছেন, তেমনই হোক।'

এরপর সিকিউরিটি সংক্রান্ত টেকনিকাল কিছু ব্যাপার নিয়ে ইন্টেলিজেন্স চিফের সঙ্গে কথা হলো রাহাত খানের। ঈগলকে কতখানি ডেভেলপ করা সম্ভব সে-সম্পর্কেও আভাসে-ইঙ্গিতে আলাপ করলেন ওঁরা।

এরপর দেড়টি মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করলেন ডক্টর নাদিরা। মহাচিনের কাছ থেকে উপহার পাওয়া দুটো ঈগলের একটার উপর এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে বুঝতে পেরেছেন নাদিরা, সফল হতে চলেছেন তিনি। প্রায় সব কাজই শেষ, যেটুকু বাকি আছে সেটা বেইজিঙে গিয়ে সারবেন বলে ভাবছেন তিনি এখন।

ফাইলটা এখানেই শেষ। রানার মনে হলো, অসমাপ্ত। মুখ তুলে বসের দিকে তাকাল ও। 'জী, সার, পড়লাম,' বলল ও।

হাতের ফোল্ডার বন্ধ করে রানার দিকে তাকালেন বিসিআই চিফ। ম্লান ও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। 'সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও সেদিন আমার সঙ্গে চাইনিজ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স চিফের আলাপ ইন্টারসেপ্ট করা হয়েছিল, রানা,' গম্ভীর গলায় বললেন তিনি। 'একটা পরাশক্তি প্রথম থেকেই জানত ছুটিতে ডক্টর নাদিরা কী করতে চাইছেন, কোথায় করতে যাচ্ছেন।'

'ইয়াল্লা!' বিড়বিড় করল রানা।

'বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। নিউজ ব্ল্যাকআউট চলছে, তাই মিডিয়ায় কিছু আসেনি। গতপরশু রাতে হ্যাঙ্গারের ভেতর ওই দুরন্ত ঈগলে আগুন দেয়া হয়েছে,' কর্কশ ও কঠিন শোনাচ্ছে বিসিআই চিফের কণ্ঠস্বর। 'অক্ষত কিছুই পাওয়া যায়নি ওটার। আর ঠিক একই সময়ে কিডন্যাপ করা হয়েছে ডক্টর নাদিরাকে।'

হাঁ করে বসের মুখের দিকে চেয়ে রইল মাসুদ রানা।

সংক্ষেপে পুরো ব্যাপারটা রানাকে জানালেন তিনি। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কী মনে হচ্ছে বলো।'

ঘাবড়ে গেছে ঘটনা শুনে। বলল, 'অনেক কিছুই দুর্বোধ্য লাগছে, সার।'

'যেমন?' সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলেন রাহাত খান।

'এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ প্লেনটাকে কেউ ধ্বংস করতে চাইবে কেন, সার? নিয়ে যেতে চেষ্টা করলে সেটার পেছনে বরং যুক্তি পাওয়া যায়।'

'আর কী দুর্বোধ্য লাগছে তোমার?' জানতে চাইলেন বস্।

'থাই থান্ডার বাংলাদেশে ড্রাগস পাঠায়, সার; তা-ও খুব বড় স্কেলে নয়। ওরা এত বড় একটা কাজে হাত দিতে যাবে কেন? ডক্টর নাদিরার মত বিজ্ঞানীকে নিয়ে ওরা করবেটাই বা কী?' মাথা নাড়ল রানা। 'আমার মনে হয় এর পেছনে ওই পরাশক্তির হাত আছে।'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

'হ্যাঁ, ঠিক এই প্রশ্নের উত্তরগুলোই খুঁজে বের করতে হবে তোমাকে – দুরন্তকে কেন পোড়ানো হলো, থাই থান্ডার কাদের হয়ে কাজটা করল ইত্যাদি,' বললেন বিসিআই চিফ।

'এটাই আমার অ্যাসাইনমেন্ট, সার?'

মাথা নাড়লেন রাহাত খান, ভ্রূ কুঁচকে কঠিন চোখে দেখছেন রানাকে। 'তোমার আসল অ্যাসাইনমেন্ট, যেমন করে পার, ডক্টর নাদিরাকে উদ্ধার করে আনা।'

'ইয়েস, সার।'

'এ-ধরনের পরিস্থিতিতে বিসিআই-এর উচিত সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাকে ব্যাক করা। কিন্তু সেটি সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, আমারও সন্দেহ, এই ব্যাপারটার সঙ্গে বিশেষ পরাশক্তি জড়িত। ওদের সঙ্গে বিসিআই প্রকাশ্যে বিরোধে জড়াতে পারে না।'

'জী, সার।'

'তবে, একটা নির্দেশ এখনই আমি তোমাকে দিয়ে রাখছি,' ভারী গলায় বললেন রাহাত খান। 'ওই পরাশক্তি যাকে ঘাঁটাতে ভয় পায়, প্রয়োজনে সেই চিনের সাহায্য নিতে পারবে তুমি।'

'ইয়েস, সার,' বলল রানা, ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছে শুধু বাংলাদেশ বা চিনের নয়, গোটা বিশ্বেরই কত বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেছে। ভারসাম্য না থাকলে একতরফা ক্ষমতার দাপট, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, লুটপাট কী ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে, তা তো আমরা বাংলাদেশেই দেখেছি। চোখের সামনে দেখছি শক্তিমদমত্ত পরাশক্তি কেমন পায়ের নীচে পিষছে মানবতাকে। উন্নত বিশ্বেরও কেউ টু শব্দটি করার সাহস পাচ্ছে না। ক্ষমতার এই মহড়া চলতে থাকলে, বাসযোগ্য থাকবে না আর এ পৃথিবী, বাঁচতে চাইলে চাকর হয়ে থাকতে হবে অত্যাচারীদের।

'সার, কোত্থেকে শুরু করতে বলেন?' জানতে চাইল রানা। 'হ্যাঙ্গারে আগুন লাগার পর দুদিন পার হয়ে গেছে, ওখানে...'

'শুরু করবে থাইল্যান্ড থেকে,' বললেন রাহাত খান। 'কারণ নাহার ভিলার একটা ঝোপের ভেতর থেকে এই ব্রেসলেটটা পাওয়া গেছে।' দেরাজ খুলে প্ল্যাটিনামের ব্রেসলেটটা বের করে রানার দিকে ঠেলে দিলেন তিনি। 'সম্ভবত আমাদের কোনও সৈনিকের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় থাই থান্ডারদের কারও কবজি থেকে খুলে পড়ে গেছে।'

জিনিসটা নেড়েচেড়ে দেখছে রানা। এ-ধরনের ব্রেসলেট আগেও দেখেছে ও, থাই থান্ডারের সদস্যরা ব্যবহার করে। জিনিসটার গায়ে হরফ খোদাই করে কীসব যেন লেখা হয়েছে। হরফগুলো এত ছোট যে পড়া যাচ্ছে না।

'ওখানে লেখা আছে চক্রি চুয়ান,' চোখাচোখি হতে বললেন রাহাত খান, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখেছেন তিনি।

'নামটা পরিচিত, সার!' বলল রানা। 'থাই থান্ডারের দুর্ধর্ষ অপারেটর। দু'বছর আগেই শুনেছিলাম দলের লিডার হতে যাচ্ছে ও।' ওর মনে পড়ল সে-সময় থাই থান্ডারের লিডার ছিল বুকরিত প্রেমজ।'

'ঠিক আছে,' একটা ফাইল টেনে নিয়ে খুললেন বিসিআই চিফ। অর্থাৎ রানাকে সিগন্যাল দেয়া হলো: এখন তুমি আসতে পার।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা। ওর হাতঘড়িতে এখন সাড়ে চারটে বাজে।

পাঁচ

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

সিঁড়ি বেয়ে সাততলা থেকে ছয়তলায় নেমে নিজের অফিস কামরার দিকে এগোচ্ছে রানা। চৌকাঠ পেরুবার সময় শুনতে পেল টেলিফোন বাজছে।

আইডি ফোন, নম্বর দেখেই বোঝা গেল বিদেশ থেকে কেউ ফোন করেছে।

নিজের রিভলভিং চেয়ারে বসে রিসিভার তুলল রানা। 'ইয়েস?'

'হ্যালো, মাসুদ ভাই?' অপরপ্রান্ত থেকে পরিচিত ও প্রিয় এক তরুণের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'আমি ইমরুল কায়েস, থাইল্যান্ড থেকে বলছি।'

প্রথমেই রানার মনে প্রশ্ন জাগল, ব্যাংকক না বলে থাইল্যান্ড বলছে কেন কায়েস? 'হ্যাঁ, বলো, কায়েস। সব খবর ভাল তো? থাইল্যান্ডের কোত্থেকে বলছ তুমি?'

'দোই ইনথানন পাহাড়ের নীচ থেকে, মাসুদ ভাই,' জানাল কায়েস। 'জায়গাটার নাম হাট খোয়াই। নন্দনকানন হোটেলের একটা স্যুইট থেকে জরুরি একটা বিষয়ে রিপোর্ট করছি।'

'আবার বলো,' বলে হাত বাড়িয়ে রেকর্ডিং সুইচটা অন করল রানা।

মেসেজটা রিপিট করল কায়েস, তারপর বলল, 'আমরা কোনও গাইড পাইনি। বেস ক্যাম্পে থাই চিনারা, সম্ভবত টং, বাধা দেয়ায় অন্যদিক থেকে পাহাড়টায় উঠেছিলাম। পাঁচ হাজার ফুট ওপরে উঠে পুবদিকে মুখ করে নীচে তাকাতে একটা ঈগল জেট দেখতে পেয়েছি। ওখানে একটা দুর্গ আছে, সেটার কাছ থেকে...'

'কী বাজে বকছ!' চক্কর দিয়ে উঠল রানার মাথা। 'বাংলাদেশী ঈগল ওখানে কীভাবে যাবে? তা কী করে সম্ভব? নিশ্চয়ই ভুল দেখেছ তুমি।'

'প্রথমে আমারও তাই মনে হয়েছিল,' বলল কায়েস। 'কিন্তু পরে বুঝেছি, ঠিকই দেখছি – বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের লোগো আঁকা রয়েছে ওটার গায়ে। আরও নীচে, কী কারণে জানি না বেশ কিছু পাহাড়ী বসতি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। মাসুদ ভাই, প্লিজ, আপনি একটু খোঁজ নিন – আমাদের ঈগল হাইজ্যাক হয়ে যায়নি তো?'

ভ্রূ কোঁচকাল রানা, ভাবল কায়েস এত জোর দিয়ে কথাটা বলছে কীভাবে, শতকরা একশো ভাগ নিশ্চিত না হয়ে? তা হলে কি ওটা ডক্টর নাদিরার ডেভেলপ করা দুরন্ত? 'ওকে, কায়েস, নিচ্ছি খবর,' বলল ও। 'আমি যোগাযোগ না করা পর্যন্ত নন্দনকাননেই থাকো তুমি, ঠিক আছে? আমি–'

হঠাৎ রানাকে হতচকিত করে দিয়ে অপরপ্রান্ত থেকে পর পর দু'তিনটে গুলির আওয়াজ ভেসে এল। লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল ও, বিড়বিড় করছে, 'খোদা! ও খোদা! হ্যালো, কায়েস? হ্যালো? হ্যালো? কায়েস, কী হলো তোমার ... তুমি ঠিক আছ তো?'

কায়েসের অস্ফুট, জড়ানো কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'না, মা-সু-দ ভা-ই, ঠি-ক নেই...থাই টং...' এরপর ঠকাস করে একটা আওয়াজ হলো, সম্ভবত কায়েসের হাত থেকে রিসিভারটা শক্ত কিছুর উপর পড়ে গেছে।

'হ্যালো, কায়েস? হ্যালো...হ্যালো...হ্যালো...' বৃথাই কিছুক্ষণ চেষ্টা করল রানা, কেউ সাড়া দিল না। ডেড হয়ে গেছে লাইন। গোটা ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য একটা দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছে ওর; ভাবতে চাইছে, চোখ ভিজে যাওয়ায় সামনের দেয়ালে টাঙানো রবীন্দ্রনাথের ছবিটা ঝাপসা হয়ে ওঠাও সেই দুঃস্বপ্নেরই একটা অংশ মাত্র।

অগত্যা বাধ্য হয়ে ক্রেইডলে রেখে দিল রানা রিসিভার। তারপর আবার তুলে নিয়ে ডায়াল করল ওর এজেন্সির ব্যাংকক শাখার নম্বরে। লাবণী সামাদকে অফিসেই পাওয়া গেল। সংক্ষেপে পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিল তাকে রানা,

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

তারপর নির্দেশ দিল – এই মুহূর্তে পুলিশ ও হোটেল নন্দনকাননের সিকিউরিটি চিফকে ফোন করে কায়েসের খবর নিতে বলতে হবে। ওখানকার কোনও হসপিটালেও ফোন করতে হবে, তারা যাতে দ্রুত একটা অ্যামবুলেন্স পাঠায়।

বিশ মিনিট পর রানাকে রিপোর্ট করল লাবণী। 'সরি, মাসুদ ভাই,' ধরা গলায় বলল সে। 'কায়েস ভাই বেঁচে নেই।'

রানা কথা বলছে না।

'হোটেলের ডাক্তার বলেছেন, এক জোড়া বুলেট কায়েস ভাইয়ের পিঠ দিয়ে ঢুকে দুটো ফুসফুসই ফুটো করে ফেলেছে, আর তৃতীয়টা ঢুকেছে হার্টে।' আর কিছু বলতে না পেরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল লাবণী।

ঝাড়া ত্রিশ সেকেন্ড লাবণীকে কাঁদতে দিল রানা। তারপর নরম গলায় বলল, 'শান্ত হও, লক্ষ্মীটি। যা বলি, মন দিয়ে শোনো।'

একটু পরেই নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল লাবণী। 'জী, মাসুদ ভাই। বলুন।'

'ব্যাংকক শাখার সব দায়িত্ব এখন তোমার ওপর,' বলল রানা। 'আমার জানামতে হেলিকপ্টার সার্ভিস আছে, সম্ভব হলে আজ রাতেই চলে যাও তোমরা। জায়গাটার নাম হাট খোয়াই।'

'ওখানে আমাদের কাজ কী, মাসুদ ভাই?'

'প্রথম কাজ, পোস্টমর্টেম করা হয়ে গেলে এজেন্সির এজেন্টদেরকে লাশটা ব্যাংককে নিয়ে যেতে বলবে,' বলল রানা। 'তারপর কফিনটা প্লেনে তুলে দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে। কায়েসের সঙ্গে প্লেনে কাউকে থাকতে বলে দেবে। তুমি হাট খোয়াইয়েই থাকো, ব্যাংকক হয়ে কাল আমি আসছি ওখানে।'

'জী, ঠিক আছে, মাসুদ ভাই,' ব্যাংকক থেকে জানাল লাবণী।

এরপর বস্‌কে ইন্টারকম করে সব কথা জানাল রানা।

ওর কথা শেষ হতে দশ সেকেন্ড কিছু বললেন না রাহাত খান। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার আওয়াজ ভেসে এল। অবশেষে বললেন, 'ভেরি স্যাড। এর মধ্যে কী যেন একটা ধাঁধা আছে। তোমার অ্যাসাইনমেন্টের গুরুত্বটা আরও অনেক বেড়ে গেল, রানা।'

'জী, সার।'

'তুমি যেহেতু ব্যস্ত হয়ে পড়বে, সোহেলও ঢাকায় নেই, কায়েসের বাড়িতে খবরটা দেওয়ার জন্যে তা হলে কাউকে পাঠাতে হয়। লাবণীকে বলে দাও কায়েসের লাশটা দেশে পাঠাতে হবে...'

'ওর বাড়িতে খবর দিতে আমিই যাব, সার,' বলল রানা। 'আর লাবণীকে প্রয়োজনীয় সব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্ত কতটুকু এগোল আমি ওখানে পৌঁছে খবর নেব। কিন্তু, সার, কায়েসের কথাটার মানে কী? ইনথাননের পুবদিকে আমাদের ঈগলকে কীভাবে দেখবে ও? যদি সত্যিই দেখে থাকে, তা হলে ওটা দুরন্তই। আসলে ওটা এয়ারপোর্টে পুড়ে যায়নি, নিখোঁজ হয়ে গেছে, এমন কি হতে পারে, সার?'

'না, তা কী করে হবে। দুটো তো মাত্র প্লেন। একটা পুড়ে গেছে, একটা আছে। "এ" সেকশনেরটাই পুড়েছে, যেখানে দুরন্ত ছিল। কন্ট্রোল টাওয়ারের নির্দেশে "বি" সেকশনেরটা আকাশে উড়ে যায়, উড়িয়ে নিয়ে যায় হ্যাঙ্গারে হাজির ছিল চিনা ক্রুদের যে গ্রুপটা, তারাই। ওড়ার পর সারাক্ষণ এয়ারপোর্টকে ঘিরে চক্কর দিয়েছে ওটা, অনেকেই দেখেছে। তারপর আবার কন্ট্রোল টাওয়ারের নির্দেশ পেয়ে ফিরেও এসেছে, পঁয়তাল্লিশ মিনিট কিংবা এক ঘণ্টার মধ্যে। এর মধ্যে কারও চোখে কোনও রকম অসঙ্গতি ধরা পড়েনি। এ-ব্যাপারে খুঁত শুধু একটাই, তা হলো: চিনাদের তিন ট্রেইনার প্লেন নিয়ে ফিরে আসার পর কোথায় গেছে কেউ বলতে পারছে না।'

'সার, আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না যে কায়েস ভুল দেখেছে,'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

বলল রানা। 'ঠিকই দেখেছে ও ঈগলটাকে, আর সেজন্যেই ওকে–' গলাটা ধরে আসায় চুপ করে গেল রানা।

তিন সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর বিসিআই চিফ বললেন, 'ঠিক আছে, আমি আরেকবার খোঁজ নেব।'

'জী, সার; ধন্যবাদ, সার।'

আলাপ শেষ, তারপরও যোগাযোগ কাটছেন না বিসিআই চিফ। 'রানা?'

'ইয়েস, সার?'

'দেশে বর্গি এসে ধান কেটে নিয়ে গেছে। তারপর জানা গেল পা দেওয়া হয়েছে বাঘের লেজেও। বুঝতেই পারছ তোমার কাজ কতটা বাড়ল।' ইঙ্গিতে কথা বলছেন ওস্তাদ, আভাস পেতে চাইছেন প্রিয় শিষ্য তাঁর চিন্তাধারা অনুসরণ করতে পারছে কি না।

'জী, সার,' সংক্ষেপে বলল মাসুদ রানা।

ওর কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক দৃঢ়তা লক্ষ করে আংশিক জবাব পেয়ে গেলেন বিসিআই চিফ রাহাত খান। 'কিল দেম, মাই বয়!' এবার ঠাণ্ডা ও কঠিন সুরে পরিষ্কার নির্দেশ দিলেন তিনি। 'পানিশ দেম অল!'

'আই উইল, সার, আই উইল!'

উদভ্রান্ত রানা নিজের কামরা থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল, যেন এই মুহূর্তে ওকে যুদ্ধে যেতে হবে।

কোনও এক পরাশক্তি মহাচিনের প্রতিবেশী তাইওয়ান-কে নির্দেশ দিয়েছে: যত টাকা লাগে নাও, যেভাবে পার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডক্টর নাদিরা ও তাঁর ডেভেলপ করা দুরন্ত ঈগলটা ঢাকা থেকে এনে দাও। খবরদার, দুটোর একটাও যেন বেজিঙের হাতে না পড়ে!

কাজটা করে দেওয়ার জন্য তাইওয়ানিজ সিক্রেট সার্ভিসকে আশি মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়েছে ওই পরাশক্তি। কাজটা নিজেরা করবে না, কারণ ধরা পড়ে গেলে লালচিন ভয়ানক খেপে যাবে। তাই আজ্ঞাবহ তাইওয়ানকে দিয়ে করাবে, কিন্তু তাদেরও নিজেদের গা বাঁচিয়ে আর কাউকে দিয়ে করাতে হবে কাজটা। কারণ চিনারা যদি তাইওয়ান আক্রমণ করে বসে, জড়িয়ে যাবে ওরাও আরেক যুদ্ধে।

কাজটার সঙ্গে তিনটে শর্তও দিয়েছে ওরা।

এক: কোনও অবস্থাতেই দুরন্ত ঈগলের কোনও ক্ষতি করা চলবে না।

দুই: অক্ষত অবস্থায় থাইল্যান্ডের নির্দিষ্ট একটা জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে, সেখানে ওদের টেকনিকাল এক্সপার্টরা পরীক্ষা করে দেখবে ওটাকে।

তিন: বাঙালী ডক্টর নাদিরাকে ঢাকা থেকে কিডন্যাপ করে পৌঁছে দিতে হবে সিঙ্গাপুরে। ওখানে একটা বোয়িং অপেক্ষা করবে, তাঁকে নিয়ে উড়ে যাবে অজ্ঞাত কোনও গন্তব্যে।

থাইল্যান্ড। দোই ইনথানন।

এই মুহূর্তে শান্ত ও ভদ্র একজন ট্যুরিস্ট মাসুদ রানা, সেই সঙ্গে সৌখিন পর্বতারোহীও বটে। থাই চিনারা কায়েসকে বাধা দিয়েছিল, সে-কথা মনে রেখে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে – প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথার আছে শোল্ডার হোলস্টারে। ছুরিটা স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো বগলের কাছাকাছি বাহুতে, আরও কিছু মারাত্মক অস্ত্র সঙ্গে নিতে বাধ্য করেছেন ওকে বিসিআই-এর টেকনিকাল ডিপার্টমেন্টের চিফ ডক্টর শামশের আলী।

নীল জিনস ও কালো জ্যাকেট পরেছে রানা, পায়ে ক্লাইম্বিং বুট, কাঁধ থেকে ঝুলছে লেদার ব্যাগ। ডান হাতের কবজিতে পরেছে বিসিআই চিফের কাছ থেকে পাওয়া একমাত্র সূত্র সেই ব্রেসলেটটা।

ব্যাংকক থেকে কাল রাতে হাট খোয়াইয়ে পৌঁছেছে রানা।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

কাল রাতে ও আজ সকালে কায়েসের খুন প্রসঙ্গে স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে দু'দফা কথা হয়েছে ওর, সঙ্গে লাবণীও ছিল। এই কদিন তদন্ত করে কোনও সূত্রই খুঁজে পায়নি তারা। কেসটা সম্পর্কে স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে কোনও রকম আগ্রহও দেখা গেল না। আভাসে-ইঙ্গিতে রানাকে তারা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করল কায়েস সম্ভবত ড্রাগস কিংবা নারী ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল, তারই ফলশ্রুতিতে থাই টং-এর হাতে অকালে প্রাণ হারাতে হয়েছে তাকে।

রানা জানতে চাইল, থাই টংকে সন্দেহ হওয়ার কারণ কী?

পুলিশ জানাল, এলাকাটা থাই টং-এর, এখানে তাদের নির্দেশ ছাড়া এ-ধরনের কোনও অপরাধ সাধারণত ঘটে না।

রানা জিজ্ঞেস করল, তা হলে তাদেরকে আপনারা ধরছেন না কেন?

ইন্সপেক্টর ম্লান হেসে জবাব দিল, তারা আমাদেরকে ধরছে না, এটাই আমাদের সাত-কপাল। এখানে পাঠানোর আগে হেডকোয়ার্টার থেকে বলে দেওয়া হয়, ওদেরকে ঘাঁটাবার দরকার নেই।

পরিস্থিতিটা বুঝে নিল রানা। যা করবার নিজেদেরই করতে হবে ওদের।

হোটেল-এ ফিরে এসে লাবণীকে ব্যাংককে ফিরে যেতে বলল রানা, কারণ শাখাপ্রধান না থাকায় ওখানকার কাজ ঠিকমত চলবে না।

লাবণীকে হেলিকপ্টারে তুলে দিয়ে দুপুরের দিকে দোই ইনথানন বেস ক্যাম্পে পৌঁছাল রানা। এখানে এসে একটু অবাকই হলো ও। কোথাও কোনও থাই চিনার ছায়ামাত্র নেই। অনেক গাইডকেও ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। অথচ টেলিফোনে কায়েস বলেছিল, কোনও গাইড পাওয়া যায়নি, থাই চিনারা পাহাড়ে চড়তে বাধা দিয়েছে তাকে।

তবে ক্যাম্পের সরকারী লোকজন, গাইড ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল দিন কয়েকের জন্য পাহাড়ে ওঠা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কেন? উত্তরটা এড়িয়ে গেল সবাই।

রানা খেয়াল করল, ওর হাতের ব্রেসলেটটা দেখে লোকজন এড়িয়ে থাকছে ওকে, সামনে পড়ে গেলে যেন পালাতে পারলে বাঁচে। এরপর কারও দিকে এগোবার সময় ডান হাতটা পিছনে রাখল ও, ব্রেসলেটটা যাতে দেখা না যায়।

তাতেও যে খুব একটা লাভ হলো, তা নয়। কী কারণে যেন মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছে সবাই। শুধু একজন গাইড চাপা স্বরে বলল, 'ভৌতিক ব্যাপার, সার। আগুনে পুড়ে বেশ কিছু লোক মারা গেছে।'

ওখান থেকে নেমে এসে অন্য পথ খুঁজে নিল রানা; জানে না, ঠিক এটা ধরেই উঠেছিল কায়েস। আকাশে ভাসমান মেঘ থাকায় রোদের অত্যাচার নেই; সরু, আঁকাবাঁকা ট্রেইল ধরে উঠতে তেমন কষ্ট হচ্ছে না ওর। বারো শো ফুট ওঠার পর প্রথম বসতিটা দেখতে পেল ও।

আগুনে পোড়া, পরিত্যক্ত কয়েকটা কুঁড়েঘর। শুধু ঘরগুলো নয়, গাছপালাও পুড়ে গেছে। একটা প্যাটার্ন লক্ষ করল রানা। আগুন যেন চওড়া একটা করিডর তৈরি করতে চেয়েছে। কিছুদূর এভাবে পোড়াবার পর নতুন আরেকদিকে সরে গিয়ে সেখানেও দেড়-দুশো গজ লম্বা একটা করিডর তৈরি করেছে।

গাছপালা এদিকে কম বলে নিজে থেকেই নিভে গেছে আগুন।

দ্বিতীয় বসতিটা আঠারোশো ফুট উপরে, আকারে বেশ বড়, তবে এটায় আগুন লাগেনি। সর্বস্ব হারানো হতচকিত আদিবাসী পাহাড়ী লোকজন আশ্রয় নিয়েছে এখানে। বিশৃংখল ও করুণ একটা অবস্থা দেখতে পেল রানা। আলাপ করবার ইচ্ছে থাকলেও, ভাষা একটা বাধা হয়ে দাঁড়াল। দু'একজন পাওয়া গেল

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

যারা মাত্র কয়েকটা ইংরেজি শব্দ জানে।

আকার-ইঙ্গিতে তারা বোঝাতে চাইল, সরকার তাদেরকে পাহাড় থেকে উচ্ছেদ করবার জন্য আকাশ থেকে অদৃশ্য আগুন ছুঁড়েছে। রানার প্রশ্নের উত্তরে তারা জানাল, পাঁচশো ফুট উপরে আরও একটা বসতিতে আগুন লেগেছে।

পাঁচশো ফুট ওঠার পর, তিন নম্বর বসতিতে, মাত্র পাঁচজন মানুষ ও পাঁচ-সাতটা ছাগল দেখতে পেল রানা, অথচ ঘর-বাড়ির সংখ্যা দুশোর কম নয়। মধ্যবয়স্ক এক দম্পতি আধ পোড়া দুটো কুঁড়েঘর থেকে গৃহস্থালির কিছু জিনিস-পত্র উদ্ধার করছে, তাদেরকে সাহায্য করছে গ্রাম্য এক তরুণী ও একজন কামলা।

আরও এক তরুণী কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই পরিবেশের সঙ্গের একেবারেই মানাচ্ছে না তাকে। বাকি সবার মত নোংরা ফতুয়া আর খাটো গাউন পরেনি সে। তার গায়ে সাদা পপলিনের শার্ট, কোমরে হালকা নীল জিনস। যথেষ্ট সুন্দরী সে, তারপরও মেকআপ ব্যবহারে কার্পণ্য নেই।

এ মেয়ে এখানে বাস করে না, ভাবল রানা, আবার এমনও নয় যে নীচে থেকে এই মাত্র পাহাড়ে উঠে এসেছে। তা উঠলে ঘামে মুখের মেকআপ লেপ্টে যেত।

রানা তাকিয়ে আছে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিল মেয়েটি। 'বেশ কয়েক জায়গাই দেখছি পুড়ে গেছে,' ইংরেজিতে বলল রানা। 'কীভাবে লাগল এই আগুন?'

মেয়েটি কিছু বলছে না।

তবে হাতের কাজ থামিয়ে তার দিকে তাকাল সবাই, তাও আবার হাত জোড় করে অনুমতি প্রার্থনার ভঙ্গিতে। বিড় বিড় করে কিছু বলল মেয়েটি, শুনে সবাই আবার যে যার কাজে হাত লাগাল – রানার দিকে একবারও না তাকিয়ে।

'আমাদেরকে বিরক্ত না করলেই খুশি হব,' এক পা এগিয়ে এসে কঠিন সুরে বলল শহুরে তরুণী, তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাই বলে দিচ্ছে আনআর্মড কমব্যাটে ট্রেনিং নেওয়া আছে। বলা যায় না, হাতব্যাগে আগ্নেয়াস্ত্র থাকলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

'আমি কাউকে বিরক্ত করতে আসিনি,' বলল রানা। 'এসেছি একটা প্লেনের খোঁজে। আপনি কিছু জানেন?'

'কীসের প্লেন?' ঠাণ্ডা সুরে বলল মেয়েটি। 'নিজের ভাল চান তো কেটে পড়ুন এখান থেকে!'

এই সময় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মধ্যবয়স্কা মহিলাটি। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে রানা দেখল মহিলা দৌড়ে গিয়ে ছোট্ট একটা কবরের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। মাটি ও পাথরের স্তূপ দেখেই বোঝা যায়, নতুন কবর – নিশ্চয়ই কোনও শিশুর।

'কার কবর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওই মহিলার ছ'বছরের ছেলে আগুনে পুড়ে মারা গেছে,' অন্যদিকে তাকিয়ে বলল মেয়েটি। 'কেউ জানে না কীভাবে লেগেছে আগুনটা।'

'দুঃখিত,' বলে মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে এল রানা, ট্রেইল ধরে উঠছে।

পাঁচ হাজার ফুটে উঠতে আরও দু'ঘণ্টা লেগে গেল রানার। তারপর হঠাৎ খেয়াল করল, ট্রেইলের আর কোনও অস্তিত্বই নেই সামনে। ওর দৃষ্টি কেড়ে নিল ডানদিকে পাহাড়প্রাচীরের গায়ে একটা ফাঁক। কাঁটা-ঝোপ টপকে সেদিকে এগোল ও। পঁচিশ গজ এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। সামনে ফাঁকা জায়গা, ঝপ্ করে নেমে গেছে পাহাড়ের গা।

জীবনের শেষ টেলিফোন মেসেজে কায়েস তার প্রিয় মাসুদ ভাইকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই দিয়ে গেছে। ওখানে দাঁড়িয়ে চোখে শক্তিশালী বিনকিউলার তুলে তার বর্ণনার সঙ্গে দৃশ্যটার হুবহু মিল খুঁজে পেল রানা।

বহুদূরে পিং নদী দেখা যাচ্ছে। রানা জানে, পাঁচশো মাইল দূরে রাজধানী ব্যাংকক হয়ে সাগরে গিয়ে পড়েছে ওটা। তারপর,

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

কায়েস যেমন দেখেছিল, ও-ও তাই দেখল – বনভূমির মাঝখানে বিশাল একটা দুর্গ।

কিন্তু চারদিকে বিনকিউলার ঘুরিয়ে, বারবার ফোকাস অ্যাডজাস্ট করেও কোথাও কোনও প্লেন দেখতে পেল না রানা।

কায়েসের বর্ণনা মত সবই তো রয়েছে, তা হলে প্লেনটা নেই কেন?

প্লেন নেই, আর সেজন্যই কি বেস ক্যাম্পে চিনারাও নেই?

ওখানে বসেই কয়েকটা কাজু বাদাম ও কফি খেল রানা। নদীর দিকে মুখ করা প্রাচীন দুর্গটা এখান থেকে অনেক দূরে, চোখে বিনকিউলার তুলে সেদিকে তাকিয়ে আছে ও। প্রথমে ভেবেছিল প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে দুর্গটা । একটু পরেই ওর ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো।

নদীর ঘাট থেকে রওনা হয়ে ট্রাকের একটা বহরকে আসতে দেখল রানা। ট্রাক বোঝাই কাঠের বাক্সের উপর যারা বসে আছে তাদের মধ্যে থাই লোকজন নেই বললেই চলে, বেশিরভাগই বিদেশি লেবার। চেহারা ও হাবভাব দেখে কয়েকজনকে ভারতীয় ও বাংলাদেশী বলেও মনে হলো ওর।

দুর্গটাকে নিশ্ছিদ্রভাবে পাহারা দেওয়া হচ্ছে। ফটকটা বিরাট, দশ-বারোজন চিনা কারবাইন হাতে পাহারা দিচ্ছে সেখানে। ফটক খুলে দেওয়া হলো। ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকল ট্রাক বহর। রানা লক্ষ করল শুধু প্রহরীরা নয়, শ্রমিকদের যারা খাটাচ্ছে তারাও সবাই থাই চিনা।

বেলা শেষ হতে খুব আর দেরি নেই। এখানে সময় নষ্ট করবার মানে হয় না। কিছু ফেলে যাচ্ছে কি না দেখে নিয়ে ফিরতি পথ ধরে নীচে নামছে রানা।

ঘণ্টাখানেক পর আগুন লাগা তিন নম্বর বসতিতে পৌঁছে দেখল ছাগলগুলোকে নিয়ে সবাই চলে গেছে, একা শুধু শহুরে মেয়েটি একটা ছোট বোল্ডারের উপর বসে রয়েছে। তার হাতে একটা ছোট লাঠি, সেটা দিয়ে কালো ছাই নাড়ছে। ভঙ্গিটা এমন, যেন কারও জন্য অপেক্ষা করছে সে।

থেমে দাঁড়িয়ে চারপাশটা ভাল করে একবার দেখে নিচ্ছে রানা, বুঝতে চাইছে এটা কোনও ফাঁদ কি না।

দুশো ঘর-বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, মেয়েটির ডান পাশে অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে শুধু একটা গোলাঘর। দেখে খালিই মনে হলো। রাতটা কি ওখানেই কাটাবার কথা ভাবছে মেয়েটি? ওর পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। চোখ দুটো বুদ্ধিদীপ্ত, লক্ষ করল ও।

'ও, আপনি,' বোল্ডারের উপর সিধে হয়ে বসল মেয়েটি। 'আমি ভাবলাম অন্য দিক দিয়ে নেমে গেছেন।'

'এখানে আপনি একা...আপনার আসলে সূর্য ডোবার আগেই চলে যাওয়া উচিত,' বলল রানা।

হেসে উঠল মেয়েটি, তারপর বলল, 'এটা আমাদের রাজ্য। আমি আদিবাসী এক রাজার মেয়ে। প্রজাদের বাড়ি-ঘরে আগুন লেগেছে শুনে দেখতে এসেছি। কেউ বললেই এখান থেকে আমাকে চলে যেতে হবে নাকি?'

আচ্ছা, ভাবল রানা, মেয়েটিকে আদিবাসী মানুষগুলো যে ভক্তি ও সম্মান দেখাচ্ছিল তার কারণটা বোঝা গেল। 'দুঃখিত, আমি সেরকম কিছু বোঝাতে চাইনি...'

'তা হলে কী বোঝাতে চেয়েছেন?' বোল্ডার থেকে নেমে পড়ল মেয়েটি, দৃঢ় অথচ শান্ত ভঙ্গিতে মুখোমুখি হলো রানার। 'কে আপনি?' চট করে আরেকবার দেখে নিল ওর হাতে পরা ব্রেসলেটটা। 'থাই থান্ডার?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমাকে দেখে থাই বলে মনে হয়?'

'তা মনে না হলেও, হাতের ওই ডিজাইনের ব্রেসলেট থাই থান্ডারের উপরের সারির নেতারা ছাড়া আর কেউ পরে না,' বলল মেয়েটি। 'না জেনে পরে থাকলে তাড়াতাড়ি খুলে ফেলুন, কারণ

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

এটা থাই থান্ডারের এলাকা নয়।'

'জানি, এটা থাই টং-এর এলাকা,' বলল রানা।

'এও কি জানেন যে থাই থান্ডারের সঙ্গে থাই টং-এর একটা দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে?' একটু তীক্ষ্ম হলো মেয়েটির কণ্ঠস্বর। 'ওটা পরা অবস্থায় আপনাকে দেখলে,' গলায় ছুরি চালাবার ভঙ্গি করে দেখাল সে, 'থাই টং স্রেফ জবাই করে ফেলবে আপনাকে?'

'এতই সিরিয়াস দ্বন্দ্ব?' রানা ভাবল – আমার তথ্য চাই! 'কী নিয়ে বলুন তো?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল মেয়েটি।

'ব্রেসলেটটা ইচ্ছে করেই পরে আছি,' বলল রানা। 'থাই থান্ডার দেখে যাতে কেউ এগিয়ে আসে। ওদেরকে খুঁজছি আমি।'

'ওদেরকে খুঁজছেন? কেন, আপনার কি মরার শখ হয়েছে?'

রানা হাসল না। 'সত্যি কথা বলতে কী, উল্টোটাই বরং সত্যি।'

জবাব শুনে এক মুহূর্ত একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটি। তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমি উত্তরা, উত্তরা উৎকর্ণা।'

'আমি মাসুদ রানা,' উত্তরার হাতটা ধরে বলল রানা। 'বাংলাদেশী।'

'কিন্তু ট্যুরিস্ট নন,' মন্তব্য করল উত্তরা।

'বেশ বুঝতে পারছি অনেক কিছুই জানেন আপনি,' বলল রানা। 'আপনার পরিচয়টা জানতে পারি?'

যেন প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্যই মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবেন? গোলাঘরে ব্যবস্থা আছে।'

তার পিছু নিয়ে বড়সড় গোলাঘরটায় ঢুকল রানা। প্রচুর খড় রয়েছে। এমনকী রশি দিয়ে তৈরি একটা দোলনাও আছে, যেটায় শুয়ে রাত কাটানো যায়। একধারে কিছু চাদর, কম্বল, বালিশ ইত্যাদি স্তূপ করা।

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলল, 'কাল থেকে আছি এখানে। আরও দু'একদিন থাকতে হতে পারে। নায়েব টাকা-পয়সা নিয়ে এলে প্রজাদের মধ্যে বিলি করব। ঘর-বাড়ি বানাতে না পারলে ওরা থাকবে কোথায়।'

'আপনি রাজার মেয়ে, ঠিক আছে,' বলল রানা। 'কেন যেন মনে হচ্ছে সেটাই আপনার একমাত্র পরিচয় নয়।'

মাটির একটা চুলোয় আগুন জ্বলছে, পাতিলে গরম হচ্ছে খানিকটা পানি। কাঠের একটা বাক্সে বসে চা বানাচ্ছে উত্তরা। ইঙ্গিতে পাশের বাক্সটায় বসতে বলল রানাকে।

'ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করছি, আগুনটা লাগল কীভবে?' জানতে চাইল রানা।

কথা না বলে কাঁধ ঝাঁকাল উত্তরা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা, তারপর মেয়েটিকে চমকে দেওয়ার জন্য হঠাৎ জানতে চাইল, 'প্লেনটা ওখানে নেই কেন?'

চা ভর্তি মাটির কাপটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিল উত্তরা। 'আচ্ছা, বোঝা গেল,' বলল সে। 'আপনি ওই বিশেষ দেশের লোক নন, ওদের ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তাও নন।'

'যদি বলি আমি বিসিআই, তা হলে কি কিছু বুঝবেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হয়তো বুঝব, কিন্তু বুঝতে মানা আছে – নির্দেশ আছে চোখ-কান বুজে থাকতে হবে।'

'মানা আছে?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ধাঁধায় ফেলে দিলেন।'

এ প্রসঙ্গে কিছু বললই না উত্তরা। বলল, 'আমার ধারণা, প্লেনটা ওখানেই কোথাও আছে। ভাল করে খুঁজলে ঠিকই পাওয়া যাবে।'

'কী প্লেন ওটা?' সাবধানে জানতে চাইল রানা। 'কবে, কোত্থেকে এল?'

'এত কথা সত্যি আমি জানি না,' বলল উত্তরা। 'শুধু জানি

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

ওটা বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের খুব দামী একটা জেট। আমাদের অফিসে কেউ ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতেই রাজি নয়...' চেহারা দেখে বোঝা গেল মুখ ফস্কে বলে ফেলেছে কথাটা।

'সরি? আপনাদের অফিস?'

'প্লিজ, এ প্রসঙ্গে আমাকে কোনও প্রশ্ন করবেন না।' সামান্য হলেও বিচলিত দেখাল মেয়েটিকে।

'বেশ, অফিস সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করব না। তবে বাংলাদেশ সরকারের একজন অফিসার হিসেবে আমার জানার অধিকার আছে, আপনি কীভাবে জানলেন ওটা আমাদের এয়ারফোর্সের জেট?'

'আমি ওটার ফটো দেখেছি,' ধীরে ধীরে বলল উত্তরা। 'ধূসর সবুজ রঙের প্লেনটার গায়ে লেখা আছে – বাংলাদেশ এয়ারফোর্স, দুরন্ত ঈগল। দোই ইনথাননের ওপর থেকে তোলা। কোনও সন্দেহ নেই, কারণ বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের লোগোটাও পরিষ্কার চেনা যায়।'

রানার দম আটকে এল। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ফটোটা আমাকে একবার দেখাবেন, প্লিজ?'

'দুঃখিত,' বলে মাথা নাড়ল উত্তরা। 'আমার কাছে নেই ওটা।'

'কার কাছে আছে?' ঠাণ্ডা সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'কার কাছে আছে জেনে কোনও লাভ নেই,' বলল উত্তরা। 'আপনি তার নাগাল পাবেন না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রানা বলল, 'দুর্গটা সম্পর্কে বলুন। কিছু ট্রাক, বিদেশি শ্রমিক, চিনা লোকজন দেখলাম ওখানে।'

'ওটা ব্যান সপ দুর্গ, জিকো তানাই-এর আস্তানা।'

নামটা চেনা চেনা লাগল রানার, তবে ঠিক স্মরণ করতে পারল না কোথায় শুনেছে।

'জিকো তানাই থাই টং-এর চিফ,' বলল উত্তরা। 'খুন, নারীব্যবসা, ব্ল্যাকমেইল, ড্রাগস পাচার, ট্রেন্ডারবাজি – মোট কথা, এমন কোনও অপরাধ নেই যা সে করে না। এত কিছুর পর সে একজন মউজুদদারও। দুর্গটা দুর্ভেদ্য, সহজে ঢুকতে পারবেন না।' একটু থেমে আবার বলল, 'তবে আপনি যদি প্লেনটার খোঁজে এসে থাকেন, আমার ধারণা সেটা আপনি ওখানেই পাবেন।'

'সহজ না হোক, ঢোকার কোনও উপায় জানা আছে আপনার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এই পাহাড় ছাড়া এলাকার বাকি অংশ ওদের দখলে,' বলল উত্তরা। 'নিজেদের এলাকায় একটা পিন পর্যন্ত গলতে দেয় না ওরা। দুঃখিত, আমি আপনার কোনও সাহায্যে আসব না।'

'ধন্যবাদ।'

'আচ্ছা,' বিদ্রূপটুকু গায়ে না মেখে উত্তরা বলল, 'ঠিক করে বলুন তো। আপনি কি সত্যি বাংলাদেশী?'

'সন্দেহ হবার কারণ?'

'আমার একটা হিসেব আছে, সেটা মিলছে না। আপনি বাংলাদেশী হলে খোঁজ করার কথা টং লিডার জিকো তানাইয়ের সহকারী চাই-পাই দেও-কে।' উত্তরা আসলে স্বেচ্ছায় কিছু তথ্য দিচ্ছে রানাকে।

সরাসরি জানতে চাইল রানা, 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন চাই-পাই দেওই ইমরুল কায়েসকে খুন করেছে?'

'ফটোগুলো তুলেছিল আপনার মতই একজন বাঙালী, আমার এক বান্ধবীর প্রেমিক। তার নামও ইমরুল কায়েস,' বলল উত্তরা। 'হতে পারে দুজন একই লোক। আমার পরিচিত এই কায়েসও খুন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, দেওই তাকে খুন করেছে বলে শুনেছি।'

'আচ্ছা! থ্যাঙ্ক ইউ।'

'দিন, আপনার কাপটা আবার ভরে দিই,' রানার হাত থেকে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

কাপটা নিয়ে তাতে চা ঢালল উত্তরা, ওর দিকে তাকাচ্ছে না।

রানার মন বলছে যতটুকু বলবার ততটুকু নিজেই বলবে মেয়েটি, তার বেশি কিছু আদায় করা যাবে না।

'চাই-পাই দেওকে আপনি পাবেন ব্যাংককে,' বলল উত্তরা। 'পাবেন নোনথাবুরি নদীবন্দরে। ওটা টং-এর লিজ নেয়া বন্দর। কার্গো তোলার তদারকি করাই দেও-এর আসল কাজ, বিশেষ প্রয়োজনে এখানে কদিন ছিল।'

'এত কথা আপনি জানেন কীভাবে?'

'থাই টঙে আমার ইনফরমার আছে। তার কাছেই আমি প্লেনের ফটো দেখেছি। চুরি করে আমাকে দেখাতে এনেছিল, আবার জায়গামত রেখে এসেছে – দুর্গে।'

হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল উত্তরা। 'এখনই যদি রওনা হন, তাও নীচে নামতে রাত হয়ে যাবে,' ঠাণ্ডা সুরে বলল সে। 'আপনার আর দেরি করা উচিত হবে না।'

কঠিন মেয়ে, বুঝতে পারছে রানা। বাক্স ছেড়ে উঠল ও।

'চা খাওয়ানোর জন্যে ধন্যবাদ। অশেষ ধন্যবাদ বেশ কিছু তথ্য দেয়ার জন্যেও। আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে।'

'আমাকে নয়, আপনার আসলে দেখা হওয়া দরকার মোহনার সঙ্গে,' বিড়বিড় করে বলল উত্তরা, যেন জনান্তিকে।

'মোহনা? কে সে?'

কথা না বলে রানার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকল উত্তরা, তার চোখের পাপড়িগুলো ধীরে ধীরে ভিজে উঠতে দেখছে রানা।

ছয়

কদিন আগের ঘটনা।

রাজধানী ব্যাংকক, থাই কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর হেড অফিস। জেনারেল খোন কায়েন চাও-এর চেম্বার। রিভলভিং চেয়ারে অটল মূর্তির মত বসে আছেন ভদ্রলোক, চোখ-মুখ থমথম করছে।

দেশে এই মুহূর্তে সাতজন এজেন্ট উপস্থিত, জরুরি মিটিঙে তাদের সবাইকে ডেকেছেন চিফ কায়েন চাও। গত কদিনের মধ্যে এ-ধরনের এটা দ্বিতীয় মিটিং। সাতজনকে ডাকা হলেও, আজকের মিটিঙে ছয়জন উপস্থিত। একজনই মাত্র তরুণী, বাকি পাঁচজন তরুণ। এজেন্টরা ছাড়াও টিসিআই-এর অপারেশন্স চিফ সত্যশুভ চুনাভানও উপস্থিত আজকের মিটিঙে।

মিটিঙের শুরুতেই গম্ভীর সুরে জানতে চাইলেন বস্, 'মোহনা কোথায়?'

এক মুহূর্ত মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সবাই, যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কে মুখ খুলবে।

অবশেষে উত্তরাই জবাব দিল। 'সার, খুব খারাপ কী যেন একটা হয়েছে মোহনার। সে তার অফিসের দরজা বন্ধ করে সারাক্ষণ কাঁদছে। সবাই আমরা কত করে বললাম, কিন্তু দরজা খুলছে না।'

চট করে একবার অপারেশন সেকশনের হেড সত্যশুভ চুনাভানের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন টিসিআই চিফ। চেয়ারে হেলান দিলেন, সিলিঙের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারপর চোখ নামিয়ে দৃষ্টি বুলালেন বিশ্বস্ত এজেন্টদের উপর। 'ওর কী হয়েছে আমি জানি। ওকে তোমরা কেউ বিরক্ত

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

কোরো না। কাঁদছে, কাঁদতে দাও।'

'কেন, সার?' জিজ্ঞেস করল উত্তরা। 'কী হয়েছে মোহনার?'

'সেটা ওর ব্যক্তিগত বিষয়, এখানে আলোচনা না করাই ভাল,' বললেন চিফ কায়েন চাও। 'এসো, আমরা আমাদের মিটিংটা শুরু করি।'

যে যার চেয়ারে নড়েচড়ে বসল সবাই। মোহনার চেয়ারটা খালিই পড়ে থাকল।

'গতবারের মিটিঙে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, থাইল্যান্ড সম্ভবত দুই পরাশক্তির দ্বন্দ্বে অত্যন্ত কঠিন ও জটিল একটা সমস্যার মধ্যে পড়তে যাচ্ছে,' শুরু করলেন টিসিআই চিফ। 'আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম, চোখের সামনে বিরাট কোনও অন্যায় এবং দেশের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘিত হতে দেখলেও আমাদের হয়তো কিছু করার থাকবে না। ওপরমহল থেকে আমার ওপর নির্দেশ ছিল, এমন কিছু করা চলবে না যাতে দুই পরাশক্তির কারও স্বার্থে আঘাত লাগে। তা করলে এক-নম্বরটির নির্দেশে আমাদের সমস্ত ফরেন এইড তো বন্ধ করে দেওয়া হবেই, প্রয়োজনে প্রচণ্ড আঘাত হানবে তারা বিনা দ্বিধায়, অকাতরে হত্যা করবে মানুষ, গুঁড়িয়ে দেবে আমাদের বড় বড় শহর, রাজধানী। কিছুদিন আগে স্বাধীন কয়েকটি দেশে পেশিশক্তির জোরে একই কাজ করেছে ওরা, এখনও করেই যাচ্ছে; এইমুহূর্তে আরও কয়েকটি দেশকে টার্গেট করে বসে আছে। ওদের পঞ্চম টার্গেট হতে চাই না আমরা।'

এজেন্টরা চুপ করে থাকল, সবার চেহারায় বিষণ্নতার ছায়া।

'যা আশঙ্কা করেছিলাম, তারচেয়েও মারাত্মক কিছু ঘটে গেছে,' আবার শুরু করলেন টিসিআই চিফ। 'সংশ্লিষ্ট পরাশক্তির পরোক্ষ মদদে থাই থান্ডার আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র বাংলাদেশে ভয়ঙ্কর একটা অপারেশন চালিয়েছে। আমরা খবর পেয়েছি আসলে সেই শক্তিধর দেশটির নির্দেশে কয়েক হাত ঘুরে কাজটার দায়িত্ব পায় থাই থান্ডার। আমার মনে হয়, এর সঙ্গে থাই টং, তাইওয়ানিজ টং ও তাইওয়ানিজ ইন্টেলিজেন্সও...'

মাঝপথে বাধা দেওয়া হলো তাঁকে। কেউ নক করল, কিন্তু অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে দরজা খুলে ঝড়ের বেগে একটি মেয়ে ঢুকে পড়ল চেম্বারের ভিতরে।

'এসো, মোহনা,' নরম সুরে বলল অপারেশন্স চিফ সত্যশুভ চুনাভান। 'বসো।'

থাই সুন্দরী প্রতিযোগিতায় রানার্স আপ হওয়া মেয়ে মোহনা কৃত্তিকাচরণকে দেখে কেউ বলবে না যে এতক্ষণ কাঁদছিল সে। এই মুহূর্তে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে আছে মেয়েটি, চোখ দুটো যেন দু'টুকরো অঙ্গারের মত জ্বলছে।

'আমি বসতে আসিনি,' বলল মোহনা, সরাসরি বসের দিকে তাকিয়ে। 'আপনার কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাইতে এসেছি, সার।'

চেম্বারের পরিবেশ অকস্মাৎ পিন খোলা গ্রেনেডের মত হয়ে উঠল। টিসিআই চিফের সঙ্গে এই ভাষায় কেউ কখনও কথা বলবার কথা ভাবতেও সাহস পায় না।

তবে ভয়ানক কিছু ঘটল না। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন বস্, অনুরোধের ভঙ্গিতে মোহনাকে বললেন, 'প্লিজ, মাই ডিয়ার লেডি, সিট ডাউন। বিশ্বাস করো, আমি তোমার প্রতি সিনসিয়ারলি সিমপ্যাথেটিক...'

'থামুন, সার,' বাধা দিল মোহনা। 'আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন। আপনি জানতেন না ইমরুল কায়েস রানা এজেন্সির ব্যাংকক শাখার প্রধান? আর রানা এজেন্সি আসলে বিসিআই-এর একটা কাভার?'

'হ্যাঁ, জানতাম। তুমি শান্ত হয়ে বসো, মোহনা...'

'আপনি তো এ-ও জানতেন যে তার সঙ্গে আমার বিশেষ একটা সম্পর্ক আছে, কিছুদিনের মধ্যে আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছিলাম,' বলল মোহনা। 'তা হলে আমাকে আপনি সাবধান করেননি কেন যে ওই এলাকায় বন্ধু দেশের স্পাইদের কেউ

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

গেলেও থাই টং তাকে খুন করবে?'

'তুমি আসলে ভুলে গেছ, মোহনা,' শান্ত কণ্ঠে বললেন টিএসআই চিফ। 'ওপরমহল থেকে আমাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়, আমিও তোমাদেরকে সেই নির্দেশই দিয়েছিলাম – এমন কিছু করা চলবে না যাতে সুপারপাওয়ারের স্বার্থে আঘাত লাগে, তা লাগলে পাল্টা আঘাত হানবে তারা।'

'তাদের স্বার্থে আঘাত লাগার মত কী করেছিল কায়েস?'

'একটা প্লেনের ফটো তুলেছে ও, টেলিফোনে যোগাযোগ করেছে বিসিআই হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে।'

'প্লেন? কী প্লেন?' কয়েকজন একযোগে জানতে চাইল।

'সব কথা আমাদের জানা নেই। সবই ভাসা ভাসা। যদি একান্তই জানতে চাও, অপারেশন হেড যতটুকু জানে বলতে পারবে,' বললেন চিফ কায়েন চাও। 'তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, আমরা নিজেদের ঝামেলাই সামাল দিতে পারছি না, অন্য দেশের ঝামেলায় তোমাদের না জড়ানোই ভাল। একটা কথা তোমাদেরকে পরিষ্কার বুঝতে হবে, এখানে যা ঘটছে, সে-ব্যাপারে আমাদের কিছুই করার নেই। আমরা সত্যি অসহায়...'

বসকে থামিয়ে দিল মোহনা, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'এতই যখন অক্ষম ও অসহায় বোধ করছেন, আপনি পদত্যাগ করছেন না কেন, সার? কেন এমন কারও হাতে ক্ষমতা তুলে দিচ্ছেন না, যিনি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্যে আমাদেরকে কাজে লাগাতে পারবেন? যিনি আমাকে অধিকার দিতে পারবেন কায়েস হত্যার প্রতিশোধ নিতে?'

শ্রাগ করলেন টিসিআই প্রধান। 'সে কথা আমিও ভেবেছি। কিন্তু সেটাই কি সমাধান? আমি পদত্যাগ করলেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? হবে না। যিনি আসবেন তিনিও নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। তা ছাড়া, মোহনা, কায়েসের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা ছিল একান্তই ব্যক্তিগত, প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে আমরা ওর কেসটাকে অতটা গুরুত্বের সঙ্গে নিতে পারি না যে...'

'আমি তার সন্তান বহন করছি, সার,' বলল মোহনা, এবার নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল, তার দু'গাল বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। 'আমার সন্তানের বাবাকে যারা খুন করল, আমার দেশ তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না?'

হকচকিয়ে গেলেন বস্। ধীরে ধীরে মাথা নত করলেন। চেম্বারের উপস্থিত সবাই যেন দম ফেলতেও ভুলে গেছে।

এক সময় টিসিআই চিফ-এর কানে ফিসফিস করে কিছু বলল সত্যশুভ চুনাভান।

জবাবে মাথা ঝাঁকালেন টিসিআই চিফ, নীরবতা ভেঙে বললেন, 'মোহনা, তোমার যে ক্ষতি হয়ে গেছে তা পূরণ করা আমাদের সাধ্যের অতীত। আমি শুধু নিজের অক্ষমতা আর আমার আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু সবার মত তোমার প্রতিও আমার নির্দেশ – চোখ-কান বুজেই থাকতে হবে, কোনও অ্যাকশনে যেতে পারবে না, কারণ নীতি-নির্ধারকরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তাতেই দেশের মঙ্গল।

'আমার আর কিছু বলার নেই। কার কোথায় কী ডিউটি, চুনাভানের কাছ থেকে জেনে নেবে তোমরা। কাল থেকে আমি ছুটিতে যাচ্ছি।'

সবাইকে বিদায় করে দিয়ে উত্তরা ও মোহনাকে নিয়ে কনফারেন্স রুমে চলে এল চুনাভান। দীর্ঘ আলাপের পর স্থির হলো থাই থান্ডার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে ওরা দুজন। সেই সঙ্গে জানবার চেষ্টা করবে বিসিআই কাদেরকে পাঠাচ্ছে, কোথায় গিয়ে কী করতে চাইছে তারা ইত্যাদি।

দুজনে যা জানবে, সরাসরি সত্যশুভ চুনাভানের কাছে রিপোর্ট করবে তারা।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

‘মোহনা?’ রানার প্রশ্নের প্রতিধ্বনি তুলল উত্তরা। ‘ইমরুল কায়েসের সঙ্গে তার বিয়ে হতে যাচ্ছিল। মাস ছয়-সাত পর ওর একটা বাচ্চা হবে।’

‘ইয়াল্লা!’ বিড়বিড় করল রানা। ‘আপনি জানেন কোথায় পাব তাকে?’

‘ঠিক জানি না, তাকে সম্ভবত সিঙ্গাপুরে যেতে হয়েছে...’ বলল উত্তরা। একটু পর আবার বলল, ‘আপনাকেও তো ওখানে যেতে হবে।’

‘মানে?’ একদিকের ভ্রূ সামান্য একটু কপালে তুলল রানা, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। ‘আমাকে সিঙ্গাপুরে যেতে হবে কেন?’

‘কী আশ্চর্য, আপনিই না তখন বলছিলেন যে থাই থান্ডারকে খুঁজছেন!’

‘হ্যাঁ, খুঁজছি তো।’

‘থাই থান্ডার এই মুহূর্তে সিঙ্গাপুরে খুব ব্যস্ত। ওদের লিডার চক্রি চুয়ানের নাম শুনেছেন?’ জিজ্ঞেস করল উত্তরা। ‘তাকেও ওখানে পাবেন।’

‘সিঙ্গাপুরের ঠিক কোথায় পাঠাচ্ছেন আপনি আমাকে?’ জানতে চাইল রানা। ‘সেখানে আমার জন্যে ঠিক কী ধরনের ফাঁদ পাতা থাকবে?’

হেসে উঠল উত্তরা, বলল, ‘যদি সন্দেহও করেন যে আমি আপনার প্রতিপক্ষ, এবং আপনাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে চক্রি চুয়ানের আস্তানায় পাঠাচ্ছি, তাও আপনি সেখানে একবার ঢু মারতে যাবেন।’

‘অর্থাৎ এসপিওনাজ আপনি খুব ভালই বোঝেন,’ মন্তব্য করল রানা।

‘নো কমেন্ট,’ বলল উত্তরা। ‘ফাঁদটার ঠিকানা মুখস্থ করে নিন। ক্যাসিনোর নাম, বিগ ডিল। ওটা আয়ার রাজা রোডে, মালিক চক্রি চুয়ান।’

নিজের অজান্তেই বাম কবজিতে পরা ব্রেসলেটের উপর চোখ চলে গেল রানার। ‘ভাগ্যটা দেখছি সত্যি ভাল, তথ্যের একটা অফুরন্ত উৎস পেয়ে গেছি।’

‘সিঙ্গাপুরে থাই থান্ডারের বেশ কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সেফহাউস থাকলেও, ওখানকার পুলিশের ভয়ে খুব সাবধানে চলাফেরা করে ওরা। আমি বলতে চাইছি, ওখানে ওরা খুব বেশি স্পর্শকাতর, কাজেই সাবধান।’

‘এখনও কি ওদের লিডার বুকরিত প্রেমজ? নাকি নতুন কেউ এসেছে?’ জানতে চাইল রানা।

‘সাধারণত বস্ খুন না হলে নেতৃত্ব বদল হয় না,’ বলল উত্তরা। ‘এবারও তাই হত, তবে প্রেমজ অত্যন্ত চালাক লোক বলে হয়নি। তাকে কে খুন করবে, আগেভাগে বুঝে ফেলে সে, তাই তার হাতে দলের ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে বিদেশে চলে গেছে।’

‘কাকে সে তার সম্ভাব্য খুনি বলে সন্দেহ করেছিল?’

‘কাকে আবার, চক্রি চুয়ানকে।’

‘অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, উত্তরা।’

‘মিস্টার মাসুদ রানা, এবার আপনাকে যেতে হয়,’ বলল উত্তরা। ‘কারণ সূর্যটা ডুবে গেলে অন্ধকারে আপনাকে একা ছাড়তে আমার বিবেকে বাধবে। অথচ এখানে আপনার থাকাও চলে না। কাল সকালে প্রজারা এসে যদি দেখে...’

হাত তুলে দেখাল রানা। ‘এখানে খড়ের কোনও অভাব নেই, আমাকে লুকিয়ে রাখতে আপনার কোনও সমস্যা হবে না। তা ছাড়া আমরা তো চারদেয়ালের ভেতর রয়েছি, কী করে বুঝছেন সূর্য ডুবে যায়নি?’

মৃদু শব্দে হেসে উঠল উত্তরা। ‘ওহ্, ইউ আর ইমপসিবল!’

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

সাত

পরদিন

ব্যাংকক। হোটেল শেরাটন ইন্টারন্যাশনাল। একটা ট্যাক্সি নিয়ে রাত দুটোয় রওনা হলো রানা। সঙ্গে লাবণী রয়েছে, নোনথাবুরি নদীবন্দরে যাবে ওরা।

পৌঁছাতে এক ঘণ্টা সময় লাগল। সমুদ্রবন্দর থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার উত্তরে জায়গাটা। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে সরু কয়েকটা সাইড রোড ধরে এল ওরা। নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে তার কাছাকাছি, বন্ধ একটা ওয়্যারহাউসের পাশে ঘাপটি মেরে বসে থাকল। কাত করে রাখা কয়েকটা খালি ড্রাম ওদেরকে আড়াল দিচ্ছে, সেখান থেকে অন্ধকারে তাকিয়ে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করছে। দুজনেই ওরা সশস্ত্র।

বেশ কজন লোক, অলস পিঁপড়ের মত একা একা কার্গো শিপে মাল ভরছে। কাছাকাছি আরেকটা ওয়্যারহাউসের ভিতরে সম্ভবত বেযমেন্ট আছে, কুলিরা প্রত্যেকে সেখান থেকে একটা করে কাঠের বাক্স তুলে আনছে। ওয়্যারহাউস থেকে বেরিয়ে ডক পেরুচ্ছে তারা, তারপর গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক পার হয়ে উঠে যাচ্ছে কার্গো শিপে। ওয়্যারহাউসের চারপাশ ফ্লাডলাইটের আলোয় দিনের মত আলোকিত, গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কও তাই। মাঝখানটা অন্ধকারের কালো চাদরে মোড়া।

কুলিরা প্রায় সবাই বিদেশি, মাত্র এক কি দুজন চিনা। থাই নেই একজনও। সব মিলিয়ে বিশ-বাইশজন হবে তারা। কারও মধ্যেই খুব একটা তাড়াহুড়ো নেই। চিনারা ওয়্যারহাউসের গেটে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে, প্রত্যেকের হাতে কারবাইন। রানা ভাবল, উত্তরার কথা সত্যি হলে, এই নোনথাবুরি থাই টং-এর লিজ নেওয়া বন্দর। আর টং মানেই চিনাদের কারবার। কাজেই এখানে চিনারাই তো পাহারায় থাকবে।

রানা লক্ষ করল, কাঠের বাক্সগুলো বিভিন্ন আকৃতির। দু'একটা বাক্সের ঢাকনি খুলে গেছে, ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে শাক কিংবা সবজি। ব্যাংকক থেকে পাঁচশো মাইল দূরের দুর্গে শিপে করে তাজা তরি-তরকারি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কোনও পাগলেও এটা বিশ্বাস করবে না।

রানা ভাবছে, জিকো তানাই থাই টং-এর চিফ। সে এখন ব্যান সপ দুর্গে আছে। তার সহকারী চাই-পাই দেও। কোথায় সেই দেও? তার না নোনথাবুরি নদী বন্দরে কার্গো তোলা তদারকি করবার কথা?

কী করা যায় ভাবছে রানা।

'মাসুদ ভাই,' হঠাৎ ওর কানের কাছে ফিসফিস করল লাবণী। 'গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক ছাড়া অন্য কোনও পথে জাহাজটায় চড়া যায়?'

সামনের দিকে ঝোঁকার জন্য হাঁটুর উপর কনুই ঠেকাল রানা। 'তা হয়তো যায়। কিন্তু এই কার্গো শিপ যে ব্যান সপ দুর্গে যাচ্ছে, তার নিশ্চয়তা কী?'

এই সময় ওয়্যারহাউসের চিনা গার্ডদেরকে সচকিত হয়ে উঠতে দেখল ওরা। কাঁধ থেকে কারবাইন নামিয়ে হাতে নিল তারা, অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল, তারপর ওয়্যারহাউস থেকে বেরিয়ে আসা এক লোককে একযোগে ঠকাস করে স্যালুট করল।

লোকটা দীর্ঘদেহী, গায়ের রঙ হলুদ, চোখ দুটো এত ছোট যে সরু দাগের মত লাগে। সাদা সুট পরে আছে, বুকের কাছে বাটনহোলে লাল গোলাপ আটকানো। হাতে একটা চুরুট।

'বেযমেন্ট খালি হতে আরও চল্লিশ মিনিট লাগবে,' চিনা ভাষায় বলল লোকটা। 'আমি শিপে উঠছি, কাজটা শেষ হলে

www.MurchOna.com

আমাকে রিপোর্ট করবে।'

'ইয়েস, সার, মিস্টার চাই-পাই দেও!' গার্ডদের লিডার আরেকবার স্যালুট করল।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের দিকে এগোল দেও। এক মিনিটের জন্য অন্ধকার গ্রাস করল তাকে। রানার ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে পিছন থেকে লাফিয়ে পড়ে লোকটার উপর, ছুরির হাতল পর্যন্ত ঢুকিয়ে দেয় হৃৎপিণ্ডে। অবাস্তব চিন্তা, জানে ও। কুলিরা দুই সারিতে আসা-যাওয়া করছে, গার্ডরাও তাকিয়ে আছে তাদের কর্মকর্তার দিকে, বোকার মত কিছু করতে গেলে স্রেফ ধরা খেয়ে মারা পড়তে হবে।

'শুনলেন, মাসুদ ভাই?' আবার ফিসফিস করল লাবণী।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'জাহাজটা ব্যান সপে যাক বা না যাক, ওটায় চড়তে হবে আমাদের।'

'সেক্ষেত্রে, আমাদেরকেও কুলি হতে হবে।'

মাথা ঝাকাল রানা। লক্ষ করল, লোকগুলো আসা-যাওয়া করছে সময়ের একটা ফাঁক রেখে। সেটা এক মিনিটের কিছু বেশি হবে তো কম নয়।

প্রত্যেকেই তারা নিজের মাথায় একটা করে ভাঁজ করা গামছা রেখেছে, শক্ত বাক্সের চাপ থেকে খুলিটাকে রক্ষা করবার জন্য। সবার পরনে একই পোশাক – এক রঙা পুরানো ফতুয়া, জিনস ও জুতো। মাথায় বাক্স নিয়ে ডক ধরে হাঁটবার সময় গতি মন্থর, জাহাজ থেকে নেমে ওয়্যারহাউসের দিকে ফেরার সময় প্রায় ছুটছে।

ওদের দুজনকে কাবু করতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল রানা। কাজটা করতে হবে যখন ওরা জাহাজ থেকে খালি মাথায় ফিরতি পথে থাকবে। টার্গেট করতে হবে একজন ছোট আর একজন বড় সাইজের কুলিকে।

ওরা নিজেরাও জিনস পরে আছে, কিন্তু কুলিদের জিনস পুরানো ও ছেঁড়া, কাজেই ওগুলো বদলাতে হবে। আর দরকার ফতুয়া ও চামড়ার পুরানো জুতো, জিনসের মত এগুলোও ছোট-বড় হতে হবে। এবং কোথাও কোনও রক্ত লাগা চলবে না।

নিজের ওয়ালথারটা বের করে উল্টো করে ধরল রানা। লাবণীর হাতেও তার ছোট্ট পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছে।

'এখানে অপেক্ষা করো,' ফিসফিস করল রানা। 'কাভার দাও আমাকে।'

গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক থেকে নেমে ওয়্যারহাউসের দিকে এগিয়ে আসছে একজন কুলি। অন্ধকার ডকে আরেক কুলিকে পাশ কাটাল সে। কিছুক্ষণের বিরতি। মাথায় ছোট একটা বাক্স নিয়ে লোকটাকে আবার ফিরে আসতে দেখল রানা, হাত দুটো মাথার উপর তুলে বাক্সটা ধরে আছে। গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক ধরে উঠতে শুরু করল সে। গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের মাথায় এক লোক পাশ কাটাল তাকে, ঢাল বেয়ে নীচে নেমে আসছে। ছোটখাট কাঠামো, লাবণীর চেয়ে সামান্যই বড় হবে। এর পরিচ্ছদ দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে হবে। লাবণীর কাঁধটা একবার ছুঁয়ে সরে গেল রানা।

অন্ধকার থেকে না বেরিয়ে সাবধানে এগোচ্ছে রানা, কুঁজো হয়ে আছে পিঠটা। আলো থেকে অন্ধকারে ঢুকল লোকটা, মাথায় বোঝা না থাকায় হনহন করে হাঁটছে। অন্ধকারে ঢুকে পাঁচ পা মাত্র এগিয়েছে সে, এই সময় তাকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল রানা। পিস্তলের বাঁট দিয়ে গায়ের জোরে তার কপালে মারল ও।

এক আঘাতেই চোখ উল্টে গেল লোকটার। মাথা থেকে বাক্সটা পড়ে যাচ্ছে দেখে খপ করে ধরে ফেলল রানা। ওর পাশে প্রায় নিঃশব্দে ঢলে পড়ল অজ্ঞান লোকটা।

বাক্সটা মাথায় তুলল রানা, তারপর একটা হাত ধরে লোকটাকে টেনে আনল ড্রামের আড়ালে।

এরইমধ্যে নিজের শার্ট ও জিনস খুলে ফেলেছে লাবণী। লোকটার গা থেকে এক এক করে সব খুলছে ও, পাশে বসে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

আলো-আঁধারির উপর চোখ বুলাচ্ছে রানা। এবার বড়সড় একজন কুলি দরকার, ওর কাঠামোর সঙ্গে যতটা বেশি মেলে। ইতিমধ্যে দুজনকে দেখেছে, যাদেরকে দিয়ে কাজ চালানো যাবে। একজন জাহাজে উঠেছে, আরেকজন ওয়্যারহাউসে ঢুকেছে। দুজনেই তারা চিনা।

রানা তাকিয়ে আছে, আরও দুজন ছোট আকৃতির লোক হেঁটে গেল। ইতিমধ্যে অজ্ঞান লোকটার পরিচ্ছদ খুলে পরে নিয়েছে লাবণী। হোলস্টার সহ নিজের বেল্টটাও জড়িয়েছে কোমরে। ওই বেল্টের সঙ্গে জোড়া লাগানো দুটো খাপে ছুরি ও বিনকিউলারও লুকানো আছে। সব চুল মাথার মাঝখানে জড়ো করে ভাঁজ করা গামছা দিয়ে ঢেকে ফেলেছে বলে একহারা একটা কিশোর ছেলের মত লাগছে ওকে।

রানার বাছাই করা লোক দুজনের একজন গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক ধরে নেমে আসছে। ঢালে আরেক লোককে পাশ কাটাল সে, মাথায় বাক্স নিয়ে উপরে উঠছে। আবার এগোল রানা। প্রথমে যেমন আন্দাজ করেছিল ও, আকারে তার চেয়ে বড় লোকটা। অন্ধকারে ঢুকে আগের লোকটার চেয়ে ধীর পায়ে হাঁটছে। পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত করবার প্রস্তুতি নিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল রানা।

নিশ্চয়ই ষষ্ঠইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিয়েছে, অকস্মাৎ ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল চিনা লোকটা, ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল পিছনদিকে। টার্গেট ঠিক থাকল না, ফলে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল রানা। ওয়ালথারের বাঁট আঘাত করল লোকটার ঘাড়ে।

ছুটে আসছিল রানা, গতির সেই ঝোঁককে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। লোকটাকে পাশ কাটাচ্ছে ও, বাম হাত দিয়ে খপ করে তার শার্ট খামচে ধরল। ঠিক তখনই প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল লোকটা ওর পেটে।

চোখে সরষে ফুল দেখছে, তারপরও লোকটাকে ফেলে দেওয়ার জন্য শার্টটা ধরে টানাটানি করছে রানা। ঠিকই ভারসাম্য হারাল সে, আর সেই সুযোগে তার গলায় হাত দিল ও। লোহার মত শক্ত শরীর লোকটার, অত্যন্ত শক্তিশালী। এ লোক চেঁচাবে না। তার ধারণা, যে-ই লাগতে আসুক, সাইজ করে দেবে তাকে।

লোকটার পিছনে রয়েছে রানা। বাম হাতে ওর গলা আঁকড়ে ধরেছে। পিছনদিকে কনুই চালাল চিনা। সেটা এড়াবার জন্য শরীরটাকে সিকি পাক ঘুরিয়ে নিল রানা। দুজনেই ওরা নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করছে। দু-জোড়া জুতোও ডকে ঘষা খেয়ে কর্কশ শব্দ তৈরি করছে।

শরীরটাকে মুচড়ে রানার হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল লোকটা। পিস্তলের বাঁট দিয়ে ওর পাঁজরে বাড়ি মারল রানা। লোকটা বোধহয় কিছু অনুভবই করল না। এরপর ওর মাথার পিছনে মারল রানা। এবার সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকল চিনা।

রানার হাত ধরল, টান দিয়ে নিজের গলা থেকে ওটাকে নামাতে চাইছে। তারপর সামনের দিকে ঢলে পড়তে শুরু করল সে, রানাকে টানছে, ওর পা দুটো যাতে শূন্যে উঠে যায়।

আড়ষ্ট হলো রানা, পা দুটোকে সামান্য ফাঁক করে নিল। লোকটার গলাকে ছাড়িয়ে কাঁধে গিয়ে পৌঁছাল ওর বাম হাত, কণ্ঠনালীতে প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে। লোকটা তার গোড়ালি ঠুকে ওর পায়ের পাতা থেঁতলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল বারকয়েক। রানা ওর হাতের পেশি যতটা সম্ভব শক্ত করে উইন্ডপাইপে চাপ বাড়িয়েই যাচ্ছে। চিনা প্রতিপক্ষ ওর হাত খামচে ধরেছে। এবার পিস্তলের বাঁট দিয়ে মাথার পিছনে আরও দুবার আঘাত করল রানা।

এতক্ষণে লোকটার পেশিতে ঢিল পড়তে শুরু করল। আবার আঘাত করল রানা। হাত দুটোর উপর তার নিয়ন্ত্রণ থাকল না। বড়শিতে ঝুলে থাকা মাছের মত ঝাঁকি খাচ্ছে এখন। গলাটায় চাপ আরও বাড়াল রানা। হাত দুটো শরীরের পাশে ঝুলে পড়ল চিনা দৈত্যের। ঢলে পড়ল মাটিতে।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

ঝুঁকে তাকে সিধে করল রানা, তারপর দু'হাতে ধরে তুলে নিল কাঁধে। ঘুরতে যাচ্ছে, এই সময় গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক থেকে আরেক চিনাকে নেমে আসতে দেখল। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে লোকটা।

আড়ষ্ট একটা মুহূর্ত, জমে গিয়ে দুজনেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটা দশ ফুট দূরে, লাফ দেওয়ার জন্য ব্যবধানটা খুব বেশি হয়ে যায়; আর রানার কাঁধে রয়েছে ভারী বোঝা। আকস্মিক বিস্ময়ের শিকার লোকটা। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ দুটো। কেউ তার মুখের ভিতর আস্ত আপেল ভরে দেবে, হাঁ করে থাকার ভঙ্গি সেরকমই। হঠাৎ শ্বাস নিতে শুরু করায় তার বুক চওড়া হচ্ছে।

এত দ্রুত গতি, দৃষ্টি দিয়ে কোনও রকমে অনুসরণ করতে পারল রানা। অন্ধকার থেকে স্যাঁৎ করে বেরিয়ে এল সরু একটা হাত, সশব্দে চাপা দিল খোলা মুখ। একটা ছুরির ফলা ঝিক করে উঠল অন্ধকারে। পিঠ বাঁকা করল লোকটা, চোখ দুটো আরও খুলে গেল। সেই চোখ থেকে প্রাণের সমস্ত লক্ষণ নিঃশেষে মুছে যেতে দেখছে রানা। সামনের দিকে ঝুঁকল সে, ডকে হাঁটু গাড়ল। একটা হাত খামচে ধরে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে লাবণী, রানাকে পাশ কাটিয়ে ড্রামগুলোর দিকে এগোচ্ছে।

তার পিছু নিয়ে ওখানে পৌঁছেই কাঁধ থেকে বোঝাটা নামাল রানা, দ্রুত হাতে এক এক করে তার পরিচ্ছদ খুলে নিচ্ছে। লাশটার পরনের কাপড়ে ছুরির ফলা মুছল লাবণী, তারপর ওটা নিজের বগলের কাছে বাহুতে বাঁধা খাপের ভিতর রেখে দিল। চারপাশে নজর রাখছে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে।

বুট ছাড়া বাকি সবই ফিট করল। ওগুলো একটু ঢিলে লাগছে। কুলির পরিচ্ছদ পরা শেষ করে হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে লাবণীর পাশে চলে এল রানা। 'আমি ওয়্যারহাউসে যাচ্ছি,' বলল ও, পিস্তলের দুটো এক্সট্রা ক্লিপ ভরল নোংরা জিনসের পকেটে। 'ত্রিশ সেকেন্ড পর পিছু নেবে তুমি।'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল লাবণী। রওনা হলো রানা, কাঁধে হাত পড়ায় স্থির হয়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে লাবণীর দিকে তাকাল ও।

দু-হাতে ধরে ওকে নিজের দিকে ফিরাল লাবণী। তার ঠোঁটের কোমলতা স্পর্শ করল রানার ঠোঁট। দীর্ঘ এক সেকেন্ড পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। তারপর রওনা হয়ে গেল রানা।

মাথার মাঝখানে ভাঁজ করে বসানো গামছাটার দু'প্রান্ত মুখের দু'পাশে খানিকটা করে ঝুলিয়ে দিয়েছে রানা, চেহারাটা যাতে কিছুটা ঢাকা পড়ে। ওয়্যারহাউসের সামনে ফ্লাডলাইটের তৈরি আলোর বৃত্তে পা রাখল ও। গার্ডরা সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। মাথায় বাক্স নিয়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছে এক লোক। একবারও না তাকিয়ে রানাকে পাশ কাটাল সে। রানা আশা করল, রওনা হওয়ার আগে লোকটাকে পাশ কাটাতে দেবে লাবণী। খোলা গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল ও।

আরেকটু হলে দেরি করে ফেলত ওরা। বেযমেন্টে আর মাত্র নয়টা বাক্স পড়ে আছে। ধাপ বেয়ে গুহার মত বড় একটা কামরায় নেমে এসেছে রানা। দরজার কাছে চেয়ারে বসে রয়েছে এক টেকো চিনা, হাতে ক্লিপবোর্ড। প্যান্ট-শার্ট পরা লোকটা কার সঙ্গে যেন কথা বলছে ফোনে: 'স্পেশাল ইঞ্জিন ফিট করা আছে, সার। পনেরো ঘণ্টার বেশি লাগবে না।'

তাকে পাশ কাটিয়ে বাক্সগুলোর দিকে এগোল রানা, শুনতে পেল রিসিভারে এখনও কথা বলছে সে: '...ইয়েস, মিস্টার জিকো...জী, দুটো মেসেজ পেয়েছি আমি...জী, তাইওয়ানিজ টং লিডার মো পাই কপ্টার নিয়ে রওনা হবেন... জী... আর ওদিক থেকে নেগোশিয়েশনের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কাউকেই পাঠানো হবে... না, চক্রি চুয়ান নিজে যাবেন না,

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

থাইল্যান্ডে নেই তিনি...হতে পারে, তাঁর বান্ধবীকে পাঠাতে পারেন...জী, তার অপেক্ষায় আমরা রওনা হতে এক ঘণ্টা দেরি করব।'

মাথায় বড় একটা বাক্স তুলল রানা। মাথাটা গামছার প্রান্ত দিয়ে ঢেকে উঠে আসছে বেযমেন্ট থেকে। ওর দিকে একবারও তাকায়নি লোকটা।

আকারে বড় হলেও, বাক্সটা তেমন ভারী নয়। ধীরে ধীরে ওয়্যারহাউসে উঠেছে রানা, অথচ লাবণীকে দেখতে পাচ্ছে না। সশস্ত্র গার্ডদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল ফ্লাড লাইটের আলোয়, এতক্ষণে দেখল ওর দিকে এগিয়ে আসছে লাবণী।

হাঁটার গতি কমাল রানা। ওকে পাশ কাটাল লাবণী, মুখ গামছা দিয়ে কিছুটা ঢাকা। সামনে তাকাতে আরেক লোককে গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক থেকে নামতে দেখল রানা।

কয়েকটা ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করছে ও। দেখে এসেছে ছোট বাক্সগুলো বেশি ভারী, জানা না থাকায় একটা ছোট বাক্সই মাথায় তুলবে লাবণী। তোলার সময় কষ্ট পাচ্ছে দেখলে চেয়ারে বসা লোকটার মনে সন্দেহ জাগবে। রানা লক্ষ করেছে, ওখানে আর মাত্র তিনটে ছোট বাক্স আছে।

গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক থেকে নেমে আসা লোকটা পাশ কাটাচ্ছে রানাকে। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল ও। ভয়ে শীত শীত লাগছে ওর। এই লোকটা যদি লাবণীর মুখ দেখতে পায়...

গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কে পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা, দেখল ওয়্যারহাউস থেকে আলোর বৃত্তে বেরিয়ে আসছে লাবণী। ঠিক ঢোকার সময় তাকে পাশ কাটাল লোকটা, কেউ কারও দিকে তাকাল না। মাথায় ছোট বাক্সই নিয়েছে লাবণী, বয়ে আনতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হলো না।

গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক ধরে আবার উঠতে শুরু করল রানা।

বাক্সগুলো কোথায় যাচ্ছে জেনে নিতে কোনও সমস্যা হলো না। ট্রেইলে প্রচুর সূত্র ছড়িয়ে আছে – সবজির টুকরো ও খড়। জাহাজের বাম দিকে চলে গেছে ট্রেইলটা। সেটার পিছু নিয়ে একটা হ্যাচওয়েতে পৌঁছাল রানা, ধাপ বেয়ে নীচে নামবার সময় ভাবল, এই হোল্ডের ভিতরে চব্বিশ ঘণ্টা আটকা থাকতে হবে?

চব্বিশ ঘণ্টায় কত দূর যাবে এই কার্গো শিপ? স্পেশাল ইঞ্জিন খুব বেশি হলে ঘণ্টায় পঁচিশ নট স্পিড তুলবে। চব্বিশ ঘণ্টায় কমবেশি পাঁচশো কিলোমিটার যেতে পারবে।

তার মানে কি ব্যান সপ দুর্গে যাচ্ছে দেও?

ধাপ বেয়ে নামছে রানা, খালি হাতে এক লোককে উঠে আসতে দেখল। থেমে ওকে পাশ কাটাবার জায়গা ছেড়ে দিল সে। তবে পরস্পরের দিকে তাকাল না কেউ। বাঁক ঘুরে মইটা নেমে গেছে একটা চেম্বারে। কাঠের বাক্সে প্রায় ভরে গেছে জায়গাটা। ভিতরে এই মুহূর্তে রানা ছাড়া আর কেউ নেই।

মাথার বাক্সটা ডেকে নামিয়ে রেখে চারদিকে চোখ বুলাল রানা। বাক্সগুলো মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত কয়েক সেকশনে ভাগ করে সাজানো হয়েছে। এরইমধ্যে দুটো সেকশন মোটা রশি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়েছে। ওরা যে বাক্সগুলো নিয়ে আসছে সেগুলো দিয়ে তৈরি হবে তৃতীয় ও শেষ সেকশন। রানা চিন্তা করল, সেকশনগুলোর মাঝখানে শেষ পর্যন্ত খালি কোনও জায়গা থাকবে তো?

পা চালিয়ে দু'নম্বর সেকশনের সামনে চলে এল রানা, ব্যস্ত হাতে ওটাকে বেঁধে রাখা একটা লাইন খুলে ফেলল। বাক্স বেয়ে সেকশনটার মাথায় চড়ল, উপরের একটা বাক্স খানিকটা টেনে এনে উঁকি দিয়ে দেখল কী আছে পিছনে।

পিছনে আরেক সারি বাক্স। ওই সারির উপরের বাক্সটাও খানিক টানল রানা। ওটার পিছনে ফাঁকা জায়গা দেখতে পেল – ছ'ফুট চওড়া, দৈর্ঘ্যে চেম্বারের সমান। বাক্সগুলো সরানো অবস্থায় রেখে নীচে নেমে এল ও।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

নীচে নেমে লাইনটা আবার বাঁধল রানা, তবে যে বাক্স দুটো সরিয়েছে সেগুলো বাদে। লাইনটা টান টান করে বাঁধার কাজ শেষ করেছে, এই সময় পায়ের আওয়াজ ভেসে এল মইয়ের ধাপ থেকে। ঝুঁকে নিজের বাক্সটা আঁকড়ে ধরল রানা, যেন এইমাত্র ওটাকে নামিয়েছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে নেমে এল লাবণী। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে মাথা থেকে বাক্সটা নামাতে সাহায্য করল রানা।

'কেউ কিছু সন্দেহ করেনি তো?'

এত হাঁপিয়ে গেছে, কথা বলতে পারছে না লাবণী, শুধু মাথা নাড়ল। পিঠে একটা হাত রেখে তাকে কাছে টেনে নিল রানা। একহারা শরীরটা গরম হয়ে আছে। ওর গায়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে সে, তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল রানা। তারপর তার চিবুকটা উঁচু করল, মুখটা যাতে দেখতে পায়।

'আর মাত্র একটা কাজ বাকি,' বলল রানা। 'তারপর সারাটা পথ আমরা বিশ্রাম নিতে পারব।'

দুর্বল ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে রানাকে ছেড়ে একটু সরে গেল লাবণী।

উপরের একটা মই থেকে পায়ের ভারী আওয়াজ ভেসে আসছে। সমানে টেনে আনা বাক্স দুটোর দিকে দ্রুত উঠে যাচ্ছে রানা। খানিকটা উঠে একটা হাত লম্বা করল নীচের দিকে, সেটা শক্ত করে ধরে ওর সঙ্গে লাবণীও উঠছে। বাক্সগুলো আরও খানিক টেনে আনল ও, লাবণী যাতে ফাঁক গলে ভিতরে ঢুকতে পারে।

মাথাটা আগে ঢোকাল লাবণী। অপরদিকে পৌঁছে একপাশে হাত বাড়াল, একটা বাক্স আঁকড়ে ধরে টেনে নিল পা দুটো, তারপর নীচের দিকে নামিয়ে দিল সেগুলো। বাক্স বেয়ে মেঝের দিকে নেমে যাচ্ছে।

ভারী পায়ের শব্দ এখন ভেসে আসছে দ্বিতীয় মইয়ের ধাপ থেকে।

ভিতরে ঢুকল রানা, পিছনের আলগা বাক্সগুলো টেনে আনল জায়গা মত। তারপর বাক্সের দেয়াল বেয়ে নেমে এল মেঝেতে, লাবণী যেখানে শুয়ে আছে।

জুতোর আওয়াজ চেম্বারের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা বাক্সের গায়ে ঘষা খেল আরেকটা বাক্স। জুতোর আওয়াজ উঠে গেল মই বেয়ে।

লাবণী শুয়ে আছে ভ্রূণের আকৃতি নিয়ে। তার পাশে লম্বা হলো রানা। এক মুহূর্ত পর অনুভব করল লাবণী ওর বুকে মাথা রাখছে।

ইতিমধ্যে তার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে গভীর হলো সেটা। ঘুমিয়ে পড়ল অচিরেই।

খড়গুলো শুকনো ও গরম। অন্য কোনও উপায় নেই, জাহাজ যতক্ষণ না গন্তব্যে পৌঁছায় ততক্ষণ এখানেই থাকতে হবে ওদেরকে। কান পেতে অপেক্ষায় থাকা ছাড়া আর কোনও কাজও নেই। ক্ষুৎ-পিপাসায় কষ্ট পেতে হবে, জানে, তবে সেটাকে মোটেও গুরুত্ব দিচ্ছে না রানা। ভাবছে গন্তব্যে পৌঁছে প্রথমেই যদি দেওটাকে মারা যায়, প্রতিশোধ নেওয়ার কাজটা শুরু হয়ে যায় তা হলে।

আট

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

লাবণী ঘুমাচ্ছে। ইস্পাতের বাল্কহেডে হেলান দিয়ে রানা শুনতে পেল শেষ সেকশনটা রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধার সময় কয়েকজন লোক ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে। মই বেয়ে উঠে গেল তারা, উপর থেকে ভেসে এল হ্যাচ বন্ধ করবার কর্কশ ধাতব আওয়াজ।

এক ঘণ্টা নয়, মাত্র ত্রিশ মিনিট পর কেঁপে উঠল কার্গো শিপ। রানা ভাবল, তারমানে থাই টং বস জিকো তানাইয়ের সঙ্গে নেগোশিয়েশনের জন্য কেউ একজন উঠেছে জাহাজে। কীসের নেগোশিয়েশন, কার স্ত্রী, কিছুই জানা নেই ওর। তবে মনে পড়ল, উত্তরা কথায় কথায় বলেছিল যে থাই থান্ডারের সঙ্গে থাই টঙের কী নিয়ে যেন একটা দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। সেটাই বোধহয় মিটমাট করবার চেষ্টা চলছে।

আওয়াজ শুনে বোঝা গেল অত্যন্ত শক্তিশালী ইঞ্জিন। রওনা হয়ে গেল ওরা। শেষ রাতের নদীপথ ফাঁকা হওয়ারই কথা। রানা আন্দাজ করল, কার্গো শিপের স্পিড ঘণ্টায় পঁচিশ নট-এর কম নয়। দুই হাজার বিশ গজে এক নট। এই স্পিডে চললে কমবেশি পনের ঘণ্টার মধ্যে ব্যান সপ দুর্গে পৌঁছে যাবে ওরা, ওটাই যদি কার্গো শিপের গন্তব্য হয়ে থাকে।

ভোর ছ'টার দিকে জাহাজের দোলায় ঘুম চলে এল রানার চোখে। পাশ থেকে মৃদু শব্দ করল লাবণী। ওর বুকে তার চোখের পাতা নড়েচড়ে উঠল।

'মাসুদ ভাই?' খসখসে গলায় ডাকল সে, কিছুটা ঘুমে জড়ানো।

'উম্‌ম্‌?'

'কতক্ষণ ঘুমিয়েছি আমি?'

'ঘণ্টা দুয়েক। ঘুমটা তোমার দরকার ছিল।'

'তুমি ঠিক জানো, কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'সম্ভবত টং লিডারের হেডকোয়ার্টার ব্যান সপ দুর্গে,' বলল রানা।'

'ওখানে আমরা প্লেনটা খুঁজব,' বলল লাবণী, তারপর জানতে চাইল, 'আর?'

'সম্ভব হলে থাই টং চিফ জিকো তানাই ও তার সহকারী চাই-পাই দেও-এর একটা ব্যবস্থাও করতে হবে,' বলল রানা।

'বসকে তুমি কথা দিয়েছ,' মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে বলল লাবণী।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর আবার ডাকল লাবণী। 'মাসুদ ভাই।'

'উম্‌ম্‌?'

'ঘুমাচ্ছ?'

'না।'

'একটা কথা।'

'বলো।'

'তখন...তোমাকে আমি...চুমো খেলাম...আমার আসলে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না...'

'মানুষ খুন করার পর এরকম অনেকেরই হয়, অদম্য ভাবাবেগ। এটা অস্বভাবিক কিছু নয়।'

'না, তা হয়তো নয়,' বলল লাবণী। 'তবে তোমার সঙ্গে এরকম কিছু ঘটবে বলে কখনও ভাবিনি।'

'নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে?'

সঙ্গে সঙ্গে নয়, প্রায় দশ সেকেন্ড পর জবাব দিল লাবণী, 'না। নিজেকে আমার লোভী মনে হচ্ছে।' তারপর ব্যগ্র ভঙ্গিতে নিজের ঠোঁট জোড়া রানার ঠোঁটের কাছে তুলল সে।

এরপর মেয়েটিকে কাছে টেনে না নিয়ে উপায় কী রানার।

ক্ষুৎ-পিপাসা নিয়ে রাত কাটানো কষ্টকর, অন্ধকার ও গুমোট পরিবেশও বিরাট সমস্যা, তবে ওদের জন্য নয়। পরস্পরকে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

নিয়ে এত ব্যস্ত থাকল ওরা, এ-সব কেউ খেয়ালই করেনি। দুজনেই সক্ষম ও শক্তিশালী, পরস্পরকে আনন্দে ভাসিয়ে দিতে কার্পণ্য করল না এতটুকু।

বিরতির সময় নিচু গলায় গল্প করল ওরা।

এক সময় প্রসঙ্গটা রানাই তুলল। 'ভাবছি এই সম্পর্কটা কোথায় নিয়ে যাবে আমাদেরকে।'

'আসলে কোথাও না,' শান্ত সুরে বলল লাবণী। 'এ থেকে পারমানেন্ট কিছু পাওয়া যায় না কোনওদিন। আমাদের যা কাজ, সারাক্ষণ চলার মধ্যে থাকতে হয়। কোনও বাঁধন থাকবে না। থাকবে না কোনও পিছুটান। একটা থেকে লাফ দিয়ে আরেকটা অ্যাসাইনমেন্টে চলে যাবার পথে কোনও বাধা গ্রহণযোগ্য নয়।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সে। 'আমাদের ব্যক্তিগত জীবন থাকতে নেই।'

'এই জীবন স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছি আমরা,' তার সুরে সুর মিলিয়ে মন্তব্য করল রানা। 'কোনও কিছু আমাদেরকে বাধ্য করছে না। এই স্বাধীনতার মূল্য অনেক।'

তারপর এক সময় ওরা পরীক্ষা করল বাক্সগুলোয় কী আছে। লাইটার জ্বালল রানা, ঢাকনি খোলা একটা বাক্স থেকে শাক-সবজি বের করল। হাত ঢুকিয়ে দেখল ভিতরে মসৃণ কী যেন রয়েছে। জিনিসটা চৌকি আকৃতির। বের করার পর দেখা গেল চকচকে ইস্পাতের বাক্স ওটা, লম্বা ও চওড়ায় প্রায় দুই ফুট। চারদিকই বন্ধ, কীভাবে খুলতে হয় বোঝা যাচ্ছে না। বেশ ভারী বাক্সটা, দশ থেকে বারো কেজির কম নয়।

বাক্সটার কিনারা পরীক্ষা করে রানা বুঝল, ইস্পাতের পাত যেখানে জোড়া লেগেছে সেখানে নির্দিষ্ট ধরনের ধারাল কিছু দিয়ে চাড় না দিলে খুলবে না। তবে জোড়া লাগার জায়গায় নাক ঠেকিয়ে গন্ধ শুঁকে নিশ্চিত হওয়া গেল বাক্সের ভিতরে কী আছে।

আফিম।

আরও কয়েকটা বাক্স পরীক্ষা করল ওরা। কয়েকটা বাক্সে শুধুই তরি-তরকারি কিংবা ফলপাকড় ভরা হয়েছে, সঙ্গে অন্য কিছু নেই। কিছু বাক্সে অত্যন্ত উন্নতমানের জটিল যন্ত্রপাতি রয়েছে। এগুলো ঠিক কী কাজে লাগে বলতে পারবে না রানা, তবে ধারণা করল ফিজিক্স, ন্যানো টেকনলজি, অ্যাটম ফিউজিং লেযার ও অ্যারোডাইনামিক্স ইত্যাদি নিয়ে কাজ করতে হলে এ-ধরনের ইকুইপমেন্ট দরকার হতে পারে।

রানার মনে পড়ল, ওদের বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরা ফিজিক্স, ন্যানো টেকনলজি ও অ্যাটম ফিউজিং লেযার নিয়েই পড়াশোনা করেছেন। ভাবল, উত্তরার ধারণা সত্যিও হতে পারে – কায়েসের প্লেনটাকে হয়তো ব্যান সপ দুর্গেই কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

আপাতত ওটাকে কায়েসের দেখা প্লেন বলেই মনে করতে হবে, ভাবল রানা; কারণ সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষ বলছেন, মহাচিনের কাছ থেকে উপহার পাওয়া দুটো ঈগলেরই হিসাব আছে তাঁদের কাছে; একটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আরেকটা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে।

তা হলে, কঠিন প্রশ্ন দাঁড়ায়: দোই ইনথানন পাহাড়ের নীচে বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের লোগো সহ যে প্লেনটা কায়েস দেখেছে সেটা কোত্থেকে এল?

উত্তরাও ওকে বলেছে যে বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের একটা জেট প্লেন ওখানে ছিল, দোই ইনথানন থেকে তোলা ফটো দেখে নিশ্চিত হয়েছে সে।

সরেজমিনে তদন্ত ছাড়া রহস্যটা ভেদ করা যাবে না।

কোথাও একবার থামল না থাই টং-এর কার্গো শিপ, সমান গতিতে ছুটে চলেছে সেই ভোর রাত থেকে সারাটা দিন।

হাতঘড়ি দেখে বোঝা গেল বিকেল হতে আর বেশি বাকি নেই। ইতিমধ্যে দুজনেই দু'তিন ঘণ্টা করে ঘুমিয়ে নিলেও, আরেক দফা ঘুমাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

রাত আটটার দিকে ঘুম ভাঙল ওদের। হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা, মাথাটা কাত করে কী যেন শোনার চেষ্টা করছে।

'মাসুদ ভাই, কী ব্যাপার – ' তারপর লাবণী খেয়াল করল। গড়িয়ে রানার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে সে।

যান্ত্রিক গুঞ্জন বদলে গেছে। ইঞ্জিনের গতি কমছে। কার্গো শিপের দোল খাওয়া কমে এল। ডকে ভিড়ছে ওরা।

'আমরা পৌঁছেছি,' বলল রানা। অনুভব করল সমস্ত চুল মাথার মাঝখানে জড়ো করে ভাঁজ করা গামছা দিয়ে ঢাকছে লাবণী।

'একই কৌশলে বেরুব তো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ। জাহাজ থেকে নামার পর সারাক্ষণ আমার ওপর নজর রাখবে তুমি। আমাদের স্বাধীনতা দরকার। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ভিড় থেকে সরে যেতে চেষ্টা করব আমি।'

দ্রুত যে যার কাপড় পরে নিল ওরা। আরও অলস হলো ইঞ্জিন, তারপর থেমে গেল। গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক নামাবার শব্দ ভেসে এল। তারপর হ্যাচ সরাবার ধাতব আওয়াজ। মই বেয়ে নেমে আসছে কুলিরা।

তিন নম্বর সেকশনকে বেঁধে রাখা লাইন খুলে ফেলল তারা। বাক্সের গায়ে ঘষা খাচ্ছে বাক্স। ওগুলোর একটা মাথায় তুলে মই বেয়ে উঠে যাচ্ছে একজন কুলি, মইয়ের ধাপে তার ভারী বুটের আওয়াজ কর্কশ শোনাচ্ছে। তার পিছু নিল একজন। তারপর আরেকজন। শেষ লোকটা মই বেয়ে না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা।

'ওরা আবার বাক্স নিতে আসার আগে কিছুটা সময় আছে,' বলল রানা। বাক্স বেয়ে উপরে চড়ল ও, মাথার দিকের দুটো বাক্স একপাশে সরিয়ে পথ বের করল। উজ্জ্বল আলোয় পানি বেরিয়ে এল চোখে। লাবণীর দিকে হাত নামাল ও।

বাক্স বেয়ে ওর পাশে উঠে এল লাবণী, ফাঁক গলে অপরদিকে চলে গেল, তারপর নেমে পড়ল মেঝেতে। তার পিছু নিল রানা। তিন নম্বর সেকশনের অর্ধেকটাই খালি হয়ে গেছে।

'বড় একটা বাক্স নাও,' লাবণীকে বলল রানা। 'ওগুলো হালকা।' তার মাথায় বাক্স তুলতে সাহায্য করল ও, তারপর গামছার প্রান্ত দুটো টেনে-টুনে যতটা পারা যায় মুখ ঢাকার কাজে লাগাল। 'আমাকে আগে থাকতে দাও।'

নিজেও একটা বড় বাক্স নিল রানা। মইয়ের দিকে পা বাড়িয়েছে, উপরের ধাপ থেকে জুতোর আওয়াজ ভেসে এল। মইয়ের বাঁকে লোকটাকে পাশ কাটাল ও। কেউ কারও দিকে তাকাল না। রানার ঠিক পিছনে রয়েছে লাবণী। মইয়ের মাথায় ওঠার আগে আরও দুজন কুলিকে পাশ কাটাল ওরা।

মেইন ডেকে পৌঁছে সরাসরি গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের দিকে এগোল রানা।

নদী এখানে যথেষ্ট চওড়া।

নীচের ডকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বেশ কয়েকটা এক টনী ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওগুলোতেই বাক্স তুলছে কুলিরা। ডকের পর ইঁট বিছানো রাস্তা, উঠে গেছে একটা ঢালের মাথায়, তারপর চোখের আড়ালে হারিয়ে গেছে। প্রচুর গাছপালা ও ঝোপ-ঝাড় জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে। তিনটে ফ্লাডলাইট জ্বললেও, ওগুলো থেকে খুব বেশি আলো আসছে না।

ডকে নেমে এসে প্রথম ট্রাকটার দিকে এগোল রানা, এরইমধ্যে অর্ধেক ভরে গেছে সেটা। ড্রাইভাররা যে যার ট্রাকের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডকের দিকে মুখ করে অর্ধবৃত্ত তৈরি করেছে ট্রাকগুলো। ছ'ফুট পিছনে লাবণীর পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে রানা।

ট্রাকটার পিছনে পৌঁছানোর মুহূর্তে মুখটা নদীর দিকে ঘুরিয়ে রাখল ও। ক্লিপবোর্ড হাতে লোকটা রানার ডান দিকে। আরেকজন লোক রয়েছে ট্রাকের উপর, বাক্সগুলো সাজিয়ে রাখছে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

সে।

মাথার বাক্স ট্রাক বেডে নামিয়ে রাখল রানা, তারপর ঘুরে গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের দিকে হাঁটা ধরল। ধীর পায়ে এগোচ্ছে, অপেক্ষা করছে লাবণীর জন্য। শুনতে পেল ট্রাক বেডে ঘষা খেল তার বাক্স।

কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। পা চালিয়ে ওর দিকে হেঁটে আসছে লাবণী। তার পিছনে ক্লিপবোর্ডে আরও দুটো বাক্স লোড হওয়ার কথা লিখে রাখছে লোকটা। ট্রাকের চিনা ড্রাইভার সিগারেটে টান দিচ্ছে, গল্প করছে সঙ্গী ড্রাইভারদের সঙ্গে।

আলোর বৃত্তটা ঠিক গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক পর্যন্ত পৌঁছায়নি। পিছনে লাবণীকে ছায়ার মত নিয়ে ওটার দিকে হাঁটার সময় আলো থেকে বেরিয়ে এল রানা। উল্টোদিক থেকে আসছে না কেউ।

মাথা নিচু করে বাম দিকে দৌড় দিল রানা। পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে ছুটছে, ডকে যাতে জুতোর শব্দ খুব কম হয়।

এক সারি ঝোপের ভিতর ঢুকে মাটিতে একটা হাঁটু গেড়ে নিচু হলো রানা। ওর পাশে নিচু হলো লাবণীও। তারপর দুজন একযোগে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল।

মাথায় বাক্স নিয়ে গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক ধরে নেমে আসছে এক লোক, ধীর পায়ে অপেক্ষারত ট্রাকের পিছনে পৌঁছাল। দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা মুখ না তুলেই ক্লিপবোর্ডে টিক চিহ্ন দিল। পরিবেশ একেবারে শান্ত। না, কেউ ওদেরকে পালাতে দেখেনি। ঝোপের দিকে ফিরে এগোল রানা।

বিশ গজের মত হাঁটল ওরা। তারপর বৃত্ত তৈরি করে ডকের দিকে ফিরল। খুব সাবধানে, ধীর পায়ে হেঁটে এল ওরা, ঝোপ খসখস করছে দেখে কেউ যাতে গুলি না চালায়।

ওরা ফিরে এল ইঁট বিছানা রাস্তা যেখানে ডক ত্যাগ করেছে তার কাছাকাছি। দৃশ্যটায় নতুন একটা জিনিস যোগ হয়েছে।

ট্রাকগুলোর সামনে বিরাট কালো একটা লিমাযিন পার্ক করা। রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড় করানো হয়েছে ওটাকে। গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক ধরে আরও কুলি নেমে আসছে, ট্রাক বহরের পিছনে মাথার বোঝা খালি করছে তারা। কার্গো শিপের উপর চারদিকে আলো জ্বলছে।

দুজন কুলির পিছু নিয়ে গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক থেকে নেমে আসতে দেখল রানা সাদা সুট পরা চাই-পাই দেওকে। এত দূর থেকেও ওর চোখে ধরা পড়ল বাটনহোলে এখনও লাল গোলাপটা রয়েছে; তবে আগের সেই গোলাপটাই কি না বলা মুশকিল।

দেওয়ের পাশে সুন্দরী এক থাই তরুণী রয়েছে। লাল স্কার্টের সঙ্গে সাদা পপলিনের টি-শার্ট পরেছে মেয়েটি, তার উপর খাটো একটা মিঙ্ক কোট। কাঁধ থেকে ঝুলছে বিরাট একটা হাতব্যাগ। পাঁচ ফুট তিন, স্বাস্থ্য ভাল, হাঁটার মধ্যে ক্ষিপ্র একটা ভাব। ফ্লাডলাইটের আলোয় তার পেশল পা দুটো যেন মার্বেলের স্তম্ভ।

আচ্ছা, নেগোশিয়েশনের জন্য চক্রি চুয়ান তা হলে তার বান্ধবীকেই পাঠিয়েছে, ভাবল রানা। এদের বান্ধবী সম্পর্কে ধারণা আছে ওর। আসলে রক্ষিতা।

ডক ধরে সোজা লিমাযিনের দিকে এগিয়ে এল তরুণী, পিছনে কারবাইন হাতে দুজন থাই। বোঝাই যাচ্ছে যে থাই থান্ডার তাদের নেগোশিয়েটরকে বডিগার্ড ছাড়া পাঠায়নি।

চাই-পাই দেও আর তরুণীকে আসতে দেখে স্যালুট করল শোফার, তারপর লিমাযিনের দুটো দরজাই খুলে দিল। থাই বডিগার্ডদের নিয়ে ব্যাকসিট উঠে বসল তরুণী। দেও বসল সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে। ড্রাইভিং সিটে উঠে গাড়ি ছেড়ে দিল শোফার।

'এই রাস্তা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে?' ফিসফিস করল লাবণী।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

'নিশ্চয়ই দুর্গে,' বলল রানা। 'তবে এখনই আমরা সেখানে যাচ্ছি না। প্রথমে প্লেনটাকে খুঁজে বের করতে হবে, আদৌ যদি সেটার কোনও অস্তিত্ব থাকে।'

ঝোপ-ঝাড় থেকে না বেরিয়ে এগোচ্ছে ওরা, রাস্তার সঙ্গে সমান্তরাল একটা রেখা ধরে। ঢালের মাথায় উঠে এসে সামনে তাকাতে নীচে একটা বিশাল উপত্যকা দেখতে পেল ওরা।

'ও আল্লাহ!' মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে উঠল লাবণী। 'কী সুন্দর, না?'

নিজের বেল্ট থেকে একজোড়া নাইটগ্লাস বের করে দুর্গের দিকে তাকাল রানা। উপত্যকার মাঝখানে, ফ্লাডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত, বিরাট সেই প্রাচীন দুর্গ। পাহাড়ের উপর থেকে দেখে এর সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য কিছুই বোঝা যায়নি। যেন ওয়াল্ট ডিজনি-র কোনও সিনেমা থেকে তুলে এনে পরিখা সহ এখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে দুর্গটাকে, প্রকাণ্ড আকারের কংক্রিট ব্লক-এর সমষ্টি। কালো লিমাযিনটাকে দেখতে পেল ও, ড্রব্রিজের উপর দিয়ে এগোচ্ছে।

রানার গায়ে সেঁটে এল লাবণী। 'মাসুদ ভাই, সেই ছোটবেলা থেকে কেল্লা আমার অসম্ভব ভাল লাগে!'

চোখ থেকে নাইটগ্লাস নামাবার আগে দুর্গের ছাদের দিকে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল রানা। প্রথমে চিনতে পারল না, কালো রঙের কী যেন একটা রয়েছে ওখানে। ভাল করে তাকাতে বুঝতে পারল ওটা আসলে বড় আকৃতির একটা যান্ত্রিক ফড়িং – হেলিকপ্টার।

এরপর নিজেদের চারপাশে চোখ বুলাল রানা। ওদের ডানদিকে খাড়া পাহাড়প্রাচীর, আকাশের গায়ে নিকষ কালো পরদার মত ঝুলে আছে। ওটার ঠিক উল্টোদিকে উজ্জ্বল হাসি ছড়াচ্ছে মস্ত চাঁদটা। ডানদিকেই, খানিক দূরে, ক্রমশ উঁচু একটা ঢাল। 'এসো, খানিক ওপরে উঠি।' নাইটগ্লাস বেল্টের খাপে গুঁজে রাখল ও।

রানার পিছু নিয়ে এগোল লাবণী। ঢালের মাথায় উঠে আসতে সাত মিনিট লাগল ওদের। ওখানে থেমে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে রানা।

চাঁদের আলোয় উপত্যকাটা বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

'পাহাড়ের ওপর থেকে দেখা গেছে প্লেনটা,' লাবণীকে বলল রানা। 'কিন্তু এখন নেই। বলো, কোথায় লুকিয়ে রাখা সম্ভব?'

'আন্ডারগ্রাউন্ডে?' বলল লাবণী।

'হতে পারে,' বলল রানা। 'কিন্তু প্লেনটাকে তুমি আনবে কীভাবে? আন্ডারগ্রাউন্ডে তো আর ল্যান্ড করাতে পারবে না। তোমার একটা রানওয়ে থাকতে হবে।' আবার চারদিকে চোখ বুলাল ও।

চাঁদের আলোতেও সব কিছু পরিষ্কার নয়। কাছাকাছি অনেকগুলো ঢাল, তারই একটার মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। ঢালগুলোর মাঝখানে সমতল জমিন, ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা। আলো ঝলমলে দুর্গটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও, সেটার পিছনে বড় আকারের বেশ কিছু গাছ। সেগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল।

'মাসুদ ভাই, আমাদের শোনার চেষ্টা করা উচিত নয় দুর্গে বসে ওরা কী আলাপ করছে?'

'প্রথমে রানওয়েটা দেখতে চাই,' বলল রানা। 'লম্বা একটা রানওয়ে কীভাবে তুমি লুকাবে?'

মাটিতে হাঁটু গেড়ে রয়েছে লাবণী, ঝোপের একটা পাতা ছিঁড়ল। 'ঝোপ দিয়ে ঢেকে রাখব,' বলল সে।

'কিংবা গাছ দিয়ে,' হাত তুলে দেখাল রানা। সিধে হয়ে সেদিকে তাকাল লাবণী। 'ওই গাছগুলো দেখছ? ওগুলোর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু আছে?'

চোখ কোঁচকাল লাবণী। 'দেখে মনে হচ্ছে খুব সাজানো

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

গোছানো, যেন খুব যত্ন নেয়া হয়।'

'ঠিক ধরেছ। সারিগুলো পরিচ্ছন্ন ও নিখুঁত। চারদিকের বাকি গাছপালার মধ্যে এই শৃংখলা দেখা যাচ্ছে না। কেন?'

'থাই টং চিফ একজন বৃক্ষ-প্রেমিক?'

'এসো।' ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে রানা, ওর পিছু নিল লাবণী। কোনও ট্রেইল নেই, তবে শিশির পড়ায় ভিজে নরম হয়ে আছে ঝোপের ডালপালা। ওদের পরনের কুলির পরিচ্ছদও ভিজে গিয়ে গায়ের সঙ্গে সেঁটে আছে।

আরেকটা ঢালের মাথায় উঠে এসে ইঁট বিছানো রাস্তার পাশে বসল ওরা, ঝোপ ফাঁক করে দেখল বাক্সভর্তি প্রথম ট্রাকটা নীচে নেমে যাচ্ছে। ট্রাক চলে যাওয়ার পর রাস্তা পেরিয়ে উপত্যকায় নেমে এল ওরা। এখানে ঝোপঝাড় কম, উপত্যকাটা চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ঘাসে ঢাকা।

রানার পিছু নিয়ে হন হন করে হাঁটছে লাবণী, দুর্গটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। কোনও আড়াল পাচ্ছে না ওরা। তবে চাঁদটা মেঘের ওপাশে থাকায় চারদিক ছায়ায় ঢাকা।

গাছগুলো এখনও সিকি মাইল দূরে, অথচ লাবণী পিছিয়ে পড়েছে। 'মাসুদ ভাই,' চাপা গলায় ডাকল সে। 'একটু আস্তে হাঁটো।'

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। লাবণী কাছে আসতে বলল, 'তোমার খুব ভাল করেই জানা আছে টেলিস্কোপ লাগানো রাইফেল নিয়ে দুর্গের ছাদ থেকে একজন স্নাইপার কী করতে পারে।'

'এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা মানে তাকে আরও সহজ টার্গেট পাইয়ে দেয়া।'

হাঁটার গতি আগের চেয়ে কমাল রানা, লাবণী যাতে ঠিক ওর পাশেই থাকতে পারে। তার ফতুয়ার সামনের দিকে ইন্টারেস্টিং একটা নড়াচড়া লক্ষ করে হাসতে শুরু করল ও।

বুকের উপর হাত দুটো ভাঁজ করল লাবণী, তারপর কঠিন চোখে তাকাল ওর দিকে। এই ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ হাঁটল সে, তবে খানিক পরেই নামিয়ে নিল হাত দুটো। অবশেষে গাছগুলোর কাছাকাছি পৌঁছাল ওরা।

সামনে বাধা। আট ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছে দুজন। মুখ তুলে উপরদিকে তাকাল রানা। বেড়ার ছয় ইঞ্চি উপরে আলাদা এক প্রস্থ তার দেখল।

বেড়ার গায়ে হেলান দিতে যাচ্ছে লাবণী। ঝট করে হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে নিল রানা, তারপর হাত তুলে নিঃসঙ্গ তারটা দেখাল। সেদিকে তাকিয়ে নিজের গলায় হাত দিল লাবণী। 'বিদ্যুৎ!' বলল সে। 'এখন তা হলে উপায়, মাসুদ ভাই?'

বেড়ার ওপারে গাছগুলো ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না রানা। 'এসো, দেখা যাক গেটটা পাই কি না।'

'তোমার সঙ্গে হাঁটা মানে তো দৌড়ানো।'

'না, দৌড়াতে হবে না। তবে কোনও শব্দ নয়।'

বেড়ার পাশ ঘেঁষে হাঁটছে ওরা, লম্বা ঘাসের বদলে এখন আবার ঝোপ-ঝাড়েরই প্রাধান্য বেশি দেখা যাচ্ছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভিতরটা বারবার দেখবার চেষ্টা করল রানা, তবে সযত্নলালিত গাছগুলো ছাড়া আর কিছু ওর চোখে পড়ল না।

ঝোপ-ঝাড় ঘন হয়ে ওঠায় এগোবার গতি কমে এসেছে। দুর্গের পিছন দিক ঘেঁষে হাঁটছে ওরা। উঁচু জায়গায় রয়েছে, ফলে দুর্গের সামনের ইঁট বিছানো রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছে রানা। হেডলাইট দেখে বোঝা গেল বাক্সভর্তি আরেকটা ট্রাক আসছে।

দুর্গটাকে পিছনে ফেলে আসবার পর সামনে বেড়ার একটা কোণ দেখতে পেল ওরা। বাঁক ঘুরে বাঁ দিকে চলে গেছে ওটা। হাত তুলল রানা। ওর পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল লাবণী, চেহারা চকচক করছে। তার চোখ দুটো কী যেন খুঁজছে ওর মুখে।

'এখানে অপেক্ষা করো,' ফিসফিস করল রানা। 'বাঁকের ওদিকে কী আছে দেখতে যাচ্ছি আমি।'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল লাবণী।

মাথা নিচু করে এগোল রানা। বেড়ার কোণে পৌঁছে মাটিতে হাঁটু গাড়ল, শ্বাস নিল বুক ভরে। তারপর সাবধানে কোণের ওদিকে মাথাটা বাড়িয়ে বেড়া বরাবর তাকাল। ওর কাছ থেকে দশ গজ দূরে বড় একটা গেট। খোলা সেটা। কাঁধে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন চিনা গার্ড। তার মাথাটা সামনের দিকে নত করা, সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করছে। রানার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে সে।

অপেক্ষা না করে বেড়ার সঙ্গে সমান্তরাল রেখা ধরে এগোল রানা। এদিকে কোনও ঝোপ বা ঘাস নেই, শুধু শক্ত মাটি। সিগারেট ধরানো শেষ করে ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই লোকটার কাছে পৌঁছাতে চায় ও। দু'বার ক্লিক করল লাইটার, তারপর আগুন জ্বলল। সিগারেটের শেষ প্রান্তে আগুন ছুঁইয়ে লম্বা টান দিল সে।

তার পিছনে পৌঁছে যাচ্ছে রানা। ওর হাতে ছুরিটা বেরিয়ে এসেছে। ঠোঁটে আঙুল তুলে সিগারেট নামাল গার্ড, মুখ তুলে কালো আকাশ লক্ষ্য করে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর ঘুরতে শুরু করল।

ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই পৌঁছে গেল রানা। বাঁ হাত দিয়ে তার কাঁধে ঘুসি মারল ও, মোচড় খেয়ে আগের অবস্থায় ফিরে গেল সে। ওর ডান হাতে ধরা ধারাল ছুরি পোঁচ দিল গলায়।

কলকল শব্দ পেল রানা। সিগারেট পড়ে যাচ্ছে। রাইফেলটা কাত হয়ে বেড়ার গায়ে লাগতেই চারদিকে আগুনের ফুলকি ছুটল। রাইফেলের পিছু নিল গার্ড। বিদ্যুতের স্পর্শ পেতেই ঝাঁকি খেতে শুরু করল শরীরটা। মাটিতে ঢলে পড়ল সে, মুখের যেখানে বেড়াটা লেগেছিল সেখানে কাটাকুটির মত পোড়া দাগ দেখল রানা।

ঘুরে লাবণীর দিকে ফিরল ও। সঙ্গে সঙ্গে জমে পাথর হয়ে গেল। সামনে আরও দুজন চিনা গার্ড, তাদের রাইফেল ওর পেটের দিকে তাক করা।

'একদম নড়বে না,' নাকি সুরে বলল তাদের একজন।

নয়

ছুরিটা এখনও রানার হাতে। হাত দুটো শরীরের পাশে ঝুলছে। স্থির দাঁড়িয়ে আছে ও।

'ছুরি ফেলে দাও,' বলল গার্ড।

খাকি হাফ প্যান্ট ও খাকি হাফহাতা শার্ট পরে আছে গার্ডরা। তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্তহীনতার কোনও লক্ষণ আছে কি না বুঝতে চেষ্টা করছে রানা। নেই দেখে হাতের ছুরিটা ছেড়ে দিল। ওদের পিছনে একটা নড়াচড়া দেখতে পেয়েছে। মাথা নিচু করে সাবধানে, দ্রুত এগোচ্ছে লাবণী।

মাথার উপর হাত তুলল রানা। 'মিস্টার জিকো তানাই পাঠিয়েছেন আমাকে,' চিনা ভাষায় বলল ও। 'শোনা যাচ্ছে দলে বেঈমান আছে।'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

দুজন গার্ডই নিঃশব্দে হাসল। যে কথা বলছিল, রানার দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকাল। 'কোনও বেঈমান নেই,' বলল সে। 'শুধু বিদেশি শত্রু আছে।'

রানার ডানদিকের গার্ডকে আঘাত করল লাবণী, যে-লোকটা বেড়ার কাছ থেকে দূরে রয়েছে। লোকটার পিছনে পৌঁছানোর আগে নিজের গতি কমাল সে। ধারাল ছুরিটা আগেই বেরিয়ে এসেছে হাতে। কাজটা খুব দ্রুত ও সহজে সারল সে।

তার হাত লোকটার কাঁধের উপর দিয়ে এগিয়ে এল, ছুরিটা ঝাঁকি খেল গলা বরাবর। চামড়া বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, হড় হড় করে রক্ত বেরিয়ে এসে শার্টের সামনেটা ভিজিয়ে দিচ্ছে। বড় বড় হয়ে উঠল তার চোখ দুটো, তারপর নিস্তেজ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় লোকটার চোখ দেখছিল রানা। ওগুলো ওকে ছেড়ে তার সঙ্গীর দিকে ছুটে যেতেই লাফ দিল ও।

প্রথমে ডান হাতের ধাক্কায় তার রাইফেলের নলটা নিজের দিক থেকে সরাল রানা, সেই সঙ্গে বাম হাতে প্রচণ্ড এক আপার কাট মারল তার চিবুকের নীচে। হোঁচট খেল সে, বাড়ি খেল বেড়ার গায়ে, সঙ্গে সঙ্গে এক রাশ আগুনের ফুলকি ছুটল। আড়ষ্ট হয়ে গেল শরীরটা। ঠোঁট দুটো ভাঁজ হয়ে দাঁতের ফাঁকে ঢুকে গেল। গোটা শরীর ঝাঁকি খাচ্ছে ও কাঁপছে। তারপর বেড়া থেকে খসে পড়ে স্থির হয়ে গেল সে।

একটা লাশের কাপড়ে ছুরির ফলা ঘষল লাবণী। রানাও নিজের ছুরিটা তুলে নিয়ে পরিষ্কার করে রেখে দিল বাহুর সঙ্গে আটকানো খাপে। তারপর দুজনেই ওরা গেটের ভিতর তাকাল। 'গাছগুলো দেখো,' বলল রানা।

চার সারিতে লাগানো হয়েছে গাছগুলো। দু'দিকে দুটো করে সারি। ওগুলোর মাঝখানে একটা অ্যাসফল্ট হাইওয়ের মত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে রানওয়েটা। গাছগুলোর সমস্ত মগডাল, সম্ভবত স্থানান্তর উপযোগী, বাঁকা হয়ে ঝুলে পড়েছে রানওয়ের উপর, ফলে উপর থেকে ওটার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। গাছগুলো খুব কাছাকাছি হওয়ায় পাশ থেকেও বোঝা যায় না যে ওখানে একটা রানওয়ে আছে।

গেট ও রানওয়ের মাঝখানে কাঠের বিরাট হ্যাঙ্গারটা দেখতে পাচ্ছে ওরা। লাবণীকে নিয়ে ওটার দিকেই এগোল রানা।

বিশ গজের মত এগোবার পর হ্যাঙ্গারের পিছনদিকে, রানওয়ের উপর ছোট একটা হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওরা, সম্ভবত টু-সিটার।

হ্যাঙ্গারের খোলা মুখের পাশে দাঁড়িয়ে ভিতরটা ভাল করে দেখছে ওরা। আলো জ্বলছে, তবে কোথাও কিছু নড়ছে না।

দুজনের হাতেই পিস্তল বেরিয়ে এল, সাবধানে কংক্রিটের মেঝেতে পা দিল ওরা। প্রতিটি দেয়াল বরাবর মেঝেতে ফাটল রয়েছে। চারদিকে বড় আকারের অনেক ড্রাম দেখতে পাচ্ছে ওরা, ওগুলোর মাঝখানে একাধিক ওঅর্কবেঞ্চ রয়েছে।

দেয়ালের নীচের সরু ফাটল পরীক্ষা করছে লাবণী, রানা পরীক্ষা করছে প্রতিটি ওঅর্কবেঞ্চ।

বেঞ্চগুলোয় এখনও অনেক টুলস পড়ে আছে, সেই সঙ্গে প্লেনের ছোটখাট পার্টস ও নোংরা ন্যাকড়ার অসংখ্য টুকরো। ড্রামগুলো সলভেন্টে ভর্তি। হ্যাঙ্গারটা আকারে যথেষ্ট বড়, অনায়াসে একটা জেট প্লেন রাখা যাবে। কিন্তু এখানে কোনও প্লেনই নেই, দুরন্ত ঈগল তো পরের কথা।

কোমরে হাত রেখে হাঙ্গারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে। ওর দিকে হেঁটে আসছে লাবণী।

'কী মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'গোটা ফ্লোরটাই যেন বিরাট একটা এলিভেটর।'

হাসল রানা। 'অর্থাৎ?'

আঙুল দিয়ে নিজের জুতো জোড়ার মাঝখানটা দেখাল লাবণী। 'ওখানে আছে প্লেনটা, হ্যাঙ্গারের নীচে।'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'অসম্ভব নয়। আমার ধারণা, দুর্গ ও এই হ্যাঙ্গারের মাঝখানে আসা-যাওয়ার পথ আছে – সম্ভবত একটা টানেল।'

'আমারও তাই ধারণা।'

'এবার আমরা চাই-পাই দেও আর তার বস জিকো তানাইয়ের খবর নিতে যেতে পারি।'

চোখ বড় বড় করল লাবণী। 'আমরা হামলা চালিয়ে দুর্গ দখল করব?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তবে তার আগে একটা ডাইভারশন ক্রিয়েট করা দরকার না?'

চারদিকে চোখ বুলাল লাবণী। 'ঠিক কী ধরনের ডাইভারশনের কথা ভাবছ তুমি?'

'শুকনো কাঠ জ্বালানি হিসেবে খুব ভাল,' বলল রানা, লাবণীর মত সে-ও চারদিকে চোখ বুলাল। 'হ্যাঙ্গারের ছাদ ও দেয়াল কাঠের তৈরি।'

যতগুলো সম্ভব ন্যাকড়া যোগাড় করল ওরা। ড্রাম থেকে একটা বালতিতে সলভেন্ট ঢালল রানা, ন্যাকড়ার সাহায্যে চারদিকের দেয়াল ওই সলভেন্ট দিয়ে ভেজানো হলো। সবশেষে লাইটার জ্বেলে ভিজে একটা ন্যাকড়ায় আগুন ধরাল রানা। গন্ধটা অসহ্য। প্রচুর ধোঁয়া।

লম্বা ন্যাকড়ার কোণ ধরে প্রতিটি দেয়ালের গা ঘেঁষে হেঁটে গেল রানা, তারপর সেটা ছুঁড়ে দিল মেঝের এক কোণে। মেঝে বরাবর ছোট ছোট শিখা জ্বলে উঠল। তারপর আগুন ধরল সবগুলো দেয়ালে। শিখাগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে। উথলানো, মোচড় খাওয়া ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে ক্যাটওআক ছাড়িয়ে সিলিঙের দিকে।

হ্যাঙ্গার ছেড়ে বেরিয়ে আসবার আগে সলভেন্ট ভর্তি একটা ড্রাম উল্টে দিল রানা। গাঢ় রঙের তরল পদার্থ কংক্রিটের মেঝেতে গড়াতে শুরু করল। সরু কয়েকটা ধারা জ্বলন্ত দেয়ালের নাগাল পেতে যাচ্ছে।

'খুব গাঢ় সলভেন্ট, সরু ফাটল দিয়ে নীচে নামবে?' জিজ্ঞেস করল লাবণী।

'না নামলেও ক্ষতি নেই,' বলল রানা। 'আমাদের উদ্দেশ্য ওদেরকে এদিকে ব্যস্ত রাখা।'

গেট দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা, কাঁটাতারের বেড়া বরাবর হাঁটছে। আগুনটা এত তাড়াতাড়ি বাইরে থেকে দেখতে পাওয়ার কথা নয়, তা ছাড়া হাঙ্গারটা আগেই আড়ালে পড়ে গেছে। বেড়ার কোণ ঘুরে ঝোপের ভিতর ফিরে এল ওরা। সাবধানে হেঁটে একসময় দুর্গটার সরাসরি পিছনদিকে পৌঁছাল।

এখান থেকে কোনও আড়াল পাওয়া যাবে না, ঘাসের উপর দিয়ে পরিখার দিকে এগোচ্ছে দুজন। এই সময় রাস্তার উপর আরেকটা ট্রাকের হেডলাইট দেখতে পেল রানা।

পরিখার দুই পারই সামান্য উঁচু। ক্রল করে ঢালটুকু উঠল ওরা, তারপর চোখ তুলে দুর্গের পিছনের পাঁচিলের উপর চোখ বুলাল।

কোনও কোনও চৌকো জানালা থেকে ম্লান হলুদ আলো বেরুচ্ছে। রানার চোখে কোথাও এতটুকু নড়াচড়া ধরা পড়ল না। যে কংক্রিট ব্লক দিয়ে দুর্গের পাঁচিল তৈরি সেগুলো বেশ ফাঁক রেখে বসানো, ফলে একটা জানালা পর্যন্ত উঠতে খুব একটা সমস্যা হবে না।

রানার জানা নেই পরিখাটা কত গভীর। একটু শীত শীত ভাব আছে, সাঁতরানোর কোনও ইচ্ছে নেই ওর। দুই পারের দূরত্ব প্রায় বিশ ফুট, মাঝখানে গাঢ় রঙের পানি।

'হয়তো খুব একটা গভীর নয়, হেঁটেই পার হওয়া যাবে,' ফিসফিস করল রানা। 'আগে আমাকে দেখতে দাও।'

ঢাল বেয়ে নেমে গেল রানা, পানিতে ডান পা নামিয়ে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

গভীরতা মাপছে। পরিখার কিনারা ঘেঁষে এক ফুট নেমে গেল ওর পা। পানি ঠাণ্ডা নয়। এবার বাম পা ডোবাল, ডান পা আরও একটু সামনে বাড়িয়ে দিল। গভীরতা খুব বেড়েছে বলে মনে হলো না।

তবে পরিখার তলাটা পিচ্ছিল কাদায় ঢাকা। ডান পায়ে ভর দিয়ে বাম পা ওটার পাশে আনতে যাচ্ছে রানা। পিছলে আরও একটু সামনে সরে যাওয়ার সময় অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো ওর।

যেন মনে হলো কেউ ওর জুতোর ভিতর দিয়ে পিন ঢোকাচ্ছে পায়ে। নীচে তাকাল রানা, দেখল ওর পায়ের চারপাশের পানি ছলকাচ্ছে। কী হচ্ছে বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল ওর।

'মাসুদ ভাই!' চেঁচিয়ে উঠল লাবণী।

বন করে আধ পাক ঘুরল রানা, এক লাফে পানি থেকে উঠল, পড়িমরি করে ঢালের মাথায় লাবণীর দিকে এগোচ্ছে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে ওকে সাহায্য করল লাবণী।

তার পাশে বসে জুতো জোড়ার দিকে তাকাল রানা। একজোড়া খুদে বাস্টার্ড এখনও কামড়ে ধরে আছে ওর জুতো। দু'জোড়া জুতোই ছিঁড়ে ফালি ফালি করে ফেলেছে।

খুদে একটা মাছকে জুতো থেকে ছাড়িয়ে চাঁদের আলোয় ধরল রানা। ওর মুঠোয় ছটফট করছে, মোচড় খাচ্ছে ওটা। শরীরটা খাটো ও চ্যাপ্টা। মুখের সামনে কাঁটার মত দাঁত গিজগিজ করছে।

নিঃশ্বাস ফেলবার সময় লাবণীর শরীরটা কেঁপে গেল। 'মাই গড, মাসুদ ভাই!'

'পিরানহা,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'একজন মানুষের হাড় থেকে মাংস ছাড়াতে দুমিনিটেরও কম সময় লাগে ওগুলোর। রাক্ষসে বোঝাই হয়ে আছে পরিখা। সাঁতরে পার হওয়া সম্ভব নয়।'

'ড্রব্রিজ,' মৃদুকণ্ঠে বলল লাবণী।

মাথা ঝাঁকাল রানা। পরিখার পার ঘেঁষে মাথা নিচু করে এগোল ওরা। পরিখার সঙ্গে বাঁক নিচ্ছে, ধীরে ধীরে পৌঁছে যাচ্ছে দুর্গের সামনের দিকটায়। দূর থেকেই আরেকটা ট্রাকের হেডলাইট দেখতে পেল, ড্রব্রিজ পেরুচ্ছে।

হেডলাইটের আলোয় ফটকের ভিতরটা দেখতে পেল ওরা। বিরাট বড় একটা উঠানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রাকগুলো। বিদেশি কুলিরা কাঠের বাক্স নামাতে ব্যস্ত।

ড্রব্রিজের কাছে পৌঁছাল ওরা। দ্রুত ওটার নীচে, পরিখার কিনারায় গা ঢাকা দিল। মাথার উপর হাত তুলে ব্রিজের তলাটা স্পর্শ করল রানা। ডায়ামিটারে আধ ইঞ্চি একটা সাপোর্ট রেইল রয়েছে, চলে গেছে পরিখার উপর দিয়ে। ব্রিজের কাঠ আর ওটার মাঝখানে প্রায় তিন ইঞ্চি ফাঁক।

লাবণীর হাতটা ধরে ওই রেইলের উপর তুলে দিল রানা। ব্রিজের নীচে চাঁদের আলো নেই। তার অস্তিত্ব রানার পাশে স্রেফ একটা ছায়া মাত্র। ছায়াটাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখল ও।

রেইলটাকে দু'হাতে শক্ত করে ধরল রানা, তারপর ওটার উপর জুতোর গোড়ালি আটকাল। এবার পরিখার উপর দিয়ে এগোবার জন্য পালা করে একবার ডান হাত, একবার বাম হাত বাড়িয়ে সামনের রেইল ধরছে। পানির সারফেস দু'ফুটেরও কম নীচে। রানার গায়ের ঢোলা ফতুয়ার কিনারা ভিজে গেল।

পরিখা পিছনে ফেলে এল রানা, মাটিতে পা নামাল, রেইল ছেড়ে উবু হয়ে বসে থাকল লাবণীর অপেক্ষায়। ওর ঠিক পিছনেই ছিল লাবণী। পাশে চলে আসতে নামতে সাহায্য করল তাকে।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল ওরা, তারপর কুঁজো হয়ে হনহন করে এগোল দুর্গের কোণ লক্ষ্য করে। বাঁকটা ঘোরার পর কাছাকাছি জানালার দিকে তাকাল রানা। দশ ফুট উপরে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

ওটা, তবে ভিতরে আলো জ্বলছে।

আরও একটু সামনে এগোল রানা। দুর্গের পাঁচিল ও পরিখার মাঝখানে পাঁচফুট চওড়া বালি ভরা একটা বিস্তৃতির মধ্যে রয়েছে ওরা। বিশ গজের মত এগোবার পর বারো ফুট উপরে আরেকটা জানালা দেখল রানা। এটা অন্ধকার।

পাঁচিলের গা ঘেঁষে দাঁড়াল রানা। কংক্রিটের ব্লকগুলো বালি ও সিমেন্টের মিশ্রণ দিয়ে জোড়া লাগানো। জোড়ার জায়গাগুলো আধ ইঞ্চির মত গভীর, ফলে বেরিয়ে থাকা ব্লকের ঠোঁটে হাত ও পায়ের আঙুল রেখে উঠে যেতে পারছে রানা।

জানালার কাছে পৌঁছে থামল, পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করল, তারপর গোবরাট টপকে নেমে পড়ল অপরদিকে। এক মুহূর্ত পর ঘুরল রানা, নীচের দিকে ঝুঁকে হাত বাড়াল লাবণীকে সাহায্য করবার জন্য।

কিছুটা উঠে মাথার উপর হাত তুলল লাবণী, কবজিটা ধরতে দিল রানাকে। হঠাৎ পা পিছলে যাওয়ায় তার শরীরের সবটুকু ওজন টান দিল রানার বাহুতে, মনে হলো জানালা গলে বেরিয়ে যাবে শরীরটা। অপর হাত বাড়িয়ে লাবণীর বগলের তলায় ঢোকাল রানা, ধীরে ধীরে টেনে তুলে আনছে তাকে। জানালার ফাঁকে কাঁধ ঢোকাবার পর ব্লকের ঠোঁটে আবার পা বাধাতে পারল লাবণী, জানালা গলে ভিতরে ঢুকল পুরো শরীর।

দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুজে দম নিচ্ছে লাবণী। 'হঠাৎ মনে হলো পানিতে পড়ে গেছি আমি, পিরানহার ঝাঁক ছেঁকে ধরেছে আমাকে।'

তার ঠাণ্ডা নাকের ডগাটা একবার স্পর্শ করল রানা। 'এখন আর ভয় করছে না তো?'

মাথা নাড়ল লাবণী। তারপর কামরার চারদিকে চোখ বুলাল সে। 'ওহ্, মাসুদ ভাই!'

চাঁদের আলোয় কামরাটা বেশ ভালই দেখা যাচ্ছে। দৃশ্যটা লাবণীর ছোটবেলার স্বপ্ন পুরণ করছে, সন্দেহ নেই। দেয়ালগুলো সাদা রঙ করা। মেঝেতে কার্পেট, তাও সাদা। কাঠের একটা ডেস্ক রয়েছে, ওটার পিছনে উঁচু পিঠ সহ একটা চেয়ার। বিছানাটা কামরার মাঝখানে। লাল ভেলভেট মনে হলো চাদরটাকে। গদিটা এত উঁচু, প্রায় রানার কোমর সমান। মাথার উপর একটা চাঁদোয়া টাঙানো, সেটাও লাল, চারদিকে সাদা লেস ঝুলছে।

ওটার দিকে ছুটে গেল লাবণী, লাফ দিয়ে গদিতে উঠে ড্রপ খেলো। বিছানার দু'পাশে নাইট স্ট্যান্ডে মোমবাতি বসানো। সিলিং থেকে ঝুলছে একটা ঝাড়বাতি।

'তুমি কি আমার সেই স্বপ্নে দেখা রাজপুত্তুর?' জিজ্ঞেস করল লাবণী।

নিজের ঠোঁটে একটা হাত রাখল রানা। 'শ্‌শ্‌শ্‌!' কান পেতে কী যেন শোনার চেষ্টা করছে ও।

ওর দেখাদেখি লাবণীও কান পাতল।

কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে। তবে কাছাকাছি কোথাও থেকে নয়। কী নিয়ে যেন তর্ক করছে কারা।

পিছু নেওয়ার ইশারা করে দরজার দিকে এগোল রানা। কবাট খোলার সময় লাবণীর নিঃশ্বাস অনুভব করল ঘাড়ে।

করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। দেয়ালের গায়ে খানিক পরপর হোল্ডার লাগানো আছে, মোমবাতি জ্বলছে সেগুলোয়। চিনা ও থাই ভাষায় আলাপ কাছে কারা যেন। অসন্তুষ্ট একটা নারীকণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে রানা, থাই ভাষায় চিৎকার করছে। সন্দেহ নেই কী কারণে যেন থাই থান্ডারের লিডার চক্রি চুয়ানের বান্ধবী খুব রেগে গেছে।

আওয়াজটা আরও সামনে থেকে ভেসে আসছে। দেয়াল ঘেঁষে সেদিকে এগোল ওরা। বেশ কয়েকটা কামরাকে পাশ কাটিয়ে এল, তবে সব দরজায় কবাট নেই, কিছু দরজা স্রেফ খিলান, ফাঁক বন্ধ করবার কোনও ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

এরকম একটা চওড়া খিলানের ভিতর থেকে তর্ক-বিতর্কের আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। খিলানটার উপরে কাঠের তৈরি একটা ড্রাগনের মাথা ঝুলছে।

চক্রি চুয়ানের বান্ধবী তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে বলছে, 'এসব কী বলছেন আপনি! এখানে তাইওয়ানিজ টং-এর চিফ মো পাই স্বয়ং উপস্থিত। আমি থাই থান্ডারের তরফ থেকে তাঁর কাছেই বিচার দিচ্ছি। আপনিই বিচার করে বলুন, থাই টং আমাদের সঙ্গে বেঈমানী করছে কি না...'

দশ

তাইওয়ান, তাইপে। চিয়াং কাইশেক এভিনিউ।

তাইওয়ানিজ সিক্রেট সার্ভিস হেডকোয়ার্টার। লেফটেন্যান্ট জেনারেল চেং চি শিয়ান-এর চেম্বার।

চিফ চেং চি শিয়ানের সামনে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে তাইওয়ানিজ টং-এর দুর্ধর্ষ দলপতি মো পাই। প্রকাণ্ড শরীর তার, চেহারাও ভয়ঙ্কর, কিন্তু সিক্রেট সার্ভিসের চিফের সামনে এই মুহূর্তে বসে আছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে। শুধু ঠোঁট জোড়া নড়ছে তার। বিড় বিড় করে বলছে, 'পায়ে পড়ি, আপনার! মাফ করে দিন আমাকে! আর করব না, সার।'

'আরে, মর জ্বালা!' লেফটেন্যান্ট জেনারেল শিয়ান বিরক্ত। 'তখন থেকে বলছি, কোনও অপরাধের কারণে তোমাকে ধরে আনা হয়নি, কাজেই মাফ চাওয়ার দরকার নেই।'

তাইওয়ানিজ টং লিডার মো পাইয়ের এতক্ষণে যেন বোধোদয় হলো। 'অপরাধ করিনি? তা হলে কী কারণে আমাকে হাতকড়া পরিয়ে ধরে আনা হয়েছে, সার?'

লেফটেন্যান্ট জেনারেল শিয়ান ইশারা করতে মো পাইয়ের হাতকড়া খুলে দিল একজন গার্ড। 'বেআইনী কাজ করে টাকা আর অন্যায় করে পাপ তো আর কম কামাওনি, এবার জন্মভূমির ঋণ কিছুটা শোধ করো, মো।'

'জী, সার। আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব।' ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ছে মো পাইয়ের। তাইওয়ানিজ সিক্রেট সার্ভিসকে যমের চেয়েও বেশি ভয় পায় সে।

কাজটা ধীরেসুস্থে তাকে বুঝিয়ে দিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল শিয়ান। 'একটা পরাশক্তির প্ল্যান এটা। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আমাদের প্রতিবেশীর তৈরি এবং ডক্টর নাদিরার ডেভেলপ করা জেট প্লেন দুরন্ত ঈগলকে হাইজ্যাক করে এনে তোমার পৌঁছে দিতে হবে থাইল্যান্ডে। কোনও ট্রেস থাকলে চলবে না।

'একই সঙ্গে ঢাকা থেকে ধরে আনতে হবে ডক্টর নাদিরাকেও। কিন্তু থাইল্যান্ডে নয়, তাঁকে ডেলিভারি দিতে হবে সিঙ্গাপুরে।'

প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্যসহ একটা ফোল্ডার দেওয়া হলো মো পাইকে। বলা হলো, প্রতিটা তথ্য মুখস্থ করে নখদর্পণে রাখতে হবে। আজই দশজনের একটা বোর্ডের সামনে পরীক্ষা দিতে হবে তার। বোর্ডে বিদেশী মুরুব্বিরাও থাকবে কয়েকজন। কোথাও সামান্যতম ভুল হলে চলবে না। আর গোপনীয়তার নিশ্চয়তা দিতে হবে শতকরা একশো ভাগ।

সবশেষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল শিয়ান বললেন আসল কথাটা, 'এই কাজটা সুষ্ঠুভাবে করা ও করানোর জন্যে তোমাকে অনেক টাকা দেয়া হবে। মোট পাবে ষাট মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

বুঝতেই পারছ, কতটা গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন এটা। আরেকটা কথা, কাজটা তোমরা একা যদি করতে না পার, অন্য এক বা একাধিক গ্রুপের সাহায্যও নিতে পারবে – ওই পরাশক্তির তাতে কোনও আপত্তি নেই। তবে এই টাকার ভাগ দিতে হবে তাদেরকে, গ্যারান্টি দিতে হবে গোপনীয়তার।'

ষাট মিলিয়ন? তাইওয়ানিজ টং প্রধান মো পাইয়ের মাথা ঘুরছে। প্রশ্ন করে জেনে নিল সে, টাকাটা ষাট মিলিয়ন মার্কিন ডলারই কি না।

'কি, পারবে?'

উত্তর দেওয়ার আগে বিশ সেকেন্ড চিন্তা করল মো পাই। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'বুঝতে পারছি, সার, আপনার নিজের এতবড় নেটওঅর্ক থাকতে আমাকে ডেকেছেন কেন। আপনারা ক্লিন থাকতে চান। বেইজিং টের পেলে আমারও অসুবিধা। কাজেই, আমিও ক্লিন থাকব।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'ইদানীং থাইল্যান্ড আর সিঙ্গাপুরে দাপটের সঙ্গে নানান অপারেশন চালাচ্ছে থাই টং। ভাবছি কাজটা ওদেরকে দিয়ে করালেই বোধহয় ভাল হবে। ওরা হয়তো থাই থান্ডারকেও জড়িয়ে নিতে পারে। ঢাকায় থান্ডারের কানেকশন ভাল।'

'বেশ, তা হলে সে ব্যবস্থাই করো,' বললেন তাইওয়ানিজ সিক্রেট সার্ভিসের চিফ। 'তবে কাউকে এক পয়সাও ঠকিয়ো না। এই কাজের সবচেয়ে বড় শর্তই হলো, এটা হতে হবে সফল ও ষোলোআনা নিখুঁত, নিশ্ছিদ্র।'

'জ্বী, সার, বুঝেছি। না, ঠকাব না।'

'বেশ, এখনই শুরু করে দাও। ষাট মিলিয়ন ডলারের চেকটা ইন্টারভিউয়ে টিকলেই পাবে। তবে চোখের দেখা দেখে নিতে পারো একবার।' দুই হাতে দুই কিনারা ধরে চেকটা দেখালেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল শিয়ান।

চোখ কচলে ভাল করে চেকটা দেখল মো পাই।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল শিয়ানের নির্দেশে ওখানে বসেই ফোল্ডারটা খুলে পড়তে হলো তাকে। সমস্ত তথ্য ও নির্দেশ লেখা আছে ওটায়। তার পড়া শেষ হতে তাইওয়ানিজ সিক্রেট সার্ভিস চিফ বললেন, 'তোমার কোনও প্রশ্ন থাকলে করতে পার।'

'একটাই প্রশ্ন, সার,' বলল তাইওয়ানিজ টং প্রধান মো পাই। 'জানি এই কাজে ব্যর্থ হলে মেরে ফেলা হবে আমাকে। শুধু জানতে চাই সেটা কীভাবে – গুলি করে, নাকি...'

মাথা নাড়লেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল। 'তোমাদের কাউকেই মেরে ফেলা হবে না,' আশ্বস্ত করবার সুরে বললেন তিনি। 'যাদের কারণে অপারেশন ব্যর্থ বলে মনে করা হবে তাদের সবাইকে শুধু একটা করে ইঞ্জেকশন দেয়া হবে।'

'ইঞ্জেকশন, সার?' একটা ঢোক গিলল মো পাই। 'কী ইঞ্জেকশন, সার?'

'এইডস্-এর।'

সেই রাতেই তাইওয়ানিজ টং চিফ মো পাই থাই টং-এর লিডার জিকো তানাইয়ের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করল। দীর্ঘ আলাপ ও অনেক হিসাব-কিতাবের পর কাজটা করে দিতে রাজি হলো থাই টং। তবে জিকো তানাই জানাল প্লেনটা যেহেতু থাইল্যান্ডে পৌঁছে দিতে হবে, এবং মূল অপারেশনটা হবে ঢাকায়, সেহেতু থাই থান্ডারকে না জানিয়ে কাজটা করা যাবে না। সে আরও বলল, ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ডের গডফাদারদের সঙ্গে থাই থান্ডারের ভাল লিঙ্ক আছে, ওখানে তারা ড্রাগ পাচার করে।

সব শুনে তাইওয়ানিজ টং প্রধান মো পাই বলল, কাজটা থাই থান্ডারকে দিয়ে করালে তার কোনও আপত্তি নেই, জিকো তানাই যেভাবে ভাল বলে মনে করবে সেভাবেই কাজটা করাবে, তবে গোপনীয়তার নিশ্চয়তা দিতে হবে হানড্রেড পার্সেন্ট। থাই টংকে সে চল্লিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অফার করল।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

থাই টং লিডার জিকো তানাই খুশিতে বাগ বাগ। তার ধারণা কাজটা সে থাই থান্ডারকে দিয়ে দশ মিলিয়ন ডলারেই করাতে পারবে। অর্থাৎ কোনও কাজ না করেই মাঝখান থেকে ত্রিশ মিলিয়ন ডলার লাভ করতে যাচ্ছে সে।

জিকো তানাইয়ের এত খুশি হওয়ার পিছনে আরও একটা কারণ আছে। নাটের গুরু সংশ্লিষ্ট পরাশক্তির ইন্টেলিজেন্স তাকে আরও একটা কাজ দিয়েছে – কী একটা কাজে তাদের গোপন একটা আস্তানা ওদেরকে ব্যবহার করতে দিতে হবে।

*

এরপর থাই থান্ডারের লিডার চক্রি চুয়ানের সঙ্গে আলোচনায় বসল থাই টং। কী অপারেশন, কোথায়, কীভাবে করতে হবে শুনে ধুরন্ধর চক্রি চুয়ান সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিল তাদের সাহায্য ছাড়া এই কাজ টঙের পক্ষে সম্ভব নয়। ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে তাদের ভাল লিঙ্ক তো আছেই, সিঙ্গাপুরেও বৈধ-অবৈধ অনেক বিজনেস ফ্রন্ট আছে তাদের, আছে বেশ কয়েকটা সেফহাউসও। তারা চেয়ে বসল বিশ মিলিয়ন ডলার।

প্রথমে বিশ মিলিয়নে রাজি না হলেও, পরে বাধ্য হয়ে থাই থান্ডারের দাবি মেনে নিতে হলো থাই টংকে। কাজে হাত দেওয়ার আগেই খরচপাতির কথা বলে দশ মিলিয়ন ডলার চেয়ে নিল চক্রি চুয়ান, ঠিক হলো বাকি দশ মিলিয়ন কাজ শেষ হলে দেওয়া হবে তাকে।

কাজ বুঝে নিয়ে প্ল্যান-প্রোগ্রাম ছকে নিয়ে দু'দলে ভাগ হয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল থাই থান্ডার। প্রথম দলে থাকল পাঁচজন, দলনেতার নাম তাইম আনন্দ, সহকারী হো টাকসিন। দ্বিতীয় দলের নেতৃত্ব দেবে চক্রি চুয়ান নিজেই, তার সহকারী থাকবে ধানাই ঠাকুর।

তারা রওনা হতেই চক্রি চুয়ানের প্রতিনিধি ও বিশ্বস্ত বাহক প্রেম তিলসুলানন্দ থাই টং-এর লিডার জিকো তানাইয়ের সঙ্গে ব্যাংককে জরুরি মিটিঙে বসল।

প্রেম তিলসুলানন্দ জানাল, তার লিডার চক্রি চুয়ান তাকে বিশেষ একটা নির্দেশ দিয়ে গেছে। থাই থান্ডারকে এখনই, অর্থাৎ কাজ শেষ হওয়ার আগেই, বাকি দশ মিলিয়ন ডলার দিতে হবে। শুধু তাই নয়, কাজটায় যেহেতু ঝুঁকির মাত্রা খুব বেশি তাই বোনাস হিসাবে আরও বিশ মিলিয়ন দাবি করছে তারা।

কাজটা গলায় আটকে গেছে, এই পর্যায়ে তর্ক করে কোনও লাভ নেই, অগত্যা বাধ্য হয়ে থাই থান্ডারের অন্যায় দাবি মেনে নিল থাই টং। যে টাকাটা পাওনা ছিল, অর্থাৎ দশ মিলিয়ন ডলার, প্রেস তিলসুলানন্দকে পেমেন্ট করে দিল তারা, বলল বাকি বিশ মিলিয়ন কাজ শেষ হলে দেবে।

যথা সময়ে সাফল্যের সঙ্গে শেষ হলো কাজ। অপারেশন সফল হয়েছে, এই খবর টেলিফোনে থাইল্যান্ডে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে থাই টং লিডার জিকো তানাইয়ের সঙ্গে আবার মিটিঙে বসল প্রেম তিলসুলানন্দ, বলল, এবার বাকি বিশ মিলিয়ন ডলার দাও।

জিকো তানাই খবর নিয়ে জানল, তার ব্যান সপ আস্তানায় সত্যি সত্যি একটা প্লেন পৌঁছেছে, তার লোকজন সেটার দায়িত্বও বুঝে নিয়েছে। তবে ডক্টর নাদিরাকে নিয়ে ফ্লাইং অ্যামবুলেন্স সিঙ্গাপুরে পৌঁছেছে কি না সেটা জানা সম্ভব হলো না। সে ভাবল, প্লেনটাই তো আসল; সেটা যখন হাতে চলে এসেছে, তখন আর ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। পরিষ্কার ভাষায় প্রেম তিলসুলানন্দকে জানিয়ে দিল সে, 'যাও, ভাগো, আর একটা পয়সাও পাবে না।'

আকাশ থেকে পড়ল নন্দ। 'কিন্তু কেন?'

'তোমাদের দাবি ছিল অযৌক্তিক, অন্যায় ও হাস্যকর, তাই।'

নন্দ জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে দিতে রাজি হয়েছিলে কেন?'

জিকো তানাই জবাব দিল, 'উপায় ছিল না, তোমাদের অন্যায় দাবি বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়েছিল তখন। ঠিক আছে, বিশ

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

মিলিয়ন তো কোনও যুক্তির কথা নয়, এই নাও বিশ হাজার ডলার...'

থাই টং ও থাই থান্ডারের মধ্যে এই নিয়েই বিরোধ। থাই থান্ডার একটা প্লেন ঠিকই জায়গা মত পৌঁছে দিয়েছে, কিন্তু বাঙালি বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে সিঙ্গাপুর থেকে গায়েব করে দিয়েছে তারা। কীভাবে?

সিঙ্গাপুর ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হওয়ার সময় থাই থান্ডারের এয়ার অ্যামবুলেন্সের গায়ে লেখা ছিল 'MOUNT ELIZABETH FLYING AMBULANCE'। বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে নিয়ে ফেরার পর ল্যান্ড করবার কথা ছিল চাঙ্গি এয়ারপোর্টে।

মাউন্ট এলিজাবেথ ফ্লাইং অ্যামবুলেন্সের জন্য থাই ও তাইওয়ানিজ টংকে নিয়ে চাঙ্গি এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছিল তাদের মুরুব্বিরা, বিশেষ একটা বোয়িং প্লেন নিয়ে। আগেই কথা হয়ে আছে, থাই থান্ডার এখানেই সংশ্লিষ্ট পরাশক্তির প্রতিনিধির হাতে তুলে দেবে বাঙালি বিজ্ঞানীকে। সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর নাদিরাকে নিয়ে রওনা হয়ে যাবে বোয়িং, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে দুনিয়ার আরেক প্রান্তে।

কিন্তু মাউন্ট এলিজাবেথ ফ্লাইং অ্যামবুলেন্স নামে কোনও প্লেন চাঙ্গি এয়াপোর্টে নামেনি।

থাই থান্ডার বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে নিয়ে প্লেনটাকে ল্যান্ড করায় সিঙ্গাপুরের তৃতীয় এয়ারপোর্ট তেনগাহ্-এ। প্লেনের নাম বদলে BLUE BIRD AIRWAYS রাখে তারা। ওখান থেকে একটা অ্যামবুলেন্সে তুলে বিজ্ঞানীকে গায়েব করে দিয়েছে।

কী ঘটছে আঁচ করতে পেরে তাইওয়ানিজ সিক্রেট সার্ভিস চাপ দিচ্ছে তাইওয়ানিজ টংকে, বলছে দুরন্ত ঈগলের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরার, কাজেই তাঁকে ছাড়া চলবে না ওই পরাশক্তির।

তাইওয়ানিজ টং চাপ দিচ্ছে থাই টংকে, বলছে, থাই থান্ডারের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলে যত তাড়াতাড়ি পার ডক্টর নাদিরাকে উদ্ধার করে আমাদের হাতে তুলে দাও।

এই চাপের কাছে নতি স্বীকার করে থাই থান্ডারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছে থাই টং-এর লিডার জিকো তানাই। এই মুহূর্তে নিজ আস্তানা ব্যান সপ দুর্গে থাই থান্ডারের লিডার চক্রি চুয়ানের প্রতিনিধি, তার বান্ধবী চিত্রলেখা মাহিদল-এর সঙ্গে মিটিং করছে সে।

*

করিডরে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। লাবণীকে ইঙ্গিত করল রানা, খোলা খিলানের সামনে থেকে সরে এসে ব্যস্ততার ভান করে হাঁটতে শুরু করল দুজন যেদিক থেকে আওয়াজটা আসছে। একটু পর দেখল বাঁক ঘুরে এগিয়ে আসছে ওদের মতই পোশাক পরা দুজন কুলি, তবে তাদের মাথায় দুটো বাক্স রয়েছে। রানার মনে পড়ল, কার্গো শিপের হোল্ডে পরীক্ষা করবার সময় কিছু বাক্সে তরি-তরকারি ও ফলপাকড় দেখেছিল ওরা। সেগুলোই সম্ভবত দুর্গের অন্দরমহলে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

লোকগুলো আরেক বাঁক ঘুরে চোখের আড়াল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার খোলা খিলানের পাশে ফিরে এল ওরা। এই খিলানের ভিতরই থাই টং লিডার জিকো তানাইয়ের সঙ্গে জরুরি মিটিং করছে থাই থান্ডারের প্রতিনিধি চিত্রলেখা মাহিদল।

রানাকে কাভার দিচ্ছে লাবণী, খিলানের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে কামরার ভিতর তাকাল রানা। দরজার দিকে পাশ ফিরে একটা সিঙ্গেল সোফায় বসে রয়েছে সুন্দরী থাই তরুণী চিত্রলেখা মাহিদল, সোফার পিছনে দাঁড়িয়ে তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা। লাল স্কার্টের সঙ্গে সাদা পপলিনের টি-শার্ট দারুণ মানিয়েছে মেয়েটিকে, তার উপর পরা খাটো মিঙ্ক কোট অত্যন্ত দামি। বিরাট হাতব্যাগটা রয়েছে কোলের উপর। শিরদাঁড়া খাড়া করে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

বসে আছে সে, কথা বলবার সময় দ্রুতভঙ্গিতে হাত নাড়ছে।

চিত্রলেখা মাহিদলের সামনের একটা সিঙ্গেল সোফায় বসে রয়েছে ফুটবল আকৃতির একজন চিনা। তার পা দুটো হাতিকেও লজ্জা দেবে, পুরো মাথা কামানো, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। রানা আন্দাজ করল, এই লোকটাই সম্ভবত থাই টং-এর লিডার জিকো তানাই। তার পিছনেও দুজন দেহরক্ষী দাঁড়িয়ে রয়েছে।

খিলানের দিকে মুখ করে ফেলা ডাবল সোফায় বসে আছে আরও একজন চিনা। লোকটা বিশালদেহী। রাতের বেলাও সানগ্লাস পরেছে। তাকে তাইওয়ানিজ টং-এর লিডার মো পাই বলে মনে হলো রানার। তার পিছনেও দেহরক্ষী রয়েছে, তবে মাত্র একজন।

কামরার ভিতরে থাই টং সদস্য চাই-পাই দেওকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না রানা, যে লোকটা খুন করেছে ইমরুল কায়েসকে।

চিত্রলেখা মাহিদল পুনরাবৃত্তি করছে তার কথা, 'আমি থাই থান্ডারের তরফ থেকে তাইওয়ানিজ টং চিফের কাছে বিচার চাইছি। সবই তো শুনলেন, এবার বলুন থাই টং আমাদের সঙ্গে বেঈমানী করেছে কিনা...'

'কেউ বললেই তো আর আমি বিচার করতে পারি না,' ডাবল সোফায় বসা তাইওয়ানিজ টং চিফ মো পাই বলল। 'দু'পক্ষকেই আগে রাজি হতে হবে, আমার মধ্যস্থতা বা বিচার মানবে তারা।'

'আমি মানব,' বলল চিত্রলেখা। 'আশা করি আপনার রায় পক্ষপাতদুষ্ট হবে না।'

'আমিও মানব,' বলল থাই টং চিফ জিকো তানাই। 'তবে অনুরোধ থাকবে থাই থান্ডারের অতি লোভের যেন নিন্দা করা হয়।'

খুক করে কেশে তাইওয়ানিজ টং চিফ মো পাই বলল, 'সবাইকে আমি শুধু একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই – কাজটা কিন্তু একটি মহাক্ষমতাশালী পরাশক্তির। এই কাজ যার কারণেই ব্যর্থ হোক, ওরা কিন্তু আমাদের সবাইকে কঠিন শাস্তি দেবে।' একটু বিরতি নিল সে, তারপর আবার বলল, 'হ্যাঁ, আমিও বলি, থাই থান্ডার দ্বিতীয় দফায় বিশ মিলিয়ন ডলার দাবি করে অন্যায় করেছিল। তবে সেই সঙ্গে এ-ও বলি, এটাই তো আমাদের পেশা – কারও দুর্বলতাকে পুঁজি করে যত পারা যায় কামিয়ে নেয়া। আফটার অল, আসল কাজটা তো ওরাই করেছে, তাই না? থাই টং তো মাঝখান থেকে কমিশন খাচ্ছিল কেবল।

'তারপরেও সবকিছুরই একটা সীমা আছে, এবং সেই সীমা থাই থান্ডার লঙ্ঘন করে গেছে। আমার বিবেচনা বিশ মিলিয়ন ডলার অযৌক্তিক দাবি, আবার বিশ হাজারও ফালতু প্রস্তাব। টাকার অঙ্কটা হওয়া উচিত পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।'

কামরার ভিতর নীরবতা নেমে এল।

ঝাড়া ত্রিশ সেকেন্ড পর তাইওয়ানিজ টং চিফ মো পাই আবার মুখ খুলল, 'আমরা তা হলে এই সমঝোতায় পৌঁছালাম যে টাকা-পয়সার লেনদেন চেকের মাধ্যমে নয়, নগদে হবে। বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে যেহেতু সিঙ্গাপুরে লুকিয়ে রেখেছে থাই থান্ডার, সেখানেই টাকার বিনিময়ে তাঁকে গ্রহণ করবে থাই টং।'

'চিত্রলেখা বলুন,' মুখ খুলল থাই টং চিফ জিকো, 'বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে সিঙ্গাপুরের কোথায় রাখা হয়েছে, এবং টাকাটা আমরা কোথায় পৌঁছে দেব।'

মাথা নাড়ল চিত্রলেখা। 'কথা দিয়ে সেটা রাখা হয়নি,' বলল সে।

'কথা তো আপনারাও রাখেননি,' পাল্টা জবাব।

'কাজেই একটা অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। আমরা আপনাদের সিঙ্গাপুরি আস্তানায় তিলসুলানন্দকে পাঠাব, আপনারা তার হাতে টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন। পথে তার বা টাকার কিছু হলে, আপনারা দায়ী থাকবেন। টাকা বুঝে পাবার পর ফোনে একটা

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

ঠিকানা জানাব আমরা, সেখানে গেলে ডক্টর নাদিরাকে পেয়ে যাবেন...'

'এই! কে ওখানে!' অকস্মাৎ হুংকার ছাড়ল জিকো তানাইয়ের একজন দেহরক্ষী, সরাসরি খিলানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

করিডরে কেউ নেই দেখে রানার কাঁধের উপর দিয়ে খিলানের ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করছিল লাবণী, নিশ্চয়ই দেহরক্ষীর চোখে ধরা পড়ে গেছে।

'সর্বনাশ!' বলে লাবণীর হাত ধরে ছুটল রানা, তবে যেদিক থেকে দুর্গের ভিতর ঢুকেছে সেদিকে নয়, আরও ভিতর দিকে।

ভাগ্যটা ওদের ভালই বলতে হবে যে মোমবাতির কাঁপা কাঁপা আলোয় কী দেখেছে নিজেও নিশ্চিত ছিল না জিকো তানাইয়ের দেহরক্ষী। হুংকার ছাড়লেও কেউ সাড়া না দেওয়ায় ভাবল, নিশ্চয়ই ছায়া দেখেছে সে।

সামনের বাঁকটা ঘুরে হাঁটার গতি কমিয়ে আনল রানা। ওর পাশেই থাকছে লাবণী। ফিসফিস করে জানতে চাইল সে, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'তোমার ধারণা সত্যি কি না জানতে,' বলল রানা। 'তুমি বলেছ প্লেনটা এখানে কোথাও আছে।'

সামনের একটা কামরা থেকে সেই দুজন কুলিকে বেরুতে দেখল ওরা, এখন তাদের মাথায় বাক্স নেই। ওদেরকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখল তারা, তবে কিছু বলল না, পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

তারা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হতেই খোলা দরজা দিয়ে কামরাটার ভিতর ঢুকল রানা, পিছু নিয়ে লাবণীও। এক মিনিট পর বেরিয়ে এল আবার, দুজনের মাথাতেই ছোট আকারের একটা করে কাঠের বাক্স। এই অবস্থায় দেখলে সহজে কেউ ওদেরকে সন্দেহ করতে পারবে না।

আরও তিনটে বন্ধ কামরার দরজা ও দুটো খোলা খিলানকে পাশ কাটাল ওরা। করিডরের চৌমাথায় পৌঁছে কোন্ দিকে যাবে ভাবছে রানা, একটা গুঞ্জন শুনতে পেয়ে ডান দিকে রওনা হলো। কিছু দূর যাওয়ার পর সামনে পড়ল বিরাট হলরুম, এক মাথায় নীচে নামবার সিঁড়ি, আরেক মাথায় উপরে ওঠার। গুঞ্জনটা ভেসে আসছে নীচে থেকে।

লাবণীকে পিছু নেওয়ার ইঙ্গিত করল রানা। ধাপ বেয়ে নামছে ওরা। খানিকটা নেমে মোচড় খেয়েছে সিঁড়িটা। ধাপগুলো কংক্রিটের। আরেকটা করিডরে নামতে যাচ্ছে, এই সময় রানা দেখল বাম দিক থেকে দুজন লোক হন হন করে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। পিছু হটে সিঁড়ির ধাপে ফিরতে গিয়ে আরেকটু হলে লাবণীকে ধাক্কা দিতে যাচ্ছিল ও।

মাথায় বাক্স নিয়ে সিঁড়ি ধাপে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। পায়ের আওয়াজ দ্রুত এগিয়ে আসছে। চিনা ভাষায় কথা বলছে উত্তেজিত লোক দুজন, কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না। সিঁড়িকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল তারা, ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকাল না। রানার বাহুতে নিজের গালটা বারবার ঘষছে লাবণী, বিড়াল যেমন গা ঘষে মানুষের পায়ে।

ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকাল রানা।

নিঃশব্দে হাসল লাবণী। 'চুলকাচ্ছিল।'

সিঁড়ি থেকে নেমে এসে করিডরের দু'দিকে তাকাল ওরা। কেউ নেই। বাম দিকে এগোল, আরেক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে আরও এক ফ্লোর নীচে নামল। এই সিঁড়িটা শেষ হয়েছে একটা দরজার সামনে। হাত দিতেই খুলে গেল কবাট, লাবণীকে নিয়ে একটা টানেলে ঢুকল রানা।

টানেলে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। দেয়াল বরাবর বিশ ফুট পরপর একটা করে ছোট আকারের স্পিকার ফিট করা। লোকজন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। টানেলটা বাম দিকে প্রায় সিকি মাইল এগিয়ে অলসভঙ্গিতে বাঁক নিয়েছে ডানদিকে। খানিক পর পর

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

দেয়ালের গা পিছিয়ে গেছে, ওখানে একটা করে কুলঙ্গি।

মাথায় বোঝা নিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে হাঁটতে ইতিমধ্যে দুজনেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে, হাত দিয়ে ধরে না থাকা সত্ত্বেও গামছা বসানো খুলি থেকে বাক্সটার পড়ে যাওয়ার কোনও ভয় নেই।

পা চালিয়ে এগোল ওরা, দেয়াল ঘেঁষে হাঁটছে। ধনুক আকৃতির বাঁকের কাছে আসবার পর হাঁটার গতি কমিয়ে আনল। ওদের সামনে প্রকাণ্ড আকারের দুটো সুইং ডোর – আসলে ফটক। একেকটা পঞ্চাশ ফুট উঁচু, চওড়ায় তার দ্বিগুণ। ওগুলোর পিছন থেকে ভোঁতা একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

লাবণীকে নিয়ে কিছুটা পিছিয়ে এল রানা, একটা কুলঙ্গির ভিতর দিকে সরে এসে মাথার বাক্সটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল। 'এখানে অপেক্ষা করো, আমি চেক করে আসি,' বলল ও।

ওর দেখাদেখি নিজের বাক্সটাও নামিয়েছে লাবণী। মাথা ঝাঁকিয়ে নার্ভাস একটু হাসল সে।

বাঁকটা পুরো ঘুরে এগোল রানা, লক্ষ করল ফটক দুটোর গায়ে স্বাভাবিক আকৃতির একটা করে দরজাও আছে। বাম দিকের দরজাটা খোলার জন্য নব-এর দিকে হাত বাড়াতে যাবে ও, এই সময় নিজে থেকেই খুলে গেল সেটা।

হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল দীর্ঘদেহী এক লোক, প্রকাণ্ড মুখটা ঘামে ভিজে আছে। গায়ের রঙ হলুদ, চোখ দুটো সরু ফাটল মাত্র। পরনে সাদা সুট, বুকের কাছে লাল গোলাপ আটকানো। দেখা মাত্র চিনল রানা, সঙ্গে সঙ্গে হাতে বেরিয়ে এল ছুরিটা।

রানাকে দেখে হাঁ হয়ে গেল চাই-পাই দেও।

কল্পনার চোখে ইমরুল কায়েসের প্রাণবন্ত চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে রানা। দেওয়ের হাত শার্টের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। ছুরির সরু ফলাটা তরোয়ালের মত সোজা ঢুকিয়ে দিল রানা তার বুকে, ফলার ডগা দিয়ে চিরে দিল হৃৎপিণ্ডটাকে। আরেকটু ঠেলে হাতল পর্যন্ত ঢোকাল ও। তারপর পিছিয়ে এসে ছুরিটা টান দিয়ে বের করে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ের শার্টের সামনেটা লাল হয়ে উঠল, সুটে বাটনহোলে আটকানো ওই একই রঙের গোলাপটাও ঠিক এই সময় টুপ করে পড়ে গেল করিডরের মেঝেতে। এক পা পিছু হটল থাই চিনা। মুক্তোখচিত হাতলসহ ছোট্ট পিস্তলটাও শার্টের ভিতর থেকে খসে পড়ল। ঘুরে রানার দিকে পিছন ফিরল চাই-পাই দেও, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, চাওয়া-পাওয়ার আর কিছু নেই তার।

ছুরির ফলা মুছে মৃতদেহটা টেনে নিয়ে গিয়ে বড় একটা কুলুঙ্গিতে লুকিয়ে রাখল রানা, তারপর ফিরে এসে দরজাটা খুলল। কামরার ভিতর হালকা ধোঁয়া রয়েছে। ফায়ার এক্সটিংগুইশার নিয়ে ছুটোছুটি করছে লোকজন।

কামরাটা বিরাট, বড় আকারের ইনডোর স্টেডিয়ামের মত। স্টেডিয়ামের মাঝখানে বড়সড় একটা কাঠামো দেখতে পাচ্ছে রানা, তেরপল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে সেটাকে। তেরপলের গায়ে কাঠামোটার ফুটে ওঠা আকৃতি দেখে রানার আর বুঝতে বাকি থাকল না কী ওটা।

একটা প্লেন।

দশ-বারোজন লোক তেরপলের উপর সাদা ফোম স্প্রে করছে। একই সঙ্গে একটা টো কার তেরপল দিয়ে ঢাকা প্লেনটাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আরেকদিকে, ওটার পিছু নিয়ে এগোচ্ছে কমকরেও পঞ্চাশ-ষাটজন চিনা। তাদের সঙ্গে পাঁচ-সাতজন শ্বেতাঙ্গকেও দেখল রানা, চেহারায় বয়স ও ব্যক্তিত্বের ছাপ দেখে মনে হলো পাইলট কিংবা অ্যারোনটিক ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে।

তেরপলে ঢাকা থাকায় বোঝার কোনও উপায় নেই যে ওটা বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের জেট দুরন্ত ঈগল কি না। কামরার

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

ভিতরে কোথাও আগুনের চিহ্নমাত্র নেই, শুধু ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছে রানা। ওর মত কুলি আর কেউ নেই ভিতরে, তারপরেও সাহস করে ভিড় ঠেলে এগোল রানা, কাছ থেকে দেখে যদি কিছু বুঝতে পারে এই আশায়। প্লেনটাকে পুরো এক চক্কর ঘুরে আসতে দশ-বারো মিনিট লেগে গেল, কিন্তু রহস্যের কোনও কিনারা করতে পারল না ও।

তেরপলের কোণ ধরে তুলতে পারলে ভিতরটা দেখা যায়, কিন্তু তাতে নিজের দিকে সন্দেহের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হবে। তা ছাড়া, চিনারা এমনভাবে ঘিরে রেখেছে, ওটার পাঁচ ফুটের মধ্যেও পৌঁছাতে পারছে না রানা।

রানার ইচ্ছে দৃশ্যটা লাবণীও দেখুক। চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে, স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে এসে বাঁকের দিকে এগোচ্ছে ও।

এই সময় লাউডস্পিকার থেকে ভারী একটা কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল। 'অ্যাটেনশন এভরিবডি! অ্যাটেনশন! একটি বিশেষ ঘোষণা। আমাদের আস্তানায় শত্রুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে! ধারণা করা হচ্ছে সংখ্যায় তারা কয়েকজন। দুর্গের সমস্ত জানালা-দরজা ও ফটক বন্ধ করে দাও। রিজার্ভ গার্ডরা ডিউটিতি চলে এসো! সবাই খেয়াল রাখো কোনও অবস্থাতেই তারা যেন দুর্গ থেকে বেরুতে না পারে।'

হনহন করে এগোচ্ছে রানা। বাঁকটার কাছে ফিরে এসে কুলঙ্গিতে ঢুকল। তারপর স্থির হয়ে গেল ও। শুধু বাক্স দুটো রয়েছে, লাবণী নেই – না কুলঙ্গিতে, না টানেলে।

এগারো

দুর্গে শত্রুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে শুনে স্টেনগান ও কারবাইন হাতে নিয়ে দ্বিতীয় ফটকের দরজা দিয়ে পিলপিল করে বেরিয়ে এল থাই টং-এর রিজার্ভ গার্ডরা। বাঁক ঘুরে সিঁড়ির দিকে ছুটছে তারা, তাদের সঙ্গে রানাও ছুটছে।

সিঁড়ির অর্ধেকটা নির্বিঘ্নে নেমে এল রানা। তারপর গার্ডদের উল্টো একটা স্রোতের মুখে পড়তে হলো। একে তো কিছু লোক নামছে, কিছু লোক উঠছে, তার উপর কেউ কাউকে পথ ছাড়তে রাজি নয়। ফাঁক গলে কোনওরকমে নীচে নামতে পারল রানা।

করিডরের অবস্থা আরও খারাপ। জনস্রোতের দুটো ধারা এখানেও পরস্পরের উল্টোদিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। দুই স্রোতের মাঝখানে আটকা পড়ে নিজেকে যখন নিরাপদ বলে ভাবতে শুরু করেছে রানা, ঠিক তখনই ছয় ফুট লম্বা এক শ্বেতাঙ্গ অবাক চোখে ওর দিকে চেয়ে নাকি মার্কিনী উচ্চারণে ইংরেজিতে বলল, 'যেন চেনা চেনা লাগে?'

কিছু বুঝতে না পারার ভান করে সোজা সামনে তাকিয়ে লোকটাকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করল রানা।

পরমুহূর্তে হিংস্র উল্লাসে হেসে উঠল শ্বেতাঙ্গ লোকটা। 'ওহ্ গড, হাউ ফানি অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং! তুমিই তা হলে অনুপ্রবেশ করেছ – মাসুদ রা...'

চিনাদের হইচইকে ছাপিয়ে গুলির শব্দ হলো। রানার হাতে বেরিয়ে আসা পিস্তল থেকে হয়েছে গুলিটা। শ্বেতাঙ্গ লোকটা কল্পনাও করতে পারেনি এত শত্রুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে এভাবে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক গুলি চালাবে রানা।

ব্যথায় ও বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল এসপিওনাজ এজেন্ট, হাত

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

চাপা দিল ঠিক যেখানে তার হৃৎপিণ্ডটা ফুটো হয়েছে। চোখ নামিয়ে তাকাল সে, আঙুলের ফাঁক গলে রক্ত বেরিয়ে আসছে। তারপর নিস্তেজ হয়ে গেল তার চোখ দুটো। মারা গেছে, কিন্তু জায়গার অভাবে লাশটা পড়ছে না।

আশপাশের চিনা গার্ডরা অনেকেই এখন তাকিয়ে আছে রানার দিকে। নিজেদের মাঝখানে শত্রুকে পেয়েও কী করবে বুঝতে পারছে না তারা। পরস্পরের সঙ্গে চিড়ে চ্যাপ্টা হচ্ছে সবাই, কেউই তার আগ্নেয়াস্ত্র কায়দা মত ধরতে পারছে না। নিজের পথ করে নেওয়ার জন্য ডান হাতে ধরা পিস্তলের ট্রিগার আরেকবার টিপে দিল রানা। এক লোকের একটা হাত ওর গলার দিকে এগিয়ে আসছিল, নেতিয়ে পড়ল সেটা।

প্রচণ্ড চাপের মধ্যে বিভ্রান্ত ও দিশেহারা সবাই, তারই সুযোগ নিচ্ছে রানা। এক গার্ড তার পিস্তল বের করবার চেষ্টা করছে, দেখতে পেয়েই ব্যারেল ঘুরিয়ে আবার ট্রিগার টিপল ও। গুলি খেয়ে উল্টে গেল তার চোখ।

বুকে ও কাঁধে ঘুসি অনুভব করল রানা, ঝাঁকি খাচ্ছে ওর শরীর। চারপাশ থেকে আঘাত আসছে। এখন শুধু একটু ফাঁকা জায়গা দরকার ওদের, চারদিক থেকে ওকে ধরে ছিঁড়ে কুটিকুটি করবে থাই চিনারা।

দুজন গার্ড এভাবে সুবিধে হবে না বুঝে দ্রুত পিছিয়ে গেল কিছুদূর। পিছাবার জায়গা পেতে তেমন কোনও অসুবিধে হলো না। প্রথম সুযোগেই রানার বুক লক্ষ্য করে রাইফেল তুলতে যাচ্ছে দুজন একযোগে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে দেখতে পেয়ে কোমরের কাছ থেকে ট্রিগার টিপল রানা। একবার, তারপর আরেকবার।

তাড়াহুড়ো করায় ঠিকমত লক্ষ্যস্থির করা হয়নি। দুটো বুলেটই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। থেমে নেই ও, ট্রিগারটা বারবার টিপছে। আরও দুটো বুলেট বেরুবার পর ক্লিক করে উঠল পিস্তল, ম্যাগাজিন খালি হয়ে গেছে।

একজনের আর্তনাদ শুনতে পেল রানা, ফোঁপাচ্ছে আরেকজন। দুজনেই তারা যে যার কাঁধে রাইফেল তুলে ফেলেছিল, একজনের খুলির একটা পাশ উড়িয়ে দিয়েছে ও, আরেকজনের বুকের বাম পাশ ফুটো হয়ে গেছে। তবে সেই সঙ্গে নিজের মৃত্যুও বুঝি ডেকে এনেছে রানা।

পিস্তলে গুলি নেই বুঝতে পেরে থাই চিনারা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে ওকে। উল্টো করে ধরা পিস্তলটা নিজের চারপাশে এলোপাথাড়ি চালাচ্ছে রানা, কারও মাথা, কারও কপাল বা নাক লক্ষ্য করে, নাগালের মধ্যে যেটা পাওয়া যায়।

নিচু হলো এক লোক, রানার একটা পা জড়িয়ে ধরল দু'হাতে। এক লোকের শার্টের সামনেটা খামচে ধরল রানা, ঠেলে দিল ওর দিকে তাক করা একটা রাইফেলের মাজল লক্ষ্য করে। বদ্ধ করিডরে বোমা ফাটার মত আওয়াজ হলো। কোনওদিকে খেয়াল নেই রানার, বিদ্যুৎ বেগে পা চালিয়ে নিজেকে মুক্ত করে ছুটল সিঁড়ির দিকে।

তিনজন চিনা পিছু নিল ওর। ছয়টা ধাপ ওঠার পর ঘুরল রানা, সামনের লোকটার মুখে লাথি মারল। বাকি দুজনের উপর আছাড় খেল সে, তিনজনই ছিটকে পড়ল করিডরে। এই সুযোগে দ্রুত হাতে খালি ম্যাগাজিনটা পিস্তল থেকে বের করে ফেলল রানা, তারপর ওয়েস্টব্যান্ড থেকে টেনে নিয়ে এক্সট্রা ক্লিপটা ভরল। স্লাইড রিলিজে চাপ দিতেই সড়াৎ করে বুলেট ঢুকল চেম্বারে। আবার তৈরি রানা।

দুটো করে ধাপ টপকে উপরের খালি করিডরে উঠে এল রানা। চৌমাথায় পৌঁছেও কারও সঙ্গে দেখা হলো না ওর। দূর থেকে দেখে নির্দিষ্ট খিলানটা চিনতে পারল, মাথায় ড্রাগনের মূর্তি ঝুলছে। কিন্তু ভিতর থেকে কোনও আওয়াজ আসছে না আর।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

খিলানের সামনে এসে দাঁড়াল রানা, মোমবাতির আলোয় দেখল সোফাগুলো সব খালি। শেষ মাথার একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে প্রকাণ্ডদেহী এক লোক, তার কাঁধে দু-ভাঁজ হয়ে পড়ে রয়েছে নোংরা জিনস্ ও ফতুয়া পরা লাবণী। কোনও রকম ধস্তাধস্তি করছে না দেখে রানা ধরে নিল লাবণীর জ্ঞান নেই।

প্রকাণ্ডদেহী লোকটার চোখে সানগ্লাস রয়েছে বলে মনে হলো রানার। এই লোকটাই সম্ভবত তাইওয়ানিজ টং-এর লিডার মো পাই। পিছু নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তার দেহরক্ষীও।

'এই, দাঁড়াও!' দু-হাতে বাগিয়ে ধরা পিস্তল, কামরার ভিতর ঢুকে বন্ধ হতে শুরু করা দরজার দিকে ছুটল রানা। ওর নির্দেশের পিছু নিয়ে ছুটল দুটো বুলেটও।

কোথায় লাগল বোঝা না গেলেও, দেহরক্ষীর গলা থেকে বেরিয়ে আসা কাতর আওয়াজটা পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। কিন্তু তারপরও কবাট লাগিয়ে লক করে দিল সে।

ছুটে এসে কপাটে লাথি মারল রানা। খুলল না। রাগে ও উদ্বেগে দিশেহারা বোধ করছে, তিন পা পিছিয়ে এসে নব লক্ষ্য করে দুটো গুলি করল। মুঠো ঢোকার মত একটা গর্ত তৈরি হলো। না ছুঁতেই একটু খুলে গেল কবাট।

টান দিয়ে সবটুকু খুলল রানা। উপরদিকে উঠে গেছে পাকা এক প্রস্থ সিঁড়ি। সামনেই কয়েকটা রক্তাক্ত ধাপের উপর পড়ে রয়েছে দেহরক্ষী। মারা গেছে কি না দেখার প্রয়োজন বোধ করল না রানা।

দুটো করে ধাপ টপকে উঠে যাচ্ছে ও, কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে প্রকাণ্ডদেহী মো পাইয়ের কাঁধে অসাড় পড়ে রয়েছে লাবণী। পায়ের নীচে দ্রুতগামী এস্কেলেটর-এর মত পিছিয়ে যাচ্ছে ধাপগুলো, স্পর্শ করছে কি না ধরা পড়ছে না চেতনায়।

একের পর এক কয়েক প্রস্থ সিঁড়ি পার হয়ে এল রানা, তবু এর যেন কোনও শেষ নেই। হাঁপাতে শুরু করেছে ও। ফুসফুস ব্যথা করছে। পিস্তলটা দীর্ঘক্ষণ শক্ত করে ধরে থাকায় ডান হাতটা আড়ষ্ট লাগছে। তারপর হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল সিঁড়ির ধাপ।

সামনে আরেক দরজা! ওটার ওপাশ থেকে বাতাস কাটার আওয়াজ ভেসে আসছে। বেশ জোরাল আওয়াজ, যান্ত্রিক বলে মনে হলো।

রানার হাতে ঝাঁকি খেল পিস্তল। একটা গুলিই যথেষ্ট। ডোর নব উড়ে গেল, পাশে তৈরি হলো একটা গর্ত। সেটার ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে পিতলের বোল্ট খুলতে কোনও সমস্যা হলো না। লাথি মেরে কবাটটা খুলল রানা।

দুর্গের ছাদে তুফান বইছে। বাতাসের চাপে কাপড়চোপড় সেঁটে যাচ্ছে গায়ে। ছাদে বেরুবার সময় বাতাসের সঙ্গে ছুটে আসা বালির কণার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে রানাকে। তবে হেলিকপ্টার ইঞ্জিনের আওয়াজ বাকি সব শব্দকে চাপা ফেলে দিচ্ছে।

দ্রুত ঘুরছে রোটর ব্লেড। নীচে থেকে দুর্গের ছাদে এই হেলিকপ্টারটাই দেখেছিল রানা। রঙটা কালো, কোথাও কোনও মার্কিং নেই। ছাদের মেঝে থেকে শূন্যে উঠতে শুরু করল ওটা, গোটা কাঠামো থরথর করে কাঁপছে।

মাথা নিচু করে ওটার একটা পাশ লক্ষ্য করে এগোচ্ছে রানা। প্রকাণ্ড বুদ্বুদ আকারের কন্ট্রোল কেবিন লক্ষ্য করে পর পর তিনটে গুলি করল ও। গুলির শব্দ পায়নি, তবে ফাইবার গ্লাস গম্বুজে গর্ত তৈরি হতে দেখল। চেম্বার খালি হয়ে গেছে, দ্রুত হাতে আরেকটা স্পেয়ার ক্লিপ ভরল রানা। এটাই শেষ, আর নেই।

আরও জোরে গর্জে উঠল ইঞ্জিন। কপ্টারের হুইল ছাদ ছেড়ে উঠে পড়ল। প্রকাণ্ড ব্লেডগুলোর জন্য সামনে এগোতে ভয় পাচ্ছে রানা, মেঝেতে একটা হাঁটু গাড়তে বাধ্য হলো। ছাদে কোথাও বালির স্তূপ আছে, বাতাসের সঙ্গে উড়ে এসে চোখে-মুখে সুইয়ের মত বিঁধছে কণাগুলো।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

কপ্টার অচল হয়ে যাবে, তাই ইঞ্জিনে গুলি করতে ভয় পাচ্ছে রানা। রানার দাঁতে লেগে কিচকিচ করছে বালির কণা। পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করে আবার ফায়ার শুরু করল ও। কন্ট্রোল কেবিনের ফাইবার গ্লাসে আরও তিন-চারটে গর্ত তৈরি হলো। কানের পরদা ফাটানোর মত আওয়াজ করছে ইঞ্জিনটা। মেঝে থেকে পাঁচ-ছ'হাত উপরে উঠে গেল হুইল। তারপর আবার নামতে শুরু করল।

হঠাৎ প্যাসেঞ্জার কেবিনের দরজা খুলে গেল, ভিতর থেকে গড়িয়ে নেমে এল লাবণীর অসাড় শরীর।

ওকে খুন করে লাশটা ফেলে দিল মো পাই, অন্তত প্রথমে তাই ভাবল রানা। তারপর দেখল নড়ছে লাবণী, ধীরে ধীরে সরে আসবার চেষ্টা করছে কপ্টারের নীচ থেকে।

মাথা নিচু করে ছুটল রানা, কারণ নিয়ন্ত্রণহীন কপ্টার সরাসরি লাবণীর উপর নেমে আসছে।

ক্রল করে নিজেই খানিকটা সরে এল লাবণী, তারপর রানা তাকে টেনে নিরপদ দূরত্বে সরিয়ে আনল। ওদের কাছ থেকে তিন কি চার হাত দূরে মেঝেতে নামল মস্ত যান্ত্রিক ফড়িংটা।

'তোমার গুলি খেয়ে মারা গেছে মো পাই,' রানার কানের কাছে ঠোঁট তুলে বলল লাবণী। 'লাশটা কন্ট্রোল কেবিন থেকে সরাতে হবে।'

মাথা নিচু করে প্যাসেঞ্জার ডোর দিয়ে কপ্টারে ঢুকল রানা। হাত বাড়িয়ে উপরে উঠতে সাহায্য করল লাবণীকে। লাবণী দরজা বন্ধ করছে, সিট টপকে ফুটো হওয়া গম্বুজে ঢুকল ও।

কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে নিজের সিটের উপর কাত হয়ে আছে মো পাই, গলায় বিরাট একটা রক্তাক্ত ক্ষত। পায়ের ধাক্কায় সিট থেকে তাকে নামাল রানা, তার জায়গায় বসে কন্ট্রোল প্যানেলে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে।

কপ্টার উঠতে শুরু করেছে, ওর পাশে এসে দাঁড়াল লাবণী। গম্বুজের ঢাকনিটা তুলল সে, তারপর ভারী লাশটা ঠেলে-ঠুলে কিনারা থেকে ফেলে দিল দুর্গের ছাদে, এখন সেটা হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে দশ ফুট নীচে।

গম্বুজের ঢাকনি বন্ধ করে রানার পিছনের সিটে বসল লাবণী, একটা হাত বাড়িয়ে ওর মাথা থেকে গামছাটা খুলে নিল, চুলের ভিতর আঙুল চালাচ্ছে।

'দুর্গে একটা প্লেন দেখলাম, তেরপল ও ফোমে ঢাকা,' বলল রানা। 'তবে সেটা দুরন্ত ঈগল কি না জানি না।' তারপর জানতে চাইল, 'করিডরে বেরিয়ে কুলঙ্গিতে তোমাকে পেলাম না কেন?'

'কয়েকজন গার্ড আমাকে দেখে ফেলে,' বলল লাবণী। 'পিস্তল হাতেই ছিল, কিন্তু অতগুলো লোককে মেরে ফেলা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে সারেন্ডার করি আমি। আমার পিস্তল, ছুরি আর মাথার গামছা কেড়ে নেয় ওরা, তারপর সোজা জিকো তানাইয়ের কাছে নিয়ে হাজির করে আমাকে।'

'ওরা তোমার ওপর টরচার করেছে?'

'বলছি। ওখানে ওদের মিটিং মাত্র শেষ হয়েছে তখন। কথা শুনে বুঝলাম চিত্রলেখাকে নিয়ে হেলিকপ্টারে ওঠার জন্যে রওনা হবে জিকো। হঠাৎ কী হলো, আমাকে দেখেই চিত্রলেখা একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠল। বলল – এই ডাইনীকে আমি চিনি! রানা এজেন্সির অপারেটর! বছরে থাই থান্ডারের পাঁচ-সাতটা চালান ধরে ফেলছে ওরা, তাতে আমাদের বিশ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হচ্ছে! ওকে আমি খুন করব!'

'খোদা!' দৃশ্যটা কল্পনা করে শিউরে উঠল রানা।

দুজন গার্ড দু'দিক থেকে ধরে রেখেছে আমাকে,' বলল লাবণী। 'চিত্রলেখা কারাতের কোপ মারার ভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। তার চোখ-মুখ দেখে বুঝতে পারলাম, খুনের নেশায় পেয়েছে তাকে। কোত্থেকে শক্তি পেলাম জানি না, প্রচণ্ড এক ঝটকায় গার্ডদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম,

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

তারপর ফ্লাইং কিক মারলাম চিত্রলেখার বুকে।

'কী কারণে সে মারা যায়নি, আমি বলতে পারব না। জিকো তার পিস্তলের বাঁট দিয়ে আমার মাথার পেছনে বাড়ি মারতে মেঝেতে পড়ে যাই আমি। তবে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাইনি।'

'কী দেখলে?'

'দূরে ছিটকে পড়ার পর কয়েক সেকেন্ড নড়ল না চিত্রলেখা। অনেকেই ছুটে গেল তার দিকে। তারপর দেখলাম নিজেই ধীরে ধীরে দাঁড়াচ্ছে সে। এই সময় তাইওয়ানিজ টং চিফ মো পাই বলল, 'ব্রাদার জিকো, আপনি অনুমতি দিলে রানা এজেন্সির এই অপারেটরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই আমি। কোথাকার পানি কোথায় গড়ায় কিছুই তো বলা যায় না, ওকে আমাদের কাজে লাগতে পারে। জিকো রাজি হলো। আর ঠিক তখনই টেলিফোনে খারাপ কিছু রিপোর্ট পেল সে। শুনলাম লাউডস্পিকারে কী যেন ঘোষণা করছে। শুনতে পাইনি, কারণ তখনই আমি জ্ঞান হারাই।'

'ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছ,' লাবণীর কথা শেষ হতে বলল রানা। 'তোমাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিল মো?'

'ঠিক জানি না, সম্ভবত সিঙ্গাপুরে।'

'সহকারী দেও মারা গেছে, কাজেই থাই থান্ডারকে টাকা দিয়ে ডক্টর নাদিরাকে হাতে পাবার জন্যে জিকোকেই যেতে হবে সিঙ্গাপুরে। চিত্রলেখাও সেখানে ফিরবে, তার বয়ফ্রেন্ড চক্রি চুয়ানকে রিপোর্ট করার জন্যে।'

'আমরাও নিশ্চয়ই ব্যাংকক হয়ে সিঙ্গাপুরে যাচ্ছি, মাসুদ ভাই?' খুব আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল লাবণী, বিপজ্জনক ও রোমাঞ্চকর অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঘুরে বেড়াতে ওদের পেশার কার না ভাল লাগে।

'না, লাবণী, এখানে তোমার কাজ আছে,' বলল রানা, ফুয়েল গজের উপর চোখ। 'আমরা ব্যাংকক এয়ারপোর্টে নামার পর তুমি একা শেরাটন হোটেলে ফিরবে। নিজের স্যুইটে ঘণ্টা কয়েক ঘুমাবে, তারপর দুজনের বিল মেটাবে, দুটো স্যুইট থেকে জিনিস-পত্র নিয়ে হেলিকপ্টার সার্ভিসে চড়ে ফিরে যাবে হাট খোয়াইয়ে।'

'ওখানে আমার কাজ কী, মাসুদ ভাই?' সিরিয়াস হয়ে উঠল লাবণী।

'নন্দনকাননেই উঠবে তুমি,' নির্দেশ দিল রানা। 'তোমার আসল কাজ প্লেনটা সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখা। তা ছাড়া, দুর্গে কারা আসা-যাওয়া করছে...'

'বুঝেছি,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল লাবণী। 'আর তুমি?'

'এয়ারপোর্ট লকারে আমার পাসপোর্ট ও ক্রেডিট কার্ড আছে, ভিসা নিয়ে ওখান থেকেই সিঙ্গাপুরে চলে যাব আমি – টার্মিনাল বিল্ডিঙের কোনও দোকান থেকে পরার মত কিছু কিনে নেব।'

পুবদিকের আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে দেখে হঠাৎ লাবণী জানতে চাইল, 'কিন্তু তুমি ঘুমাবে না?'

'সিঙ্গাপুরে পৌঁছে,' বলল রানা। 'ব্যাংকক থেকে কাছেই তো।'

'পাঁচ মিলিয়ন ডলার হাতে পেলে থাই থান্ডার ডক্টর নাদিরাকে থাই টঙের হাতে তুলে দেবে,' বলল লাবণী। 'কিন্তু আমরা কি কোনও সূত্র পেয়েছি, বিনিময়টা সিঙ্গাপুরের কোথায় হবে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'তা না জানলেও, চক্রি চুয়ানের ক্যাসিনোর নাম জানি, বিগ ডিল। ওটা আয়ার রাজা রোডে। আরও জানি যে টাকাটা আনতে যাবে থাই থান্ডারের প্রতিনিধি প্রেম তিলসুলানন্দ।'

দোই ইনথানন পাহাড়ে পরিচয়, উত্তরা উৎকর্ণার কথা মনে পড়ে গেল রানার। মেয়েটি ওকে বেশ কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছে – সাহায্য করেছে, নাকি ফাঁদে ফেলার আয়োজন করে রেখেছে?

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

বারো

সিঙ্গাপুর। আয়ার রাজা রোড।

সন্ধ্যার পর উৎসবে-আনন্দে মেতে উঠেছে দেশি-বিদেশি পর্যটকরা, সারাদিন ফাইভ স্টার হোটেল স্যুইটে ঘুমিয়ে নিয়ে আলগোছে তাদের ভিড়ে মিশে গেল রানাও। গোটা এলাকায় নাইট ক্লাব, ক্যাসিনো ও ম্যাসাজ পারলার-এর ছড়াছড়ি।

সামনেই নিওনসাইন জ্বলছে-নিভছে, ক্যাসিনো বিগ ডিল। খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকছে রানা। বাতাসে মৌ-মৌ করছে পারফিউম-এর মিষ্টি গন্ধ, তার সঙ্গে মিশে আছে ঘাম ও বিয়ারের ঝাঁঝ।

ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে পার্টিতে যোগ দিতে যাচ্ছে কয়েকজন তরুণ-তরুণী, তাদের উচ্ছ্বাসভরা আলাপ ও হাসি অনেকেরই দৃষ্টি কেড়ে নিল। হঠাৎ করে পরনের সুটে অপ্রত্যাশিত খসখসে কিছু অনুভব করল রানা।

ঝট করে একটা হাত ছুঁড়ল ও। এই মাত্র ওর পকেট মার হয়ে গেছে।

ওর মুঠোয় একটা কবজি ধরা পড়েছে। সেটাকে মুচড়ে বাঁকা করতে চেষ্টা করছে রানা।

দরজার ঠিক ভিতরে রয়েছে ও, পকেটমারের হাতটার সঙ্গে নিঃশব্দে ওর সামনে চলে এল হাতের মালিকও। সুন্দর একজোড়া চোখ দেখতে পাচ্ছে রানা; বুদ্ধির ঝিলিক ও মার্জিত ভাব, দুটোই আছে সেগুলোয়, তবে এই মুহূর্তে ব্যথায় ঝাপসা হয়ে আসছে লোকটার দৃষ্টি। হালকা সবুজ রঙের সুট ও বাদামী রঙের টাই পরে আছে সে। রানা ভাবল, এরকম একজন নিপাট ভদ্রলোক পকেটমার?

দরজা দিয়ে প্রচুর ব্যস্ত লোকজন আসা-যাওয়া করছে, ওদের দিকে খেয়াল নেই কারও। নতুন যারা ঢুকছে তাদের কিছু চলে যাচ্ছে রেস্তোরাঁ কিংবা বারের দিকে, কেউ কেউ সরাসরি ক্যাসিনোতে ঢুকে বসে পড়ছে জুয়ার টেবিলে।

'এটা বোধহয় আমার,' বলল রানা। হঠাৎ নেতিয়ে পড়া বাম হাতের আঙুল থেকে নিজের মানিব্যাগটা টেনে নিল ও।

ত্রিশ-বত্রিশ বয়স হবে লোকটার, ছোটখাট কাঠামো। ঘামে ভিজে গেছে কপালটা। তবে অসম্ভব জেদি মানুষ, ব্যথার কাছে হার মানতে রাজি নয়। মুখে এতটুকু ভাঁজ পড়েনি, শ্বাস-প্রশ্বাসও কীভাবে যেন স্বাভাবিক রেখেছে।

'নমস্তে, হুজুর! সেলাম, সার!' পরিষ্কার হিন্দি উচ্চারণ লোকটার। তারপর রানাকে হতভম্ব করে দিয়ে বিশুদ্ধ বাংলায় বলল, 'যাবতীয় অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করে দিতে আজ্ঞা হোক, মহাশয়। এখানে আসলে, বুঝলেন না, নির্ভেজাল একটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার ঘটেছে। আপনাকে রাজীব মনে করেছিলাম,' কুর্ণিশ করবার জন্য পিছিয়ে যাওয়ার ছলে রানার শক্ত মুঠো থেকে নিজের হাতটা ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে।

'রাজীব গান্ধী?' চ্যালেঞ্জের সুরে জানতে চাইল রানা।

'না-না! আমার ফুফাতো ভাই, সার, বুঝলেন না! একদম আপনার চেহারা। আমরা দুজন সব সময় এটা করি। কী যেন বলে... কৌতুক, সার! মানে, কে কাকে বোকা বানাতে পারে আর কী, বুঝলেন না।'

'এখানে কি কোনও সমস্যা হয়েছে, প্লিজ?' রানার পাশে উদয় হলো ক্যাসিনোর একজন বডিবিল্ডার গার্ড। কী কারণে যেন রেগে

www.MurchOna.com

আছে সে, কিংবা তার চেহারাটাই অমন।

'সমস্যা? তা বলতে পার, তবে সেটা এমন কঠিন কিছু নয় যে আমরা নিজেরাই সমাধান করে নিতে পারব না,' তাড়াতাড়ি বলল খুদে লোকটা। চট করে রানা ও গার্ডকে দেখে নিল।

'সামান্য একটু ভুল বোঝাবুঝি,' বলল রানা। পকেটমারের কবজি ছেড়ে দিল ও, তারপর হাত তুলে লোকটার কোঁচকানো সুটের কাঁধ থেকে ধুলো ঝেড়ে দিল। 'ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনার জন্যে আমরা এখন বাইরে বেরুব।'

'জে, আজ্ঞে,' ম্লান সুরে বলল লোকটা, কবজিটা ডলছে। কী ভেবে মাথা নাড়ল, আহত হাতটা ধরে আছে। দরজার দিকে না এগিয়ে পিছু হটে ক্যাসিনোর ভিতর দিকে যেতে চাইছে সে।

খপ্ করে তার হাত ধরে দরজার দিকে এগোল রানা। 'আলাপটা আমরা এখনই সেরে নেব,' কর্তৃত্বের সুরে বলল ও, লোকটাকে টেনে বের করে আনল বাইরে।

ক্যাসিনোর ভিতর থেকে ইংলিশ মিউজিকের আওয়াজ ও বডিবিল্ডার থাই গার্ডের স্বস্তিভরা দৃষ্টি অনুসরণ করল ওদেরকে।

'বিদেশ-বিভুঁইয়ে আমি এক হতদরিদ্র লোক, সার, বুঝলেন না!' ফুটপাথের একধারে স্থির হয়ে দাঁড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করে মিনতির সুরে বলল লোকটা।

'আমরা সবাই তাই।' তাকে নিয়ে দালানটার বাঁক ঘুরে সরু গলিতে চলে এল রানা। আলো এখানে খুবই কম, পেচ্ছাবের ঝাঁঝাল দুর্গন্ধ বক্সিং মারল নাকে। ভাঙা কাঁচ ও তোবড়ানো বিয়ারের ক্যানে ভর্তি হয়ে আছে গলিটা।

'বের করো ওটা,' বলল রানা।

'হুজুর!' টান টান হলো ছোটখাট লোকটা, আত্মসম্মানে ঘা লাগায় গোটা শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। 'আপনি আপনার মানিব্যাগ ফেরত পেয়েছেন। আমি যথাবিহিত নিয়মে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। নিম্নমানের হতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা ছিল স্রেফ একটা কৌতুক। তবে এ-কথা সত্যি যে আপনি আমার ফুফাতো ভাই রাজীবের মত দেখতে।'

'আমার ঘড়িটা,' বলল রানা। 'আমার ধারণা ওটা তোমার পকেটে।'

'কী?'

'সেইসঙ্গে আমার টাইপিন ও কাফলিঙ্ক। তোমার জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে।'

'আমি আপনাকে একশো ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, সার...' হতচকিত একটা ভাব দেখিয়ে শুরু করল চোরটা।

দুঃসাহসী লোকটার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসল রানা। 'ওগুলো তুমি বের করবে, নাকি আমিই বের করে নেব?'

চোখ মিটমিট করে কথাটা বিবেচনা করল পকেটমার। অতি ব্যবহারে নরম হয়ে আসা হালকা সবুজ রঙের সুট পরে আছে সে। সাদা শার্টটা খুব বেশি ঢোলা, রানা সন্দেহ করল নিশ্চয়ই কোনও দোকান থেকে মেরে দেওয়া। বাদামি রঙের টাইটাও সুটের মত পুরানো। কপালটা এখনও ঘামছে, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুছল সেটা।

নিঃশব্দে জ্যাকেটের ভাঁজে হাত ঢুকিয়ে রানার হাতঘড়ি, টাই পিন ও কাফ লিঙ্কটা বের করে আনল সে। সবই রানার বলা পকেট থেকে। তালুতে রাখা জিনিসগুলোর দিকে এক মুহূর্ত মন খারাপ করে তাকিয়ে থাকল সে, তারপর বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

ঘড়িটা কবজিতে পরল রানা। সোনার লিঙ্ক জায়গামত আটকাল। সবশেষে টাইয়ে গাঁথল হীরে বসানো স্টিকপিনটা।

'আমি কিন্তু খুব কমই ধরা পড়ি, সার,' বলল পকেটমার, এখনও হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে। মুখটা তার চওড়া, চিবুকে খানিকটা দাড়ি আছে, নাকটা ভাঙা।

'পেশাটা বদলে ফেলতে পার,' সাজেশন দিল রানা।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা, অপমানিত বোধ করছে। তার মাথার চাঁদি রানার নাকের ডগা পর্যন্ত পৌঁছেছে। তেল মাখা চুল থেকে গোলাপের গন্ধ বেরুচ্ছে।

'দেখুন, সার,' গর্বের সঙ্গে বলল লোকটা, 'দুই আঙুলের কাজে পারদর্শী, এরকম একটা অভিজাত ফ্যামিলি থেকে এসেছি আমি। পারিবারিক ঐতিহ্য কেউ ত্যাগ করে না।'

চোর হলেও, আত্মসম্মানজ্ঞান প্রখর, মাথা উঁচু করে গলি ধরে রওনা হলো সে।

একটু সামনেই ডাস্টবিন, ওটার পাশে বসে ছেঁড়া কাপড় পরা এক বুড়ো আবর্জনা থেকে কিছু বাছাই করছে। তার সামনে থেমে কয়েকটা কয়েন ছুঁড়ে দিল সে, তারপর পা চালিয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

কয়েনগুলো নয়, পকেটমারের গমনপথের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল বুড়ো লোকটা। তারপর দ্রুত সেগুলো কুড়িয়ে পকেটে ভরল।

মেইন রোডে ফিরে এসে ক্যাসিনো বিগ ডিল-এ ঢুকল আবার রানা। বডিবিল্ডার গার্ড এবার স্যালুট করল ওকে। প্রথমে বার-এ ঢুকল রানা। বেশিরভাগ টেবিল বিদেশিরা দখল করে রেখেছে, তাদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গই বেশি, তবে উপমহাদেশের কিছু লোকও আছে, আর আছে সিঙ্গাপুরি চিনারা। তবে, বারম্যান, ওয়েটার, মিউজিশিয়ান, সিগারেট-গার্ল প্রায় সবাই থাই। হবারই কথা, কারণ এটা থাই থান্ডারের লিডার চক্রি চুয়ানের ব্যবসা।

বার-এর একটা টুলে বসে বিয়ার চাইল রানা। এই সময় মঞ্চের উপর জ্যান্ত হয়ে উঠল ব্যান্ডপার্টি। ড্রামের সঙ্গে বাজাচ্ছে একজন আর্কোডিয়ানিস্ট, দু-জন গিটারিস্ট, একজন পিয়ানিস্ট আর চারজন ভায়োলিনিস্ট। সেই সঙ্গে গেস্টরা কেউ কেউ জোড়া বেঁধে মঞ্চে উঠে নাচতে শুরু করল।

মগটা খালি করে বারে ঠুকল রানা। অন্যদিকে ব্যস্ত বারম্যান, তার বদলে একজন বারমেইড এগিয়ে এল। চেহারা দেখে মেয়েটিকে শ্রীলঙ্কান বলে মনে হলো ওর। লম্বা-চওড়া কাঠামো, কালো স্কার্ট ও লাল ব্লাউজ পরে আছে, স্কার্টের সামনে অ্যাপ্রন ঝুলছে। মেয়েটার হাত দুটো মোটাসোটা, পেশল। কানে একটা পেন্সিল গোঁজা, ব্যবহার না করায় চোখা হয়ে আছে। রানার গ্লাসটা নিয়ে শুঁকল সে, বলল, 'হেনিকেন।'

'পিপে না বোতল বা ক্যান থেকে?' মেয়েটি স্পেশালিস্ট কিনা পরীক্ষা করছে রানা, হাসছে।

'পিপে,' বলল মেয়েটি, প্রশ্ন করায় বিরক্ত হয়েছে। 'এখনই আসছি।' খুঁটিয়ে দেখল রানাকে, তারপর আরেক কাস্টমারের গ্লাস তুলে নিয়ে শুঁকল, সবশেষে নোটবুকে অর্ডার লিখে পিছন ফিরল ওদের দিকে।

পকেট থেকে পঞ্চাশ সিঙ্গাপুরি ডলারের একটা নোট বের করল রানা, ভাঁজ করে রেখে দিল তালুতে। বাকি সবাইকে বিয়ার দিয়ে রানার কাছে ফিরে এল মেয়েটি। গ্লাসটা ওর সামনে রাখল সে, অর্ধেকটাই ফেনায় ভর্তি হয়ে আছে। 'আর কিছু?' জানতে চাইল।

ভাঁজ করা নোটটা তার অ্যাপ্রনের পকেটে ঢুকিয়ে দিল রানা। চেহারা দেখে বুঝতে পারল, মেয়েটি রাগ করছে না। তারমানে লেনদেনের এই ভাষাটা বোঝে সে। 'আমি বাংলাদেশ থেকে আসছি,' বলল ও। 'আমার কাছে একটা জিনিস আছে, এক ভদ্রলোককে দিতে চাই।'

'কী জিনিস?' ভ্রূ কোঁচকাল মেয়েটি।

'একটা প্ল্যাটিনাম ব্রেসলেট,' বলল রানা। 'ওটা আমি একটা বাড়ি থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি। তাতে এক ভদ্রলোকের নাম লেখা আছে।'

'কী নাম?'

'চক্রি চুয়ান।'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়ে রানার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল মেয়েটি। তারপর অ্যাপ্রনের পকেটে হাত ভরে নোটটা বের করে ভাঁজ খুলল। উল্টেপাল্টে দেখল সেটা, সবশেষে রানার সামনে কাউন্টারে রেখে দিল। 'আর কী?'

'আর কিছু না।'

ওর সামনে থেকে সরে গেল মেয়েটি। টাকাটা পকেটে ভরল রানা, বিয়ারের গ্লাস তুলে চুমুক দিল। লক্ষ করল, ওর দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে মেয়েটি।

একটু পর কাছে ডেকে খালি গ্লাসটা তার হাতে ধরিয়ে দিল রানা।

সেটা নিয়ে হাসল মেয়েটি। 'চক্রি চুয়ান? ঠিক জানেন এই নামেরই কাউকে খুঁজছেন আপনি?'

'জানি।'

'এই ব্যবসাটার মালিক তিনি,' গলা আরও খাদে নামিয়ে বলল মেয়েটি, তারপর রানার সামনে হাত পাতল।

নোটটা আবার বের করে তার তালুতে রাখল রানা। 'কোথায় পাব তাঁকে?'

'পাবেন না,' বলল মেয়েটি। 'অন্য কোথাও ব্যস্ত তিনি। কোথায় আমি জানি না।' খালি গ্লাসটা দু'হাতে ধরে চাপ দিল সে, ফলে তার হাতের পেশিতে ঢেউ উঠল।

'আমার ধারণা, ব্রেসলেটটা ফিরে পেলে দারুণ খুশি হবেন ভদ্রলোক,' বলল রানা। 'তুমি যদি শুধু তাঁর ঠিকানাটা দিতে আমাকে...'

'দুঃখিত, আমি শুধু নিজের ঠিকানা দিতে পারি,' বলে রানার দিকে পিছন ফিরে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মেয়েটি।

কাউন্টারে আরও কিছু টাকা রেখে টুল ছাড়ল রানা, বাথরুমে যাবে। হঠাৎ একটা হইচই শুনে ঘাড় ফেরাল ও। বার-এর ঠিক ঢোকার মুখে সুট পরা কয়েকজন থাই খদ্দের কাকে যেন ঘিরে ধরে মারধর করছে। বেশ খানিকটা দূরে রয়েছে ও, তাই দেখতে পাচ্ছে না কে মার খাচ্ছে।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সেদিকে এগোল রানা। যারা মারছে, সম্ভবত থাই ট্যুরিস্ট, সবাই ডোরাকাটা কাপড়ের সুট পরে আছে। তারমানে, ভাবল রানা, এরা একটা গ্রুপ।

দ্রুত পা চালিয়ে আরও কাছে চলে এল রানা। লোকগুলো কোনও শব্দ করছে না, অন্য কোনও দিকে তাদের এতটুকু খেয়াল নেই, প্রত্যেকে শুধু আশ্চর্য নিষ্ঠার সঙ্গে একজন লোককে মারছে। লাথি, কিল, ঘুসি, ফ্লাইং কিক, কারাতের কোপ, যার যেভাবে খুশি মেরেই চলেছে।

বারে আরও অনেক লোকজন রয়েছে, সবাই নির্বিকার দর্শক। এমনকী প্রতিটি স্টাফ নিজের কাজে ব্যস্ত থাকছে, এখানে যেন কিছু ঘটছে না।

দুর্ভাগা লোকটা মেঝেতে পড়ে গেল। আর তখনই তার পরনের হালকা সবুজ রঙের সুট ও বাদামী রঙের টাই দেখতে পেল রানা। আরে, এ তো সেই পকেটমারটা! নিশ্চয়ই ওদের কারও পকেটে হাত ভরে ধরা পড়ে গেছে। নিজেকে সাবধান করে দিল রানা, ডোরাকাটা কাপড়ের সুট পরা থাইগুলো থাই থান্ডারের প্রিয়ভাজনও হতে পারে, কিংবা তারা হয়তো দলেরই লোক।

কিন্তু তাই বলে মেরে ফেলবে?

'স্টপ ইট, জেন্টেলমেন, প্লিজ!' কঠিন সুরে, রীতিমত ধমকের সঙ্গে বলল রানা।

গ্রাহ্য করল না তারা, এমনকী কেউ ওর দিকে তাকাল না পর্যন্ত। পরিষ্কার বুঝল রানা, এই মুহূর্তে কারও কোনও হুঁশ-জ্ঞান নেই, খুনের নেশায় পেয়েছে তাদেরকে। গণপিটুনি দিতে আসা লোকেরা মন-মানসিকতার দিক থেকে পেশাদার খুনির চেয়ে কম নীচ বা কম নিষ্ঠুর নয়। এদেরকে রানা বাস্টার্ড বলে গালি দিয়ে মনের ঝাল মেটায়।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

রানার মাথায় এই মুহূর্তে শুধু একটা চিন্তাই খেলছে। যেভাবে হোক বোকা ও আনাড়ী লোকটাকে বাঁচাতে হবে। লঘু পাপে এরকম গুরু দণ্ড পাবে কেউ, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে ও, তা স্রেফ সম্ভব নয়। অন্তত ওর প্রাণ থাকতে নয়।

মাসুদ রানা কী কারণে মাসুদ রানা, আরেকবার সম্ভবত তারই একটা উদাহরণ সৃষ্টি হতে চলেছে। পাঁচ-সাতজন শক্ত-সমর্থ তরুণের সঙ্গে একা লাগতে যাচ্ছে ও, এ-কথা জানার পরেও যে, এই প্রতিষ্ঠান শত্রুপক্ষের একটা আস্তানা।

হাত বাড়িয়ে প্রথমে যাকে সামনে পেল ধরল দু'হাতে, তারপর আসুরিক শক্তিতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছুঁড়ে দিল দূরে। রানার শরীরে যেন বিদ্যুৎ আছে, ওর ক্ষিপ্রতা চোখ দিয়ে অনুসরণ করা যাচ্ছে না। দুই সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে ডোরাকাটা সুটের তিন মালিক দশ-বারো হাত দূরে ছিটকে পড়ল, টেবিল-চেয়ারের পায়ার সঙ্গে মাথা কিংবা কপাল ঠুকে যাওয়ায় ব্যথায় কাতরাচ্ছে।

এক পলকে বদলে গেল বার-এর পরিস্থিতি। স্টাফ, খদ্দের সবাই চোখে-মুখে আতংক নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

মারমুখো বাকি চার থাই স্থির হয়ে গেছে। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে ওরা। তারপর যেন দম দেওয়া পুতুলের মত, পকেটমারকে পিছনে রেখে চারজন একযোগে এগিয়ে এল রানার দিকে।

ভোজবাজির মত পিস্তল বেরিয়ে এল রানার ডান হাতে, বাম হাতে আইডি কার্ডের মত কিছু একটা। 'ওখানেই থামো,' নির্দেশের সুরে বলল ও। 'পুলিশ!' ওর জানা আছে, সিঙ্গাপুর পুলিশে উপমহাদেশের বহু লোক চাকরি করে। কার্ডটা পকেটে ভরে রাখতে রাখতে পকেটমারের দিকে এগোল ও, যেন থাইদের তৈরি পাঁচিলটা সম্পর্কে সচেতন নয়।

একেবারে শেষ মুহূর্তে ফাঁক হয়ে গেল পাঁচিল। কারও দিকে না তাকিয়ে রক্তাক্ত লোকটার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। সবুজ কাপড়ে মোড়া হাড় ও মাংসের ছোট একটা স্তূপ বলে মনে হলো মানুষটাকে। এত মার খেয়েও জ্ঞান হারায়নি সে, আহত বিড়ালছানার মত হাঁ করে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

তারপর রানাকে হকচকিয়ে দিয়ে লোকটা বলল, 'আপনি মহৎ ব্যক্তি, সার!' বলেই ঢলে পড়ল সে।

মারা গেল? তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। পালস আছে দেখে সিধে হলো আবার, ঘুরে পে বুদের দিকে এগোচ্ছে। খেয়াল করল, ডোরাকাটার গ্রুপের একজনও বার-এ নেই। পুলিশকে কে না ভয় পায়।

দশ মিনিটের মধ্যে অ্যামবুলেন্স এসে নিয়ে গেল অজ্ঞান পকেটমারকে। একজন মেইল নার্সকে নিজের হোটেলের ঠিকানা দিল রানা, প্রয়োজনে যেন ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে।

এতক্ষণে বাথরুমে ঢোকার সুযোগ পেল ও।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে রানা দেখল বার-এর সবাই যে-যার কাজে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কী কারণে কে জানে ভুলেও কেউ ওর দিকে তাকাচ্ছে না। বার থেকে বেরিয়ে এল ও, চওড়া করিডর হয়ে ঢুকল আলো-ঝলমলে ক্যাসিনোয়।

একটা টেবিলে বসে রুলেত খেলার ছলে চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল রানা। ডোরাকাটাদের কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কেউ বিশেষভাবে লক্ষও করছে না ওকে। অল্প কিছু সিঙ্গাপুরী ডলার হেরে বিশ মিনিট পর উঠে পড়ল রানা। অলস পায়ে হাঁটতে হাঁটতে এক ফাঁকে ভিতর দিকের একটা করিডরে চলে এল ও। খানিকদূর হাঁটার পর দুপাশে কয়েকটা দরজা দেখতে পেল। দরজার মাথায় লেখা রয়েছে – অফিস। এগোচ্ছে রানা, সামনে একটা বাঁক পড়ল।

ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরে বাঁকটা ঘুরল রানা, করিডর ধরে সাবধানে এগোচ্ছে। একটা তেমাথা দেখা যাচ্ছে, তবে নাক

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

বরাবর সামনে একটা দরজা রয়েছে। এই দরজার গায়ে লেখা রয়েছে – অফিস অভ দ্য চিফ।

দরজার সামনে পৌঁছাবার আগেই রানার হাতে ছোট একটা আইভরি কেস বেরিয়ে এসেছে। কেসটা থেকে বেরুল সরু টুথপিকের মত দেখতে ইস্পাতের একটা কাঠি। কী হোলে সেটা ঢোকাতে যাচ্ছে ও।

এই সময় পিছন থেকে ভারী পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। যেই আসুক, বাঁকের কাছে পৌঁছে গেছে সে, এখনই দেখে ফেলবে রানাকে।

দরজার সামনে থেকে দ্রুত ডান দিকে সরে গেল রানা, তারপর করিডরটা আড়াআড়িভাবে পার হলো, তেমাথার কোণে গা ঢাকা দিয়ে আছে। ওর কাছ থেকে হাত তিনেক দূরে জ্যানিটার-এর ক্লজিট, চৌকাঠে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে লাঠির মাথায় ভেজা স্পঞ্জ । দেয়ালে গা সেঁটে কান পেতে থাকল রানা।

লোকটার হেঁটে আসবার আওয়াজের মধ্যে দৃঢ় একটা ভাব আছে, যেন কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে আসছে সে। দু'পা এগিয়ে ক্লজিটের ভিতর ঢুকে পড়ল রানা, সামান্য খোলা রাখল দরজাটা।

দ্রুত হাতে সুট-জ্যাকেট খুলে ফেলছে রানা, তাকিয়ে আছে হুকে ঝুলিয়ে রাখা ঘামের দাগসহ জেনিটারের কভারঅল-এর দিকে। ঝটপট পরে নিল ওটা।

শক্তি প্রয়োগের চেয়ে ধোঁকা দিয়ে কাজ হাসিল করা অনেক সময় সহজ। ধরা পড়বার কোনও ইচ্ছে নেই রানার, চায় না কারও চোখে পড়ে যাক।

কভারঅলের চেইনটা বুক পর্যন্ত টেনে আনল রানা, তারপর হাত বাড়িয়ে করিডর থেকে টেনে নিল লাঠিটা। মরচে ধরা ধাতব বালতিতে ঢুকিয়ে স্পঞ্জটা সশব্দে নাড়তে শুরু করল।

পায়ের আওয়াজ থেমে গেল ক্লজিটের বাইরে। 'কে ওখানে? শামসু নাকি?' কর্তৃত্বের সুরে থাই ভাষায় প্রশ্ন করল কেউ।

'না, সার,' থাই ভাষাতেই, ভারী গলায় জবাব দিল রানা। মুখটা ঢাকার জন্য হাত দিয়ে মাথার চুলগুলো কপালে নামিয়ে আনল ও। একটু কুঁজো হলো, যাতে বেশি লম্বা না দেখায়।

এরপর পা দিয়ে দরজার ঠিক বাইরে বালতিটা ঠেলে দিল রানা। তারপর কুঁজো পিঠ ও বাঁকা পা নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল ও।

'আমাকে শামসু পাঠিয়েছে,' বলল রানা, বালতিটা পা দিয়ে ঠেলছে।

'আওয়াজটা থামাও,' ধমক দিল লোকটা। 'তোমার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না।'

থামল রানা, চুলের তৈরি পরদার ভিতর দিয়ে লোকটার দিকে তাকাল। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি হবে, বেঢপ নাক, গায়ের রঙ শ্যামলা। 'শামসু পাঠিয়েছে আমাকে,' আবার বলল ও, তারপর স্পঞ্জটা রোলার-এর মাঝখানে ফেলে হাতল ঘোরাল পানি বের করবার জন্য। 'আপনাকে কিছু বলেনি?'

'কখন বলল!' লোকটার গলায় ঝাঁঝ, চোখ দুটো কুঁচকে আছে। ক্রূর একটু হাসি ফুটল তার ঠোঁটের কোণে। 'তবে হাড়ে হাড়ে টের পাবে এই অনিয়ম করার কী ফল!'

'আপনি চান না মেঝেগুলো পরিষ্কার করা হোক?' ক্লজিটে ঢুকে এক বোতল অ্যামোনিয়া বের করল রানা, আচরণে এতটুকু নার্ভাস ভাব নেই। শরীরের পাশে ঝুলে থাকা হাত দুটো মুঠো পাকাল লোকটা। বালতির পানিতে অ্যামোনিয়া ঢালছে রানা। খেপে থাকা লোকটা ঘোঁৎ করে আওয়াজ করল, তারপর ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরতি পথ ধরল।

কাজ থামিয়ে কান পেতে থাকল রানা, বাঁক ঘুরে দূরে মিলিয়ে গেল লোকটার পায়ের আওয়াজ। ক্লজিটে ঢুকে নিজের কাপড়চোপড় পরে নিল ও, হাতে ইস্পাতের টুথপিক নিয়ে আবার ফিরে এল অফিস রুমের দরজায়।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

যেমন ধারণা করেছিল রানা, দরজায় তালা দেওয়া। করিডরটা আরেকবার দেখে নিল। এখনও খালি। কী হোলে টুথপিক ঢোকাল ও, বিসিআই-এর টেকনিকাল ডিপার্টমেন্টের আবিষ্কার ওটা। ভিতরে ঢুকে ওটার সঙ্গে থাকা কমপিউটারাইজড ইলেকট্রনিক ডিভাইস নতুন করে সাজাল তালার যন্ত্রপাতিগুলো। ক্লিক করে আওয়াজের সঙ্গে খুলে গেল তালা। কেউ বুঝতে পারবে না এই তালায় হাত দেওয়া হয়েছে।

অন্ধকার অফিসে ঢুকল রানা। কবাট বন্ধ করে ভিতর থেকে তালা লাগিয়ে দিল দরজায়। টুথপিকটা আইভরি হোল্ডারে ভরল, ঢাকনি বন্ধ করল, তারপর শেষমাথায় চাপ দিল মৃদু। সরু, তবে অত্যন্ত উজ্জ্বল আলো বেরুল ওটা থেকে।

কামরার চারদিকে আলো ফেলল রানা। এক প্রান্তে দেয়াল ঘেঁষে ফেলা ডেস্কটা বেশ বড়, ওটার পিছনে একটা রিভলভিং চেয়ার; আরেক প্রান্তে কফি টেবিল, সোফা ও তিনটে দেরাজসহ ফাইল কেবিনেট। মেঝের উপর দিয়ে ফাইল কেবিনেটের দিকে এগোল ও।

রানা বুঝতে পারছে এটা সাধারণ একটা অফিস, কোথাও এমন কিছু নেই যেটা দেখে বোঝা যাবে নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তি ব্যবহার করে। একটাই বৈশিষ্ট্য, ফাইল কেবিনেটের বাম পাশের দেয়ালে বাঁধাই করা আট-দশটা ফটো ঝুলছে। প্রতিটি ফটোর গায়ে সাল লিখে রাখা হয়েছে – ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫ ও ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ। প্রতি বছরের জন্য দুটো করে ফটো।

ফটোগুলোয় পোজ দিয়েছে ক্যাসিনোর সমস্ত স্টাফ। রেস্তোরাঁ ও বার-এর কর্মীরাও আছে। ছয় ও সাত নম্বর ফ্রেমে দুটো গ্রুপ ফটো দেখল রানা, ওগুলোয় স্টাফ ছাড়াও মালিকপক্ষের লোকজনকে দেখা যাচ্ছে। তাদের একজনকে চিনতে পারল রানা। স্ত্রী-সন্তানসহ বুকরিত প্রেমজ, থাই থান্ডারের লিডার।

আসলে সাবেক লিডার। পরের ছবি দুটোয় স্টাফের সঙ্গে পোজ দিয়েছে চক্রি চুয়ান।

যাক, ঠিক জায়গাতেই এসেছে রানা। ফটোগুলোর সামনে থেকে সরে ফাইল কেবিনেটের কাছে চলে এল ও, নব ধরে টান দিয়ে উপরের দেরাজ খুলছে। তালা দেওয়া থাকায় খুলল না। আবার টুথপিকটা বের করতে হলো ওকে।

দেরাজ খোলার পর ভিতরে খাড়াভাবে সাজানো একগাদা ফাইল দেখল রানা। একটা ফাইলে খরচের হিসাব লিখে রাখা হয়েছে – স্টাফের বেতন, ফার্নিচারের দাম, দৈনন্দিন কেনাকাটা, ফোনের বিল, ডিশ লাইন ও টেলিফোনের বিল ইত্যাদি। আরেকটায় রয়েছে ক্লিপ দিয়ে আটকানো অসংখ্য বিদ্যুৎ বিল ও বাড়ি ভাড়ার রসিদ।

মাত্র একবছর আগে বুকিত বাটক রোডে, নিউ টাউনের কাছে একটা বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। বাড়িটার মাসিক ভাড়া বাংলাদেশী টাকায় প্রায় দুই লাখ, অথচ টেলিফোনের বিলে দেখা যাচ্ছে ওখান থেকে কেউ কোনও ফোন করেনি। এর সঙ্গে মিল রেখে বিদ্যুৎ বিলও এসেছে নাম মাত্র। যে বাড়ির ভাড়া দু'লাখ টাকা, সেখানে ফোন ও বিদ্যুৎ ব্যবহার না করবার কী কারণ থাকতে পারে?

এমন কি হতে পারে ওটা থাই থান্ডারের একটা সেফ হাউস, শুধু কেয়ারটেকার একা থাকে? রানা ভাবল, এটা হয়তো বড় কোনও সূত্র নয়, তবে একবার ঢু মেরে দেখা যেতে পারে। বাড়ির ঠিকানাটা মুখস্থ করে নিল ও।

উপরের দেরাজে আরও প্রচুর কাগজ-পত্র আছে, সবই দায়-দেনা পরিশোধ সংক্রান্ত, রানার আগ্রহ বোধ করবার মত কিছু নয়। বাকি দুটো দেরাজে শুধুই সয়-সম্পত্তির দলিল – সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে বেশ কয়েকটা নাইট ক্লাব, ক্যাসিনো আর ম্যাসাজ পারলার কিনেছে চক্রি চুয়ান, তবে একটাও তার নিজের নামে নয়। একটা নাইট ক্লাব ও ক্যাসিনো কেনা হয়েছে চিত্রলেখা

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

মাহিদলের নামে।

শেষ দেরাজটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল রানা। অফিসের মেঝে পার হচ্ছে, ফার্নিচারের উপর টর্চের আলো ফেলে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে কিছু এলোমেলো করে রেখে যাচ্ছে কি না।

রানাকে সতর্ক করল দরজার কবজা থেকে আসা ক্ষীণ আওয়াজ। করিডরের এক চিলতে আলোও কামরার ভিতর ঢুকে পড়ছে।

ঝট করে খুলে গেল কবাট, একই সঙ্গে রানার হাতেও বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। ডাইভ দিয়ে ডেস্কের পিছনে পড়ল ও।

অফিসের ভিতর ছোট্ট কী যেন একটা ফাটল, ভোঁতা শোনাল রানার কানে। লাফ দিয়ে সিধে হলো ও। ওর সঙ্গে গ্যাস মাস্ক নেই। বড় করে শ্বাস টেনে যতটা পারা যায় বাতাস ভরল ফুসফুসে, তারপর কমলা ও ধূসর ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে ছুটল দরজার দিকে, ভাবছে ওর উপস্থিতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে কে জানিয়েছে – বারমেইড, নাকি বদমেজাজি সুপারভাইজার?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শরীরের চামড়ায় বাষ্প অনুভব করল রানা। বিপদে পড়ে গেছে ও। এ এমন এক ধরনের গ্যাস, ফুসফুসে গ্রহণ করবার দরকার নেই।

দরজা দিয়ে রানা নয়, যেন একটা উন্মত্ত তুফান বেরিয়ে গেল, হাতে বাগিয়ে ধরা পিস্তল ।

লোহার মত শক্ত হাত জড়িয়ে ধরল ওকে। ধস্তাধস্তি করছে রানা, লড়ছে, গুলি ছুঁড়ছে, চেষ্টা করছে যদি পালাতে পারে।

দেরি হয়ে গেছে। ওর ত্বক শুষে নিয়েছে গ্যাস। বাড়ানো হাতের ভিতর জ্ঞান হারাল রানা।

তেরো

রানার ডান দিকটা তন্দুরের তীব্রতা নিয়ে জ্বলছে। বাম দিকে বরফ হয়ে আছে শরীর।

স্বপ্নের ভিতর একটা দৈত্যকে ফাঁকি দিচ্ছে রানা। ওটার জয়েন্ট ঘষা খাওয়ার মুড়মুড় আওয়াজ ও দূষিত নিঃশ্বাসের ঝড়ো সোঁ-সোঁ শব্দ শুনতে পাচ্ছে, এই বুঝি ধরে ফেলল। যতবার ওটার নাগাল থেকে সরে আসতে পারছে, পরিশ্রমে দপদপ করছে মাথাটা।

'শালার ব্যাটার সাহস কত!' থাই ভাষায় বলল একজন। 'আমাদের আস্তানায় ঢুকে আমাদের গায়ে হাত তোলে!'

রানা ভাবল, তারমানে? এরা ডোরাকাটা?

লোকটার কণ্ঠস্বরে হিংস্রতা থাকলেও, তার কয়েকজন সঙ্গী হেসে উঠল।

'ব্যাটার জ্ঞান ফিরছে!' আবার বলল লোকটা। 'দেখা যাক কুত্তার লেজ আমরা সোজা করতে পারি কি না।' অর্থাৎ এখন রানার মুখ খোলাবার চেষ্টা করা হবে।

চোখ মেলল রানা। মাথাটা ব্যথায় ছিঁড়ে যাবে বলে মনে হলেও, ধীরে ধীরে চোখ ঘোরাল ও। রশি দিয়ে হাত-পা বেঁধে একটা টেবিলের উপর শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে, টেবিলটা দেয়ালের গায়ে কাত করে রাখা।

দেয়ালে দু'তিনটে মশাল জ্বলছে।

রানার মনে হলো, প্রাচীন কোনও পাথুরে পোড়োবাড়ির বেযমেন্টে রয়েছে ও। পাথরের তৈরি দেয়াল কোথাও কোথাও ভেঙে পড়েছে। দেয়ালের ফাঁকগুলো থেকে ভেসে আসছে রাতের

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

জঙ্গলের চেনা গন্ধ – ঢাকার রমনা পার্কে সন্ধের পর গাছের গা থেকে এই গন্ধ বের হয়। মাথার উপর বেযমেন্ট ও একতলার ভাঙা ছাদের কিনারা দেখা যাচ্ছে, তার উপর আকাশ যেন কালো চাদর, চাদরের গায়ে বসেছে তারার মেলা। ওকে কি কোনও জঙ্গলে নিয়ে আসা হয়েছে?

'মাথায় খুব ব্যথা?' সেই লোকটাই কর্কশ সুরে জানতে চাইল। একহারা কাঠামো তার, চোখে চশমা, চেহারায় আঁতেল-আঁতেল ভাব। হ্যাঁ, গায়ে ডোরাকাটা কাপড়ের সুট।

রানার ডান দিকে একটা চুলো জ্বলছে, ফলে ওর ওদিকটা সেদ্ধ হচ্ছে গরমে। ভাঙা দেয়াল দিয়ে হিম বাতাস এসে লাগছে শরীরের অপর পাশে।

আরেক লোককেও, এখনও অজ্ঞান, অন্য একটা টেবিলের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। সেটা চুলোর ওপারের দেয়ালে কাত করা। তার গোটা চেহারা থেঁতলানো হয়েছে, শুকিয়ে যাওয়া রক্ত লেগে রয়েছে ঠোঁট, চোখ, নাকের ফুটো ও কপালে। লোকটাকে থাই বলে মনে হলো রানার।

'গ্যাস থেকে মাথাব্যথা? উহ্, সে বড় কষ্ট!' বলল ধানাই ঠাকুর, রানার ভোগান্তি উপভোগ করছে সে। সবজান্তার মত মাথা দুলিয়ে হাসছে, পিস্তল ধরা হাতটা এমনভাবে শরীরের পাশে ঝুলিয়ে রেখেছে রানা যাতে দেখতে পায়। ওটা রানারই ওয়ালথার।

'হঠাৎ করে ব্যথাটা কমে গেল,' বলল রানা, লোকটার ছোট চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে হাসল মৃদু। হাসিটা ওর নার্ভাস সিস্টেমে আকস্মিক ব্যথার জন্ম দিলেও, নিজের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারল ও, চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপতে দেয়নি।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'চক্রি চুয়ানের স্যাঙাৎ, ঢাকার অপারেশনে ছিলে?'

ধানাই ঠাকুরের মুখের হাসি দপ করে নিভে গেল। বোকা বোকা লাগছে তাকে। 'এত কথা তুমি শালা জানো কীভাবে?' কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করল। 'এই ব্রেসলেটই বা কোথায় পেলে?'

'তারমানে বারমেইডের সঙ্গে কথা হয়েছে তোমার,' বলল রানা। 'ওটা আমি ঢাকার একটা বাড়ির ড্রাইভওয়ে থেকে পেয়েছি। বারমেইড বলেনি, চক্রি চুয়ানকে খুঁজছি আমি?'

ধানাই ঠাকুরের নেতৃত্বে বেযমেন্টে আরও তিনজন থাই রয়েছে। প্রত্যেকের পরনে জিনস ও জ্যাকেট। চোখে-মুখে হিংস্র ভাব নিয়ে হেলান দিয়ে আছে দেয়ালে, হাতে সাব-মেশিনগান।

'কেন খুঁজছ?' জানতে চাইল ধানাই ঠাকুর, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছে রানাকে।

'ব্রেসলেটটা ফিরিয়ে দিয়ে মোটা পুরস্কার আদায় করব,' জানাল রানা। লোকগুলোর চোখ ফাঁকি দিয়ে রশিগুলো পরীক্ষা করছে ও। খুব শক্ত করে বাঁধা হয়েছে ওকে, হাত-পা মুচড়েও এক চুল শিথিল করা যাচ্ছে না, গিঁটগুলো সব টেবিল-সারফেসের পিছনদিকে। হয় অস্ত্র লাগবে, নয়তো কারও সাহায্য, তা না হলে এখান থেকে পালানো সম্ভব নয়।

'কোথায় রেখেছ সেটা?' জিজ্ঞেস করল ধানাই ঠাকুর।

'হোটেলের স্যুইটে।'

'কোন্ হোটেলে?'

'তুমি গর্দভ নাকি?' হেসে উঠল রানা। 'ভেবেছ ব্রেসলেটটা তোমার হাতে তুলে দেব আমি? চক্রি চুয়ানকে খবর দাও। লেনদেন যা হবার তার সঙ্গে হবে।'

ঝট্ করে পিস্তল ধরা হাতটা তুলল ধানাই ঠাকুর। রানার গলার পাশে মাজল চেপে ধরল সে। 'কর্ণ থানম বলছে যেন আমি এক্ষুনি তোমাকে খুন করে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলি।'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

নির্ভয়ে হাসল রানা। 'চক্রি চুয়ান, তোমাদের বস্, খুশি হবে না।'

'থানমের ধারণা, তুমি বিসিআই এজেন্ট, গন্ধ শুঁকে এখানে পৌঁছেছ।'

'এ-কথা বলছে না যে, বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে নিয়ে যেতে এসেছি?' প্রশ্ন করল রানা।

ধানাই ঠাকুর অবাক হলেও, চেহারায় ভাবটা ফুটতে দিল না। রানার গলা থেকে পিস্তলটা নামাল সে, ওটার ওজন অনুভব করল, তারপর অকস্মাৎ খালি হাত মুঠো পাকিয়ে রানার চোয়ালে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল।

টেবিলের সারফেসের সঙ্গে ঠুকে গেল রানার মাথা। কান দুটো ভোঁ-ভোঁ করছে। মাথার ব্যথাটা যেন বিস্ফোরিত হয়ে কয়েক গুণ বেড়ে গেল।

'এরকম আদর করলে হবে না,' বলল থানম। 'ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, ওস্তাদ, তারপর দেখো কেমন বাপ-বাপ চেঁচায়! মুখ খুলবে না, ওর বাপ খুলবে...'

'শুনলে, কী বলছে থানম?' জিজ্ঞেস করল ধানাই ঠাকুর। 'তবে আমার কথা হলো, তুমি যদি সত্যি কথা বলে নিজের প্রাণ বাঁচাতে চাও, তোমাকে একটা সুযোগ দেয়া উচিত আমাদের। আফটারঅল, ধর্মে আছে জীবহত্যা মহাপাপ। শুরু করি, ঠিক আছে? তোমার নাম?'

'উহ্, আহ্ ... উহ্, আহ্...' জ্ঞান ফিরে পেয়ে দ্বিতীয় বন্দি গোঙাচ্ছে। 'পা-পানি... পা-পানি...'

ইমিডিয়েট বস্ ধানাই ঠাকুরের ইশারায় এগিয়ে এল থানম, তারপর দুজন একসঙ্গে দ্বিতীয় বন্দির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসছে লোকটার। মোটাসোটা কাঠামো তার, নরম শরীর, কালো বিজনেস সুট ও সাদা টাই পরে আছে। শরীরে পেঁচানো রশিগুলো তার ট্রাউজারটাকে তুলে ফেলেছে বেশ খানিকটা, ফলে জুতোর বাইরে বেরিয়ে থাকা পুরু কালো মোজা দেখা যাচ্ছে।

'টাকা নেই, পানিও নেই,' তার উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল ধানাই ঠাকুর। 'শালা থাই থান্ডারের নাম ডোবালি! বস্ বলেছে, তোর চোদ্দগুষ্টিকে বরবাদ করে দেব আমরা।'

মোটা লোকটা চোখ খুলল, বেযমেন্ট দেয়ালের ফাঁকগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কোথায় রয়েছে সে। 'ভগবানের কিরে, এর মধ্যে আমার কোনও কারসাজি নেই। আমার চোখের সামনে জিকো তানাই নিজের হাতে ডলারের বান্ডিলগুলো সুটকেসে ভরেছে, কী করে জানব ওগুলো সব জাল টাকা!' আবার গোঙাল সে। 'পা-নি...'

ও, আচ্ছা! রানা ভাবছে। বন্দি লোকটা তা হলে প্রেম তিলসুলানন্দ! থাই টং-এর আস্তানা থেকে তারই তো পাঁচ মিলিয়ন ডলার নিয়ে আসার কথা।

চামড়ার বড় একটা পুরানো সুটকেসে লাথি মারল ধানাই ঠাকুর। সুটকেসের খোলা মুখ থেকে চুলোর আগুনে ছিটকে পড়ল মার্কিন ডলারের কয়েকটা বান্ডিল। বাতাসে ছাই উড়ল, শুকনো কাগজ পেয়ে দপ করে মাথা তুলল শিখাগুলো।

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে নন্দর দিকে তাকাল ধানাই। দুজনের নাক মাত্র কয়েক ইঞ্চির দূরে। চুলো ও মশালের অস্থির আলো তাদের চেহারায় খেলা করছে – একজন আতংকিত, অপরজন হিংস্র।

'শালা বেজন্মা!' হিসহিস করে উঠল ধানাই। 'তুই দলের সঙ্গে বেঈমানী করেছিস। লোভ সামলাতে না পেরে সরিয়ে ফেলেছিস পাঁচ মিলিয়ন ডলার।'

ম্লান, কাতর স্বরে বলল নন্দ, 'সরাবার ইচ্ছে থাকলে আগে কেন সরাইনি? সাত বছর ধরে আনা-নেওয়ার কাজ করছি, কখনও কোনও ঘাপলা হয়েছে? তা ছাড়া, ভেবে দেখো, এরকম

www.MurchOna.com

বোকামি কেউ করে? এত টাকা মেরে দিয়ে কেউ বাঁচতে পারে? এটা আমার কাজ হলে আমি পালাতাম না?'

'এখানেই তো চালাকিটা করেছিস,' বলল ধানাই। 'সাধু সাজার জন্যে সুটকেসে জাল ডলার ভরে নিয়ে এসেছিস, ভান করছিস সুটকেসে জাল টাকা কি আসল টাকা জানিস না!' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সে। 'এখনও সময় আছে, নন্দ। ডলারগুলো কোথায় রেখেছিস বল, বস্‌কে বুঝিয়ে মাফ চাওয়ার ব্যবস্থা করে দিই...'

জবাবে নন্দ মাথা নাড়তে যাচ্ছে দেখে তার ভাঙা নাকে ধাম করে ঘুসি মারল ধানাই। ব্যথায় ককিয়ে উঠল নন্দ, চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে। তার চেহারায় করুণ মিনতি ফুটে আছে, লক্ষ করল রানা। সেই সঙ্গে অপমানিতও বোধ করছে।

আরেকটা ঘুসি খেয়ে বাতাসের অভাবে খাবি খেতে শুরু করল নন্দ।

'থানম!' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল ধানাই, শুনে শিউরে উঠল নন্দ।

ইমিডিয়েট বস্‌কে দেখল থানম, তারপর তার দুই সঙ্গীর দিকে ফিরে নিঃশব্দ হাসির সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল। লোক দুজন নন্দের দিকে এগিয়ে গেল।

'না!' আতংকে চেঁচিয়ে উঠল নন্দ, এমন সিটকে গেল, যেন টেবিলের তক্তার ভিতর সেঁধিয়ে যেতে চায়।

জানে সম্ভব নয়, তারপরও বাঁধনগুলো ঢিল করবার চেষ্টা করছে রানা। অবিরত কবজি মোচড়াচ্ছে, ছুরিটার নাগাল পাওয়ার ইচ্ছে। থাই থান্ডার কি পেয়ে গেছে ওটা?

থানম একটা দৈত্য। হাতগুলো বিরাট। দুইহাতে নন্দের বুকের খাঁচায় মাঝারি মাপের ঘুসি মারছে অনবরত। তাতেই মোটা লোকটার প্রাণ বেরিয়ে যাবার জোগাড়। ঝাঁকি খাচ্ছে শরীর। তারপর বমি শুরু হয়ে গেল।

হাতে থুতু দিয়ে দু-হাত ঘষল থানম, পেশাদার বক্সারের ভঙ্গিতে পিছিয়ে গেল দুই কদম।

বাকি দুজন দ্রুত সামনে বাড়ল। প্রথম লোকটা নন্দের কিডনিতে ঘুসি চালাল। আবার আর্তনাদ বেরিয়ে এল নন্দের গলা থেকে। দ্বিতীয় লোকটা হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারল তার উরুসন্ধিতে, তারপর ঘাড়ের পাশে কারাতের একটা কোপ মারল যত জোরে পারা যায়।

বোমা ফাটার মত আওয়াজ করে টেবিলের সারফেসে ঠুকে গেল নন্দের খুলি। তার চিবুক নেমে এল বুকে।

'থামো!' বলল ধানাই ঠাকুর।

রানার কনুইয়ের নীচে এখনও স্ট্র্যাপে আটকানো রয়েছে ছুরিটা। কিন্তু রশির বাঁধন এত আঁটসাঁট যে ঝাঁকি দিয়ে সেটাকে হাতে নিয়ে আসা যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে হাতটা আগুপিছু করছে ও, প্রতিবার এক ইঞ্চির পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ।

চিবুক সামনে বাড়ানো, চোখ সরু, নেতিয়ে পড়া নন্দের দিকে এগোল ধানাই ঠাকুর। আহত লোকটার চুল খামচে ধরে মাথাটা উঁচু করল সে। 'আমার দিকে তাকা, নন্দ! টাকাটা তুই যদি না মেরে থাকিস, তার মানে দাঁড়ায় থাই টং আমাদেরকে পেমেন্ট করবে না। তা হলে আমাদের সঙ্গে তারা নেগোশিয়েশন করল কেন? ডক্টর নাদিরাকে তাদের দরকার নেই?'

'আ-আমি জা-নি ন্‌না...' অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গেল নন্দের গলার আওয়াজ।

'শিট্!' তার চুল ছেড়ে দিল ধানাই ঠাকুর। নন্দের মাথা নুয়ে পড়ল। তারপর নিথর হয়ে গেল শরীরটা।

রানার বাঁধনে ঢিল পড়ছে। বেশি নয়, তবে এভাবে চালিয়ে গেলে নিজেকে মুক্ত করবার সুযোগ একটা আসতেও পারে।

অচেতন নন্দের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল ধানাই, তারপর থোক করে খানিকটা থুথু ফেলল তার মুখ লক্ষ্য

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

করে। ঘুরে রানার দিকে তাকাল সে। 'ভেবো না এত সহজে পার পাবে তুমি,' কঠিন সুরে বলল সে।

থাই থান্ডারের তিন বডিবিল্ডার তাদের ইমিডিয়েট বস্ ধানাই ঠাকুরকে নিয়ে এগিয়ে এল। রানা যেন এক টুকরো হাড়, ওকে মাঝখানে রেখে বেওয়ারিশ কুকুরের মত চক্কর দিচ্ছে তারা। জানে সবাই তারা ভাগ পাবে, কাজেই সময়টা উপভোগ করবার সুযোগ হাতছাড়া করছে না।

হুমকিটা গ্রাহ্য না করে হাসল রানা। 'তোমরা, থাই থান্ডার, ব্যাপারটার সঙ্গে জড়ালে কীভাবে?' খুব যেন কৌতূহল হচ্ছে ওর, আসলে ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড় হয়েছে। 'শুনেছি চক্রি চুয়ান নাকি শেয়ালের চেয়েও চালাক, কিন্তু এই তার নমুনা? থাই টং তাকে ল্যাং মেরে দিল?'

কাজ হলো কৌশলে, চক্কর দেওয়া বন্ধ করে ওর কথার জবাব দিচ্ছে থানম। এই সুযোগে চুপিসারে রশির বাঁধনগুলো আরও ঢিল করে আনছে রানা।

কার প্ল্যান, এক এক করে কীভাবে সংগঠনগুলোকে জড়ানো হয়, সংক্ষেপে সব জানাল কর্ণ থানম।

সুযোগ পেয়ে জরুরি একটা প্রসঙ্গে চলে গেল রানা। 'দুরন্ত ঈগলকে তোমরা ঢাকা থেকে আনতে পারনি।' কথাটা সত্যি কি না জানা খুব জরুরি।

'বস্, এ শালা দেখছি আমাদের হাঁড়ির খবর বের করতে চাইছে! আমরা জেরা করব কী, ও ব্যাটাই আমাদেরকে জেরা করতে চায়।'

'তার মানে প্লেনটা তোমরা সত্যি আনতে পারনি,' বলল রানা, আশা করছে প্রতিবাদ করবে থানম।

'সব ব্যবসারই কিছু গুমর থাকে, ভুলেও কখনও তা ফাঁস করতে নেই,' বলল ধানাই ঠাকুর।

'তোমাদেরকে এই ব্যর্থতার খেসারত দিতে হবে না? যাদের হয়ে কাজ করছ ওদের ইন্টেলিজেন্স মানবে?'

হেসে উঠল ধানাই ঠাকুর। 'এর মজাই তো এখানে!' বলল সে। 'কোথাও ব্যর্থ হলে ওরা যদি কাউকে ধরে তো ধরবে তাইওয়ানিজ ইন্টেলিজেন্সকে, ওরা ধরবে তাইওয়ানিজ টংকে, তাইওয়ানিজ টং ধরতে চাইবে থাই টংকে, এভাবে। আমাদের সঙ্গে শুধু থাই টং-এর কারবার, আর কাউকে আমরা চিনি না।'

'কিন্তু থাই টং তোমাদের পাওনা টাকা দিচ্ছে না,' বলল রানা। 'ডক্টর নাদিরা এখন আর তোমাদের কোনও অ্যাসেট নয়, লায়াবিলিটি। এটা তো ঠিক, বেঈমানি করা হয়েছে তোমাদের সঙ্গে, চুক্তি ভঙ্গ করেছে থাই টং। চক্রি চুয়ানকে খবর দাও, আমার সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসুক সে। বনিবনা হলে আমি তোমাদের কাঁধের বোঝা হালকা করে দিতে রাজি আছি।'

'কী রকম?'

'ধরো কর্ণ থানমের ধারণাই ঠিক, আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছি,' বলল রানা। 'ডক্টর নাদিরা আমাদের অমূল্য একটা সম্পদ, যে-কোনও মূল্যে তাঁকে আমরা ফেরত পেতে চাই।' ওর কবজিতে চামড়া বলে কিছু থাকছে না, তবে এখনও ঢিল হচ্ছে বাঁধন। 'চক্রি চুয়ান বলুক বিনিময়ে কত টাকা চায় সে।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল ধানাই ঠাকুর। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'সে অথরিটি তোমার আছে কি না বুঝব কীভাবে? কথার কথা বলছি, দুই আড়াই শো মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্যাশ দিতে পারা তো চাট্টিখানি কথা নয়।'

'হোটেল স্যুইটে আমার ক্রেডিট কার্ড আছে,' বলল রানা। 'প্রয়োজনে আরও বেশি টাকা ক্যাশ করতে পারব। তবে যে-কোনও আলোচনা চক্রি চুয়ানের সঙ্গে হতে হবে, অন্য কারও সঙ্গে নয়।' এত সব কথা সময় পাওয়ার জন্য বলছে ও।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

'বস্ খুব ব্যস্ত আছেন, এখনই তাঁকে পাওয়া যাবে না,' বলল ধানাই ঠাকুর। 'প্রাথমিক আলাপটা তুমি আমার সঙ্গে সেরে রাখতে পার। হোটেলের নাম বলো, তোমার স্যুইট থেকে ক্রেডিট কার্ডটা নিয়ে আসুক আমার লোক।'

মাথা নাড়ল রানা। 'উঁহুঁ, আগে আমাকে চক্রি চুয়ানের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'তুমি মিথ্যুক, সময় পাওয়ার জন্যে ধোঁকা দিচ্ছ,' খেপে উঠে বলল ধানাই ঠাকুর, ভোজবাজির মত তার হাতে একটা ছুরি বেরিয়ে এল। এই ছুরিটাই ডক্টর শামসুন্নাহারের গলায় চালিয়েছিল সে, তবে রানার তা জানার কথা নয়। 'ভাবছ ব্যাকআপ এসে উদ্ধার করবে তোমাকে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। বাইরে আমাদের ব্যাকআপ সহ বহু লোক পাহারায় আছে, অচেনা কাউকে আশপাশে ঘুরঘুর করতে দেখলে ওখানেই জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।'

কর্ণ থানম বলল, 'নন্দের আবার হুঁশ ফিরেছে।'

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে রানা। কী করবে ধানাই ঠাকুর? ছুরির কাজটা আগে শেষ করবে, নাকি প্রথমে মুখ খোলাবার চেষ্টা করবে তিলসুলানন্দের?

এক পা পিছু হটল ধানাই ঠাকুর, তারপর ঘুরে নন্দের দিকে এগোল। রানাকে খুন করবার চেয়ে বাহকের কাছ থেকে তথ্য আদায় করাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাঁধনের উপর শরীর ছেড়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম নিল রানা, তারপর আবার কবজি মুক্ত করবার কাজ শুরু করল।

'প্রেম, তুমি আমাদের পুরানো বন্ধু,' নরম সুরে বলল ধানাই ঠাকুর। 'বিশ্বাস করো, তোমাকে আমরা ছেড়েই দিতে চাই। কিন্তু তার বিনিময়ে কিছু একটা তো পেতে হবে, বলো? হয় টাকাগুলো ফেরত দাও, নয়তো এমন কিছু তথ্য দাও যাতে ওগুলো ফেরত পাবার ব্যবস্থা করতে পারি আমরা।'

'কিন্তু কিছুই তো জানি না আমি!' বিষণ্ন সুরে বলল নন্দ, কোনও আশা দেখতে পাচ্ছে না সে।

'ওদের আস্তানায় গিয়ে কী দেখলে তুমি?'

'টেবিলে ডলারের বান্ডিল নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল ওরা,' বলল নন্দ। 'জিকো চেয়ার ছেড়ে হ্যান্ডশেক করল আমার সঙ্গে। দুজন লোক সুটকেসে বান্ডিলগুলো ভরতে শুরু করল। দুটো বান্ডিল টেনে নিয়ে পরীক্ষা করলাম আমি।'

'বুঝতে পারলে ওগুলো জাল,' বলল ধানাই ঠাকুর।

মাথা নাড়ল নন্দ। 'না, তা বুঝিনি। আমার কোনও সন্দেহই হয়নি। হয়তো ওই বান্ডিল দুটো নকল ছিল না।'

'তারপর? ওরা তোমাকে বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরা সম্পর্কে কী বলল?' জানতে চাইল ধানাই।

'বলল টাকা নিয়ে এখানে পৌঁছেই আমি যেন ফোন করে ঠিকানাটা জানিয়ে দিই ওদেরকে, যে ঠিকানায় পাওয়া যাবে ডক্টর নাদিরাকে।'

হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল ধানাই। 'তুমি আসার পর পঁয়তাল্লিশ মিনিট পার হয়েছে,' বিড়বিড় করল সে। 'কর্ণ, বাইরে আমাদের পাহারা আরও জোরদার করার ব্যবস্থা করো।' মাথা ঝাঁকিয়ে বেযমেন্ট থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াল থানম, নন্দের দিকে ফিরল ধানাই। 'তারপর?'

'আমাকে ওরা গাড়িতে তুলে পৌঁছে দিল অ্যাডাম পার্কের কাছে নির্জন এক রাস্তায়, একটা পাবলিক বুদের পাশে। ওরা চলে যাবার পর ওখান থেকে তোমাদেরকে ফোন করে এই সেফ হাউসের ঠিকানা জেনে নিই আমি। ওখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা এখানে চলে আসি।'

'পথে কোথাও থেমে সুটকেসটা বদল করেছ তুমি,' বলল ধানাই।

'কতবার বলব, না, করিনি!' কেঁদে ফেলল নন্দ।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ধানাই ঠাকুর, রানার দিকে হেঁটে আসছে। 'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করলাম।'

কাঁপা কাঁপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল নন্দ, মাথা ঝাঁকাল, কৃতজ্ঞ।

বন করে নন্দের দিকে ফিরল ধানাই। 'তবে তাতে তোমার খুশি হবার কিছু নেই,' বলল সে। 'তোমাকে আমার বাঁচিয়ে রাখার কী কারণ থাকতে পারে বলো!'

'না, ঠাকুর!' নন্দ আবার কেঁদে ফেলল, 'কোনও কারণ নেই।'

ঘুরে রানার দিকে তাকাল ধানাই ঠাকুর। এই সময় আবার কথা বলে উঠল হাল ছেড়ে দেয়া মৃত্যুপথযাত্রী।

'ঠাকুর!' চুলো ও মশালের কাঁপা কাঁপা আলোয় ভৌতিক শোনাল নন্দর করুণ আবেদন। 'আমি ওদের কাছে ফিরে যাব। জানতে চাইব এই কাজ কেন ওরা করল...'

নন্দকে আর গ্রাহ্যই করছে না ধানাই ঠাকুর, সে যেন এক পিস ফার্নিচার। 'এখানে আমরা টাইম কিল করার কোনও খেলা খেলছি না, মাসুদ রানা,' বলল সে। 'হোটেলের নাম বলো, ক্রেডিট কার্ডটা এখনই চাই আমার!'

কথাটা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে থাই থান্ডারের সহকারী বস্ ধানাই ঠাকুর বন করে আধপাক ঘুরল, ওয়ালথার তুলে লক্ষ্যস্থির করল, তারপর টিপে দিল ট্রিগার। কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে তার সঙ্গীরা। কর্ণ থানম নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে।

ছুরিটা ঝাঁকিয়ে হাতের তালুতে নিয়ে এল রানা।

বিস্ফোরিত হলো তিলসুলানন্দের মাথা; হাড়, মাংস ও রক্ত ছড়িয়ে পড়ল ঠাণ্ডা বেযমেন্ট গর্তগুলোয়। টেবিলের সঙ্গে রশিতে বাঁধা শরীরটা ঝাঁকি খেল বারকয়েক, তারপর স্থির হয়ে গেল।

'দেখলে, মাসুদ রানা,' লাশটার দিকে চোখ রেখে সহাস্যে বলল ধানাই ঠাকুর, 'আমাদের কাজে না লাগলে তাকে নিয়ে কী করি আমরা?'

তালুর উপর ছুরিটাকে ঘুরিয়ে নিল রানা, কবজি বেঁধে রাখা রশিটা কাটছে। 'আমি আতংকিত,' বলল ও।

ওর দিকে এগিয়ে এল ধানাই ঠাকুর, ঠাণ্ডা রাগে অপলক হয়ে আছে চোখ, উল্টো করে ধরা পিস্তল তুলল আঘাত করবার জন্য।

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল ধানাই ঠাকুর। দূর থেকে গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। বেযমেন্টে পিন-পতন নীরবতা নেমে এল। থাই থান্ডার সদস্যরা ভ্রূ কুঁচকে পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকাচ্ছে।

'ব্যাপারটা বুঝতে পারছ?' নীরবতা ভাঙল রানা। 'তোমাদের বাহকের পিছু নিয়ে পৌঁছে গেছে থাই টং।'

'তাতে কী?' হাসল ধানাই, চোখে-মুখে আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। 'আমরা কি ভাবিনি এরকম কিছু ঘটতে পারে? আমাদের চল্লিশজন লোক পাহারা দিচ্ছে এই সেফ হাউস। সবাই তারা সশস্ত্র মার্সেনারি।'

আরও কয়েক মিনিট কাটল। গোলাগুলির আওয়াজ ক্রমশ কাছে সরে আসছে। ধীরে ধীরে নার্ভাস হয়ে উঠছে থাই থান্ডার। আরও দু'মিনিট পর থানমকে বাইরেটা দেখে আসবার জন্য পাঠাল ধানাই।

তার আর দরকার হলো না। বাইরে থেকে অকস্মাৎ একটা চিৎকার ভেসে এল। 'চারদিক ঘিরে ফেলেছে... আমাদের দুই কাতারের প্রায় সব গার্ড নিশ্চিহ্ন হয়ে...' পর মুহূর্তে যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ বেরিয়ে এল লোকটার গলা থেকে।

তারপরেই চারপাশে শুরু হয়ে গেল তুমুল গোলাগুলি। পাথুরে দেয়ালে লেগে দিক্‌বিদিক্ ছুটে যাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট। ধানাই ঠাকুরের এক সঙ্গী ঢলে পড়ল, তার পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

চোদ্দো

তিন থাই ও রানার চারদিকে ছুটোছুটি করছে বুলেটগুলো। ধানাই আর তার দুই সঙ্গী ভেঙে পড়া পাথুরে দেয়ালের স্তূপে গা ঢাকা দিয়েছে। সিলিঙের গর্ত ও সিঁড়ি লক্ষ্য করে গুলি করছে তারা।

রশির বাঁধনে দ্রুত ছুরি চালিয়ে হাত দুটো মুক্ত করল রানা, তারপর বাকি রশি কাটায় মন দিল। পিছনের দেয়ালে গুলি লাগার আওয়াজ পাচ্ছে ও।

'কোথায় বিজ্ঞানী?' কারও চিৎকার ভেসে এল বেযমেন্টে। ভাষাটা চিনা, তবে থাই টান স্পষ্ট। 'ভাল চাও তো এই মুহূর্তে তাকে আমাদের হাতে তুলে দাও।'

'টাকার বিনিময়ে পেতে হবে তাকে!' ধানাই ঠাকুরও গলা চড়িয়ে জবাব দিল। 'আমরা কারও বেগার খাটি না।'

'ব্যাপার তা হলে এখনও টের পাওনি? বাইরে তোমাদের পাহারাদাররা লাশ হয়ে পড়ে আছে,' বেযমেন্টের উপরদিক থেকে জবাব ভেসে এল। 'কয়েকজন পালিয়েছে, তবে আমাদের লোক ধাওয়া করছে তাদের, প্রত্যেকের ব্যবস্থা করে তবেই ফিরবে। এই সেফহাউসে হেরে ভূত হয়ে গেছ তোমরা।'

লোকটা থামতেই হেসে উঠল ধানাই ঠাকুর। তারপর বলল, 'আমাদের কাছেও খবর আছে, পড়ে থাকা লাশের অর্ধেকের বেশি তোমাদের লোক। একটু পর টের পাবে কারা হেরেছে, আমাদের আরও একটা গ্রুপ পৌঁছাল বলে! ডক্টর নাদিরা? টাকা না দিলে তাকে পাবার আশা ভুলে যাও।'

'চুক্তি হয়েছিল দশ মিলিয়নে, সেই চুক্তি ভেঙে বিশ মিলিয়ন চেয়ে বসলে তোমরা। নিয়েও গেছো বিশ মিলিয়ন!' উপর থেকে অভিযোগ ভেসে এল। 'এরপর আর কথা কী!'

'মো পাইয়ের মধ্যস্থতায় তোমাদের জিকো তানাইয়ের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি চিত্রলেখার চুক্তি হয়েছে, আরও পাঁচ মিলিয়ন দিতে হবে। জাল নোট পাঠিয়ে সেই চুক্তির বরখেলাপ করেছ তোমরা।'

'মো পাই খুন হবার পর ওই চুক্তি মেনে চলতে আমরা এখন আর বাধ্য নই,' থাই টং-এর লোকটা বলল। 'টাকা যা দেয়ার দিয়েছি, ভাল চাও তো বিজ্ঞানীকে আমাদের হাতে তুলে দাও।'

'তাকে পেতে হলে আরও পাঁচ দিতে হবে,' জানিয়ে দিল ধানাই ঠাকুর। 'তোমরা না দিলে অন্য পার্টি দেবে।'

আবার দু'পক্ষ থেকেই গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল।

নিজেকে রানা মুক্ত করে ফেলেছে।

বোঝাই যাচ্ছে যে বাহকের পিছু নিয়েই থাই টং পৌঁছে গেছে থাই থান্ডারের সেফ হাউসে। থাই টং-এর সঙ্গে নন্দ হাত মিলিয়ে থাকলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, ভাবল রানা। থাই টং-এর বিশ্বাস আর কোনও টাকা না দিয়েই বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে নিয়ে যেতে পারবে তারা।

কিন্তু কীভাবে? ভাবছে রানা। ডক্টর নাদিরাকে কোথায় রাখা হয়েছে কে জানে!

হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে রয়েছে রানা, অপেক্ষা করছে কতক্ষণে রক্তচলাচল স্বাভাবিক হয়। সারা শরীর ব্যথা করছে ওর। তবে মাথাব্যথা কমতে শুরু করেছে।

আরও দুজন থাই থান্ডার মারা গেল। কাঁধ ও গলায় বুলেট

www.MurchOna.com

খেয়ে থানম, কপাল ফুটো হয়ে তার সঙ্গী। রানা ও ধানাই এক কোণে আটকা পড়েছে।

রানা বুঝল, বাঁচতে হলে দ্রুত কিছু একটা করতে হবে ওকে। ছুরিটা খাপের ভিতর রেখে দিয়ে ক্রল করে এগোল ও।

ঘাড় ফেরাল ধানাই, রানার মাথা লক্ষ্য করে সাব-মেশিন গান তুলল।

'বোকামি করো না!' হিসহিস করে ধমক দিল রানা। 'ওয়ালথারটা ফেরত দাও আমাকে!'

হঠাৎ একঝাঁক বুলেট ছুটে এল উপরদিক থেকে। লক্ষণ দেখে বোঝা যাচ্ছে থাই টং হঠাৎ করে ঢুকে পড়ে দখল করে নেবে বেযমেন্ট, অন্তত সম্ভাবনাটা অস্বীকার করতে পারছে না ধানাইও। পিস্তলটা রানার দিকে ছুঁড়ে দিল সে। 'ওরা আমাদেরকে জ্যান্ত ধরবে, সেটি হতে দিচ্ছি না!' চাপাস্বরে বলল।

সিঁড়ির মাথা থেকে একটা লোক উঁকি দিচ্ছিল, পিস্তল তুলেই ফায়ার করল রানা। দড়াম করে পড়ল লোকটা মেঝেতে, চোখের জায়গায় একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে।

'তুমি একট বুদ্ধু,' ধানাইকে বলল রানা। 'খুন-খারাবি শিখেছ, মাথায় এক ছটাক বুদ্ধিও রাখো না।'

'এই, চুপ!' চোখ গরম করল ধানাই ঠাকুর, 'খবরদার!'

'তুই চুপ কর্, ব্যাটা গর্দভ!' হিসহিস করে বলল রানা। 'গর্দভ না হলে কেউ মরতে চায়? মরতে চাওয়া মানে তো হেরে যাওয়া!' তারপর, অপ্রত্যাশিতভাবে, গলা চড়িয়ে থাই টং-এর উদ্দেশে বলল, 'তোমরা ফায়ার বন্ধ করলে বলব কোথায় আছে বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরা!'

হঠাৎ করে ভৌতিক নীরবতা নেমে এল বেযমেন্টে।

'কো-ক্কোথায় তিনি?' অবশেষে জানতে চাইল কেউ একজন, লোকটা সম্ভবত তোতলা।

ধীরে ধীরে ঘুরে গেল ধানাই ঠাকুর। রাগে চোখ দুটো জ্বলছে। রানার দিকে সাবমেশিন গান তুলল সে।

মাথা নাড়ল রানা, চোখে-মুখে বিরক্তি। 'বোঝার চেষ্টা করো। আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব। মুক্তিপণের টাকা আমার সরকারই দেবে। এমনকী, আমি বললে হয়তো থাই টঙের চেয়ে বেশিও দিতে পারে।'

ধানাই ঠাকুরের চোখে-মুখে রহস্যময় একটা হাসি ফুটল। বলল, 'ভেবো না থাই টং ছাড়া বাংলাদেশই একমাত্র পার্টি। বেইজিং-এর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছি আমরা। বেইজিং বলছে ডক্টর নাদিরার নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদের একটা দায়িত্ব আছে। দুশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার চাওয়া হয়েছে।'

রানার জন্য এটা একটা নতুন তথ্য। বোঝা গেল কী কাজে ব্যস্ত চক্রি চুয়ান। হাসল ও। 'তোমাদের তো জানার কথা যে লাল চিন কখনও ব্ল্যাকমেইলিঙের কাছে নতি স্বীকার করে না। ওরাও হয়তো থাই টঙের মত বিজ্ঞানীকে সুযোগ মত তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার কথাই ভাবছে।'

অন্যমনস্কতার ভান করে চুপ করে থাকল ধানাই।

আবার গলা চড়াল রানা। 'আমাদেরকে ওপরে উঠতে দাও,' বলল ও। 'আলোচনা শুরু হোক।'

উপরে কয়েকটা কণ্ঠস্বর ফিসফাস করছে। রানার দিকে নতুন আগ্রহ নিয়ে তাকাল ধানাই ঠাকুর। 'এতে কাজ হবে?'

'সবকিছু সম্ভব। তুমিও জানো।'

নিহত সঙ্গীদের পড়ে থাকা লাশগুলো দেখল ধানাই। 'তোমার আইডিয়াটা বোধহয় মন্দ নয়।'

'বিজ্ঞানী কোথায় বলো আমাকে,' বুদ্ধি দিল রানা। 'তারপর দুজন মিলে এমন একটা মিথ্যে গল্প বানাই এসো, ওরা যাতে বিশ্বাস করে।'

চোখ দুটো সরু করল ধানাই। 'আমাকে তুমি সত্যিই বুদ্ধু

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

ভাবলে ভুল করবে, মিস্টার। ওটাই আমার ইনফরমেশন। ওটা পেতে হলে আগে তোমাকে পেমেন্ট করতে হবে।'

শ্রাগ করল রানা। এই ফাঁদ থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে ওকে। সঙ্গে যদি ধানাই আর তার তথ্যটা নিতে পারে, দারুণ হয়।

'কী বলো তোমরা?' ভাঙা পোড়োবাড়ির উপর দিকে মুখ তুলে গলা চড়াল রানা।

'ঠিট্-ঠিক আছে,' জবাব দিল তোতলা। 'নিজেদের অস্ত্র ফেলে দাও। মা-ম্মাথার ওপর হাত তুলে আড়াল থেকে বে-ব্বেরিয়ে এসো।'

বেসুরো গলায় হেসে উঠল ধানাই ঠাকুর। 'বাহ্! আমরা বেরুই, আর তোমরা গুলি করে ফেলে দাও আরকী! না, উঁহুঁ, সেটি হবে না! তোমাদেরকেও নিরস্ত্র হতে হবে।'

'কাউকে আমরা গুলি করব না,' উপর থেকে প্রতিশ্রুতি দিল থাই টঙের প্রতিনিধি। 'বিশেষ করে তোমাকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখার দরকার আছে, ধানাই ঠাকুর। কারণ বিজ্ঞানী বুড়ি তোমাদের সঙ্গে এখানে যদি না থাকে, কোথায় আছে তা তোমার কাছ থেকেই জানতে হবে আমাদেরকে।'

'জানাচ্ছি,' বিড়বিড় করল ধানাই ঠাকুর, মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা অস্ত্রগুলোর উপর চোখ বুলাচ্ছে। বলল, 'অস্ত্র ফেলবে কি না বলো। না ফেললে কোনও সমঝোতা নয়। আর আমাদের মত তোমাদেরও মাথার ওপর হাত তুলে রাখতে হবে।'

কয়েক মুহূর্ত পর জবাব ভেসে এল, 'ঠিক আছে, রাজি।'

জ্যাকেটের ভিতর বিশেষভাবে প্যাড লাগানো পকেটে ওয়ালথারটা ভরে রাখল রানা, এটা ড. শামশের আলীর নির্দেশে বিসিআই টেকনিকাল ডিপার্টমেন্টের তৈরি, খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে না দেখলে বোঝা যাবে না ওখানে ওটা আছে।

মেঝে থেকে একটা .45 তুলে নিল ধানাই, জিনসের ওয়েস্টব্যান্ডে গুঁজে রাখল। তারপর ওটার উপর ভারী জ্যাকেট চাপা দিল।

'তোমার টেসটিকল আবার না উড়ে যায়,' বলল রানা।

হেসে উঠে সিঁড়ির দিকে এগোল ধানাই, হাত তুলে চোখে ঠিকমত বসিয়ে নিচ্ছে চশমাটা। শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার বিপদটা রোমাঞ্চিত করছে তাকে।

ঠাণ্ডা বাতাসের ভিতর দিয়ে তার পিছু নিল রানা, ধানাই ঠাকুরের মত ওর হাতও মাথার উপর তোলা।

রাতের অন্ধকারে ছ'জন থাই চিনা মাথার উপর হাত তুলে অপেক্ষা করছে। আলো বলতে নীচের বেযমেন্টের নিভু নিভু তিনটে মশাল ও চুলোর লালচে আভা, আর মাথার উপর কালো চাদরে গাঁথা আধখানা চাঁদ, তাও ঝুলে থাকা গাছপালার আড়ালে খানিকটা লুকানো।

লোকগুলোর মুখ ছায়ায় ঢাকা। তাদের পরনের গাঢ় রঙের বিজনেস সুট অশুভ লাগছে দেখতে, কারণ একটা আরেকটার কার্বন কপি।

'কো-ক্কোথায় বিজ্ঞানী?' জানতে চাইল তোতলা লোকটা, অকস্মাৎ হাত নামিয়ে ফেলল সে, ডান হাতে ভোজবাজির মত বেরিয়ে এল একটা ল্যুগার। সেটা পালা করে রানা ও ধানাইয়ের দিকে ঘোরাচ্ছে।

'খুব ভাল জার্মান গান,' মন্তব্য করল রানা।

'তোমরা সমঝোতা চুক্তির বারোটা বাজিয়েছ,' তোতলা থাই চিনার দিকে তাকিয়ে অভিযোগ করল ধানাই।

'চোপ শালা শু-শুয়োরের বাচ্চা! বি-বিজ্ঞানী কোথায় বল্, তা না হলে এখনই খুন হয়ে যাবি।'

অপমানটা সহ্য হলো না ধানাই ঠাকুরের। তাকে আড়ষ্ট হয়ে যেতে দেখল রানা, দেখল তার হাত জ্যাকেটের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

‘দু’মুখো সাপের সঙ্গে আমি ব্যবসা করি না!’ বলেই .45-টা বের করে ফেলল ধানাই।

ঝুঁকে তোতলার পেটে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল রানা।

আরেক থাই চিনাকে গুলি করল ধানাই। ওটাই সবচেয়ে সহজ, নিরাপদ ও কাপুরুষের পছন্দসই টার্গেট প্র্যাকটিস ছিল।

থাই চিনা পড়ে গেল। দ্রুত তাকে আরও একটা গুলি করল ধানাই।

নিজের চোখে-মুখে নিহত লোকটার রক্তের ছিটা অনুভব করল রানা। পরমুহূর্তে দ্রুত পা চালাল অন্ধকারের দিকে। কামরা থেকে বেরিয়েই এঁকেবেঁকে ছুটল জঙ্গলের ভিতর দিয়ে।

ওর পিছনে বাকি থাই চিনাদের ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ঝাঁঝরা করছে ধানাই ঠাকুরের দুই পা। এরকম বিপদের সময়ও নিজেদের স্বার্থের কথা ভোলেনি থাই টঙের সদস্যরা। সঙ্গে সঙ্গে মারা যেতে পারে, এমন কোথাও গুলি করছে না তারা।

কয়েক মুহূর্ত পর একটা বিরতি। তারপর চিৎকার-চেঁচামেচি, যেন চোর পালাবার পর বুদ্ধি বেড়েছে।

রানা কোন্‌দিকে গেছে তা নিয়ে সম্ভবত ওদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দিল। দু’দলে ভাগ হয়ে জঙ্গলের দু’দিকে রওনা হলো ওরা। দু’মিনিট একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকার পর তৃতীয় আরেকদিকে ছুটল রানা। কমকরেও আট-নয়টা লাশ টপকাতে হলো ওকে।

মিনিট দশেক হনহন করে হাঁটবার পর একটা ঢাল পেল রানা, ওটার মাথা থেকে নেমে এল পাকা রাস্তায়। সাইরেন বাজিয়ে কয়েকটা পুলিশ কারকে ছুটে যেতে দেখল ও। উল্টোদিকে আরও দশ মিনিট হাঁটার পর একটা ট্যাক্সি পেল।

ম্যাকমোহন পার্কের পার্কিং লটে রেন্ট-আ-কার কোম্পানির টয়োটা স্প্রিন্টারটা রেখে গিয়েছিল রানা। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখল ওর গাড়ির পাশে কলাপাতা রঙের অস্বাভাবিক চকচকে একটা পোর্শ রয়েছে। গাড়িটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কয়েকটা ছোট ছেলেমেয়ে মুগ্ধ চোখে দেখছে।

তালা খুলে নিজের টয়োটায় ঢুকল রানা। দরজা বন্ধ করে সিটের সাইড পকেট থেকে রেডিওটা বের করল, দেখতে ঠিক যেন সাধারণ একটা টেপ প্লেয়ার। কানে এয়ারফোন ঢোকাল, চাপ দিল কয়েকটা বোতামে, তারপর হেলান দিল সিটে। স্যাটেলাইট ইলেকট্রনিক্সের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছে।

‘ইয়েস, এমআরনাইন,’ বিসিআই চিফ রাহাত খানের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকা থেকে।

‘সার,’ কোনও ভূমিকা না করেই রিপোর্ট করছে রানা। ‘ইমরুলকে যে গুলি করেছিল সে নেই। এই অপারেশনের সঙ্গে তাইওয়ানিজ টংও জড়িত, ওদের চিফও নেই।’

কোনও মন্তব্য না করে অপরপ্রান্তে অপেক্ষা করছেন বিসিআই চিফ।

‘দোই ইনথানন দুর্গে তেরপল ঢাকা একটা জেট প্লেন দেখেছি,’ বলল রানা। ‘কিন্তু সেটা আমাদের দুরন্ত ঈগল কি না জানার সুযোগ হয়নি আমার।’

‘এয়ারপোর্টের বিভিন্ন সূত্র থেকে আমাকে জানানো হয়েছে, ওটাই পুড়েছে আগুনে,’ বললেন রাহাত খান। ‘দুরন্ত ঈগল আকাশে ওঠেনি, উঠেছিল দ্বিতীয় প্লেনটা। তর্কের খাতির যদি ধরে নেয়া হয় যে দুরন্তই আকাশে উঠেছিল, তা হলেও পরিস্থিতি বদলাচ্ছে না। কারণ, কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে বলা হচ্ছে ওই ঈগল ঢাকার আকাশ ছেড়ে কোথাও যায়নি। তবে একটা কথা।’

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

'ইয়েস, সার!'

'কন্ট্রোল টাওয়ারের নির্দেশ পেয়ে যে তিনজন চিনা ক্রু বি সেকশনের ঈগল নিয়ে আকাশে উঠেছিল, ওদের সম্পর্কে একটা রহস্যময় রিপোর্ট পাওয়া গেছে।'

কথা না বলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে রানা। ওর জানা আছে, এই তিন চিনা ক্রুর কোনও হদিসই পাওয়া যাচ্ছিল না।

'এয়ারপোর্টের বাইরে কোথাও থেকে একটা হেলিকপ্টারে চড়ে ওরা,' বললেন রাহাত খান। 'ওটা ওদেরকে টেকনাফে পৌঁছে দেয়। সেখান থেকে বোট নিয়ে একটা জাহাজে উঠে চলে গেছে ওরা। কেউ বলতে পারছে না কেন ওরা এরকম অদ্ভুত আচরণ করল। আমি খবর রাখছি, এখন পর্যন্ত চিনেও ওরা পৌঁছায়নি। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে দুর্বোধ্য কী যেন একটা গোলমাল আছে।'

'জী, সার,' বলল রানা।

'আরেকটা কথা,' বললেন রাহাত খান। 'গালকাটা রুস্তম নামে এক ক্রিমিনাল ধরা পড়েছে। ইন্টারোগেশন চলছে। স্বীকার করেছে থাই থান্ডারের দুটো গ্রুপকে ও-ই এয়ারপোর্ট থেকে বের করে আনে। তাদের কয়েকজনের নামও বলেছে ও।'

নামগুলো জেনে নিল রানা। তারপর বলল, 'সার, আমি তা হলে...

'এই মুহূর্তে দুরন্ত বড় কোনও ইস্যু নয়,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন রাহাত খান। 'মূল ইস্যু বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরা। আমার কাছে আজই খবর এসেছে, থাই থান্ডার বেইজিঙের কাছ থেকে দুশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার মুক্তিপণ চেয়েছে। বলেছে, মুক্তিপণ না দিলে ডক্টর নাদিরাকে ওরা অন্য কোনও প্রতিপক্ষের কাছে বেচে দেবে।'

'ক্রিমিনালদেরও একটা নীতি থাকে, ওরা তা মানছে না, সার,' বলল রানা।

'তোমার বন্ধু লিউ ফুচুং আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল,' বললেন বিসিআই চিফ। 'আসলে খুঁজছিল তোমাকে। ও বলছে, এই ব্যাপারটায় কয়েকটা পার্টি জড়িত, ফলে ফিল্ডে তোমাকে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বলল, তোমার কল পাবার অপেক্ষায় তৈরি হয়ে আছে ও।'

'জী, সার।'

'চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের তরফ থেকে ফুচুং তোমাকে একটা পোর্শ কার গিফট করেছে,' বললেন রাহাত খান। 'ওর ধারণা, বিশেষ করে এই অ্যাসাইনমেন্টে তোমার নাকি লাগতে পারে ওটা। আমি ওকে বলেছি – যেহেতু কারও কাছ থেকে গিফট নেওয়ার কোনও নিয়ম নেই, কাজ শেষ হয়ে গেলে ওটা তুমি ওকে ফেরত দেবে।'

'জী, সার।'

'ম্যাকমোহন পার্কের পার্কিং লটে ডেলিভারি দেয়া হয়েছে ওটা,' বললেন রাহাত খান।

রানা অবাক। মাথা ঘুরিয়ে টয়োটার পাশে পার্ক করা পোর্শ কারটার দিকে তাকাল ও। কাকতালীয় একটা ব্যাপার, সন্দেহ নেই। 'জী, সার।'

'গাড়িটার কিছু টেকনিকাল বৈশিষ্ট্য আছে, বুকলেট দেখে জেনে নিয়ো কীভাবে ব্যবহার করতে হয়।'

'জী, সার।'

'গুড হান্টিং, মাই বয়!' বলেই যোগাযোগ কেটে দিলেন বিসিআই চিফ।

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

পনেরো

বিগ ডিল ক্যাসিনোর ফাইল থেকে পাওয়া ঠিকানায় পৌঁছাতে চাইছে রানা। দুই ব্লক আগে পোর্শ থামাল, বাকি পথ হেঁটে এগোচ্ছে।

সাজানো-গোছানো এলাকা, ধনী মানুষদের বসবাস। প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনে বাগান ও লন। বহুতল ভবনগুলো আকাশ ছুঁয়েছে। রাস্তায় জটলা নেই, দোকান-পাট নেই। হাস্যোজ্জ্বল টিন-এজ ছেলেরা তীরবেগে মোটরসাইকেল চালাচ্ছে, পিছন থেকে তাদেরকে জড়িয়ে ধরে খিলখিল করছে মিনি স্কার্ট পরা সুন্দরী সিঙ্গাপুরী মেয়েরা।

রাস্তার ধারে পার্ক করা গাড়িগুলো বেশিরভাগই মার্সিডিজ, পাজেরো বা বিএমডব্লিউ। এগুলোর মাঝখানে দৃষ্টিকটু লাগল উইন্ডো ওয়াশার-এর একটা তোবড়ানো ট্রাক।

ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে এল রানা, মুখ তুলে তাকিয়ে আছে আটতলা একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের দিকে, ওর সংগ্রহ করা ঠিকানার সঙ্গে মেলে। বিল্ডিংটার চারতলার বাইরে, বাঁশের তৈরি মাচার উপর দাঁড়িয়ে, এক লোক ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে জানালার কাঁচ পরিষ্কার করছে।

বাড়িটার গেটের পাশে একটা টুল দেখে বোঝা গেল ওখানে দারোয়ান বসে, তবে এই মুহূর্তে সে অনুপস্থিত। ঢুকে পড়ল রানা। এলিভেটরকে পাশ কাটিয়ে মোজাইক করা ঝকঝকে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠছে ও।

প্রতিটি ফ্লোরে একটা করে করিডর, দু'পাশে কয়েকটা করে ফ্ল্যাট। প্রতিটি ফ্লোরের সব দরজা বন্ধ দেখছে রানা। করিডরে কেউ নেই, ফ্ল্যাটগুলো থেকে কোনও রকম আওয়াজও আসছে না।

ফাইভ-সি অ্যাপার্টমেন্টটা খুঁজছে ও। চারতলায় ওটা পেয়ে গেল ও, সার্ভিস লিফট চেক করল। চালু আছে ওটা, বোতাম টিপলেই হাজির হবে এসে। দ্রুত পলায়ন করতে হলে সুবিধে হবে ভেবে কল-বাটনে চাপ দিল ও।

তারপর রওনা হলো করিডর ধরে। শেষ অ্যাপার্টমেন্টটাই ফাইভ-সি। ফাইভ-এ থেকে সুন্দরী এক চিনা তরুণী দরজা খুলে বেরুতে যাচ্ছিল, রানাকে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে দাঁড়ানো কাকে যেন কী বলল। মেয়েটির কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে রানার দিকে তাকাল তার শ্বেতাঙ্গ সঙ্গী। রানাকে চোখে-মুখে রক্তের ছিটে নিয়ে ফাইভ-সির দিকে এগোতে দেখে তারা যেন খুব অবাক হয়েছে।

আবার যখন ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিল মেয়েটি। ফাইভ-সির সামনে থেমে কান পাতল ও। কোনও শব্দ পাচ্ছে না। দরজার কবাটে কান ঠেকাল। না, কিছু শোনা যাচ্ছে না। এরপর নক করল।

ফাইভ-এ থেকে আবার উঁকি দিল সেই তরুণী। এবার মেয়েটিকে আরও বেশি ইতস্তত করতে দেখল রানা। তার মাত্র একটা চোখ দেখা গেল, তারপরই ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল কবাট।

দরজার কী হোলে টুথপিক ঢোকাল রানা। একটু পর ক্লিক করে শব্দ বেরুল ওটা থেকে। একপাশে দাঁড়িয়ে কবাট খুলল ও।

অ্যাপার্টমেন্টটা অন্ধকার। তবে ভিতর থেকে ভ্যাপসা গুমোট কোনও ভাব এসে মুখে লাগল না। হাতে পিস্তল নিয়ে সাবধানে ঢুকল রানা, দরজা বন্ধ করে টর্চ জ্বালল, আলোটা কামরার চারদিকে ঘোরাচ্ছে।

www.MurchOna.com

দামি সোফার সামনে কফি টেবিল, তাতে খোলা কয়েকটা ম্যাগাজিন পড়ে রয়েছে, পাঠকরা যেন যে-কোনও মুহূর্তে ফিরে আসবে। টেবিলে কফি পট ও তিনটে কাপ রয়েছে, প্রতিটি প্রায় অর্ধেক ভরে আছে কফিতে। পুরানো একটা ফ্লোর রেডিও থেকে ক্ষীণ আভা বেরুচ্ছে।

পাশের কামরায় তাড়াহুড়ো করে ওয়ার্ড্রোব থেকে কাপড়চোপড় বের করবার পর সব আবার তোলা হয়নি, কিছু পড়ে আছে মেঝেতে। টেবিলের দেরাজগুলো খোলা, ভিতরের জিনিস-পত্র এলোমেলো করা। বাকি কামরাগুলোরও একই অবস্থা, চারদিকে কসমেটিকস ছড়িয়ে আছে। কী যেন খুঁজেছে কেউ হন্যে হয়ে।

প্রথম কামরায় ফিরে এসে রাস্তার দিকের জানালাটা খুলল রানা, তারপর বাইরে মাথা বের করে উইন্ডো ওয়াশারকে হিন্দি ভাষায় বলল, 'এই যে মামাতো ভাই, এখানে কী?'

'আরে, আপনি!' ওকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল লোকটা, কথা বলছে হিন্দিতেই। 'আপনি... দেবতুল্য মানুষ! নমস্তে, সার! সেলাম, হুজুর!'

'সালাম,' বলল রানা, খর্বকায় পকেটমারের দিকে তাকিয়ে হাসল। সাদা শার্টের সঙ্গে বো টাই পরেছে এখন। 'গরম এক কাপ কফি চলবে নাকি? চললে ভেতরে ঢুকে পড়ুন।'

রানা ওকে আপনি করে বলছে দেখে খুশি হওয়ার বদলে ভ্রূ কোঁচকাল পকেটমার। তারপর হাতের কাজ থামিয়ে মাচার উপর পাঁচ সেকেন্ড বসে থাকল। অবশেষে মাথা ঝাঁকাল। সাবধানে জানালার গোবরাটে পা দিয়ে কামরার ভিতর ঢুকে পড়ল সে।

'হাসপাতাল থেকে এরইমধ্যে বেরিয়ে এসেছেন?'

'জখম খুব একটা গুরুতর ছিল না, সার। ওরা আর মারতে পারল কই, আপনি বাধা দিলেন না! দু'ঘণ্টা পর জানালা গলে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলাম।'

'কেন?' রানা অবাক।

'ওরা থাই থান্ডার, একবার যখন চিনেছে, সহজে আমাকে ছাড়বে ভেবেছেন?' বেশি কথা বলা হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে চুপ করে গেল লোকটা।

তার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিস?' জানতে চাইল ও।

'কী করে বুঝলেন, সার?'

'সন্দেহটা মাথায় আসে বিগ ডিলে যখন আপনি আমার পকেট মারলেন,' বলল রানা। 'ওই কাজে আপনি মোটেও ভাল না। গিল্টি মিয়া নামে একজন হাতসাফাইয়ের ওস্তাদ আছে, সে হলে কিছু টেরই পেতাম না। বোঝা যায় যে এটা আপনার পেশা নয়।'

রানাকে অবাক করে দিয়ে রানার কথা মেনে নিল লোকটা, 'আপনি ঠিক ধরেছেন, সার! কাজটায় এখনও তেমন হাত পাকাতে পারিনি। অধমের নাম মানস ঘোষ।' জুতোর গোড়ালি পরস্পরের সঙ্গে ঠুকে মাথা নোয়াল সে।

'মাসুদ রানা।'

'ওহ্? মাইরি বলছি, দাদা, এ তো স্বপ্নেও কখনও আশা করিনি! স্বয়ং মাসুদ রানা আমার সামনে দাঁড়িয়ে! আমার হিরো! আমার আইডল! মা দুর্গা, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ!'

রানাকে আরও খানিক বিব্রত করল মানস, দ্বিতীয়বার হ্যান্ডশেকে বাধ্য করে।

অবশেষে কথাটা তুলল রানা। 'কিছু যদি মনে না করেন, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।'

'জে-আজ্ঞে, বলুন না।' বিনয়ের অবতার সাজল মানস ঘোষ। 'আপনার কথা, সে কী অমৃতবচন না হয়ে যায়!'

'আপনাকে আমার অত্যন্ত অভিজ্ঞ আর দক্ষ একজন

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

এসপিওনাজ এজেন্ট বলে মনে হয়েছে,' বলল রানা। 'অথচ এই যে সারাক্ষণ নাটুকেপনা, অতিরিক্ত গদগদ ভাব, এটা কেন?'

রানা ভেবেছিল লোকটা অপমান বোধ করবে। কিন্তু তার বদলে হাসল সে। 'আসল কথাটা তা হলে বলেই ফেলি, হুজুর। এই দেখুন, আবার মুখ দিয়ে হুজুর বেরিয়ে গেল! হয়েছে কী, এটা আমার অনেক পুরানো একটা অভ্যাস, সেই ছোটবেলার। সিক্রেট সার্ভিসে ঢোকার পর ট্রেনাররা বলল, নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্যে এই অভ্যাসটা তুমি ধরে রাখতে পার। ব্যাপারটা আমার মজ্জার সঙ্গে মিশে গেছে, চাইলেও ছাড়তে পারি না।'

'ও। তা হলে তো আর কিছু করার নেই,' বলে কাজের কথা পাড়ল রানা। 'প্রতিটি কামরা এলোমেলো হয়ে আছে। আপনার কাজ?'

মাথা ঝাঁকাল মানস ঘোষ। 'তবে নির্দিষ্ট কিছু খুঁজছিলাম, তা নয়,' বলল সে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'জানালা খুলে বাইরে তাকাবার কথা মনে হলো কেন?'

'সাধারণত এই কাজ রাতে কেউ করে না।'

'আরে, তাই তো!' কপালে চাঁটি মারল মানস। 'নীচের রাস্তায় পার্ক করা একটা ট্রাকে গিয়ারগুলো দেখে ভাবলাম ফ্ল্যাটটায় তল্লাশি চালাবার জন্যে ভাল একটা কাভার পাওয়া গেছে।' হাসল সে। 'আপনি ছাড়া আর কেউ প্রশ্ন করেনি, বুঝলেন না।'

'আর কেউ আসলে গ্রাহ্য করেনি,' বলল রানা। 'আসুন, আমরা নোট বিনিময় করি। আপনার আপত্তি নেই তো?'

'কী বলেন, সার, কীসের আপত্তি!'

'আপনি আমার পকেট মারতে গেলেন কেন?'

'দেখামাত্র ষষ্ঠইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুঝতে পারলাম, আমার লাইনের লোক। ভাবলাম জেনে রাখা ভাল কে আপনি। মানিব্যাগকে তথ্যের ভান্ডার বলা যায়।'

'এখানে আপনি কী করছেন?'

'মাস ছয়েক আগে ব্যাংককে থাই থান্ডারের এক সদস্যের সঙ্গে আমার গোলমাল বেধেছিল। তার নাম ধানাই ঠাকুর। গত শুক্রবার রাতে তেনগাহ্ এয়ারপোর্ট থেকে একটা অ্যামবুলেন্সে চড়ে তাকে বেরুতে দেখেছি আমি।'

রানা ধারণা করল, ওই অ্যামবুলেন্সে নিশ্চয়ই ডক্টর নাদিরা ছিলেন। 'আপনি ফলো করেননি?'

'দাদা, তখন কি আর জানি যে কী ঘটে গেছে!' ম্লান হেসে মাথা নাড়ল মানস। 'তবে কাল আবার আমি ধানাইকে দেখতে পাই বিগ ডিলে। গভীর রাতে ফলো করে এই সেফ হাউসটা দেখে যাই। কিন্তু আজ এসে দেখি চিড়িয়া উড়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, একেবারে দুনিয়া ছেড়ে,' বলল রানা। 'ঘণ্টা দুই আগে থাই টং তাকে খুন করেছে।'

'বলেন কী, দাদা!' হাঁ হয়ে গেল মানস। তারপর বলল, 'ভয়ানক নিষ্ঠুর লোক ছিল, কাজেই তার চলে যাওয়ায় দুনিয়ার কোনও ক্ষতি হলো না।'

'এসে দেখলেন চিড়িয়া ভেগেছে,' বলল রানা। 'তারপরও মাচায় বসে কী করছিলেন?' ভ্রু কোঁচকাল ও।

হেসে উঠল মানস। 'তল্লাশি শেষ করে আমার তো চলে যাবারই কথা, বুঝলেন না। ভাবলাম আরও আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে দেখি কেউ আসে কি না। কারণ আমি জানি ওদের পেছনে থাই টং লেগেছে।'

'কী করে জানলেন?'

'আপনি তো জানেনই, প্রতিবেশী সব দেশে আমাদের এসপিওনাজ নেটওঅর্ক আছে,' বলল মানস। 'সে-সব নেটওঅর্ক থেকে যে-সব রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে তা থেকে আমাদের সিক্রেট সার্ভিস পুরো ছবিটাই পেয়ে গেছে।'

'কী রকম?'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

‘যেমন আমরা জানি বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে ঢাকা থেকে হাইজ্যাক করেছে থাই থান্ডার। জানি এই কাজে কয়েকটা পার্টি জড়িত। আমাদের ধারণা, কাজটা করে লাল চিনের পা মাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।’

‘এর মধ্যে যে নাক গলিয়েছেন, আপনাদের স্বার্থটা কী?’ জানতে চাইল রানা।

‘আমি ছোট মানুষ, বিশাল ভারতের স্বার্থ কতটুকু বুঝব, বলুন, হুজুর – থুক্কু, সার– আই রিপিট থুক্কু. মিস্টার রানা! আমাকে বলা হয়েছে অন্তত এই কেসটায় চিন আর বাংলাদেশকে পারলে সাহায্য করতে হবে। তাই ভাবছি আমার একবার মালয়েশিয়ায় যাওয়া দরকার।’

কিছু না বলে অপেক্ষা করছে রানা।

‘আসলে যাচ্ছি কেলানটান রাজ্যের রাজধানী কোটা বাহারু-তে,’ বলল মানস। ‘মালয়েশিয়ার উত্তরে, সি রিসর্ট।’

‘সেখানে কী?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘বছর কয়েক আগে আমাদের সরকার থাই থান্ডারের সঙ্গে একটা চুক্তিতে এসেছিল কোটা বাহারুর কাছাকাছি একটা নির্জন সৈকতে বসে। তখনই আমাদের মনে হয়েছিল, ওখানে ওদের বোধহয় গোপন কোনও আস্তানা আছে। আজ আমি একটা মেসেজ রিসিভ করেছি, ওই গ্যাং-এর একজনকে শহরে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে।’

‘ভাল একটা সূত্র,’ বলল রানা, দেয়ালে ঝোলানো টেলিফোনের দিকে তাকাল। ‘ঠিক আছে, রানা এজেন্সির একজন এজেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা বলে নিই, তারপর আপনার সঙ্গে বেরুনো যেতে পারে। এখানে এমন কিছু পেয়েছেন আপনি যা দেখে ওদের গন্তব্য বা অন্য কোনও সেফ হাউস সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়?’

‘নাহ্।’ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মানস। ‘আপনি আপনার এজেন্টকে ফোন করুন। আমি বাথরুম থেকে একটু ফ্রেশ হয়ে আসি। ঠিক আছে?’

মাথা ঝাঁকাল রানা।

মানস বাথরুমে ঢোকার পর দেয়াল থেকে ফোনের রিসিভার নামাল ও। থাইল্যান্ডের হাট খোয়াই, হোটেল নন্দনকাননের নম্বরে ডায়াল করছে। দু’বার রিঙ হতেই অপারেটর রিসিভার তুলল। লাবণীকে চাইল ও।

একটু পরেই লাবণীর স্যুইট নম্বরের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে দিল অপারেটর।

‘রানা। রিপোর্ট করো।’

রানার গলা চিনতে পেরে উত্তেজিত হয়ে উঠল লাবণী। ‘মাসুদ ভাই, আমার সেলফোনে এক লোকের কল পাবার অপেক্ষায় রয়েছি আমি,’ দ্রুত বলল সে। ‘লোকটা ফ্রি-লান্সার ইনফরমার, তবে বেশিরভাগ সময় থাই সিক্রেট সার্ভিসেরই কাজ করে। আমার সঙ্গে ব্যাংককে পরিচয় হয়েছিল। আমাকে এখানে দেখে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে, একটা চিরকুট পাঠিয়ে জানিয়েছে দুর্গ থেকে ফিরে আমার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করবে।’

‘গুড,’ বলল রানা, লাবণীর উত্তেজিত বোধ করবার কারণটা বুঝতে পারছে। শত্রুপক্ষের অন্দরমহলে কী হচ্ছে না হচ্ছে জানার সুযোগ হবে তার। ‘আর সব খবর বলো।’

এবার ধীরে ধীরে রিপোর্ট করল লাবণী। ‘মাসুদ ভাই, একা সবদিকে নজর রাখতে পারব না, তাই ব্যাংকক থেকে একজন অপারেটরকে আনিয়েছি। এদিকে দুর্গের নিরাপত্তা আরও কঠোর করেছে থাই টং। হ্যাঙ্গারটা মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। রানওয়ের চারদিকে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানও বসাচ্ছে ওরা। ভেতরে শ্বেতাঙ্গ লোকজনের আসা-যাওয়া আরও বেড়েছে, তাদের মধ্যে দুজন অন্তত ইউরোপের নামকরা বিজ্ঞানী।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে খুব সমস্যার মধ্যেই আছে তারা।'

'থাই সিক্রেট সার্ভিসের ভূমিকা?' জানতে চাইল রানা। 'কোনও পরিবর্তন লক্ষ করছ?

'না,' বলল লাবণী। 'আগের মতই অসহায় ওরা। সবই দেখছে, তবে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই...' কথার মাঝখানে হঠাৎ আবার একটু ব্যস্ত হয়ে উঠল সে, '...মাসুদ ভাই, একটু অপেক্ষা করুন, ফোনটা এসেছে!'

'ঠিক আছে, লাইনে আছি আমি,' বলল রানা।

দুই মিনিটের নীরবতা। তারপর আবার লাইনে ফিরে এল লাবণী। 'মাসুদ ভাই, কোড!'

রানা বুঝল, গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য পেয়েছে লাবণী। পকেট থেকে পেন্সিল ও নোটবুক বের করল ও, তারপর রিসিভারে বলল, 'গো অ্যাহেড।'

শুরু করল লাবণী।

সংকেত ভাঙার কোড জানা থাকায় লাবণীর উচ্চারিত শব্দগুলো লেখার সময়ই তরজমা করে ফেলছে রানা: 'থাই টঙের নির্যাতনে সিঙ্গাপুরে মারা গেছে ধানাই ঠাকুর। মারা যাওয়ার আগে মুখ খোলে সে। বলে গেছে, বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে মালয়েশিয়ার কোটা বাহারুতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

সাংকেতিক ভাষাতেই উত্তর দিল রানা; 'ওয়েল ডান, লাবণী। এখনই একটা কপ্টার চার্টার করো তুমি, ব্যাংকক হয়ে মালয়েশিয়ার কোটা বাহারুতে চলে এসো। হোটেল শেরাটনে উঠবে। আমিও আসছি ওখানে।'

ষোলো

পুব আকাশে ভোরের সূর্য উঁকি দিচ্ছে। ঘণ্টায় সত্তর কিলোমিটার স্পিডে কলাপাতা রঙের ঝকঝকে পোর্শটা পাশ কাটাচ্ছে কুয়ালালামপুরকে। ড্রাইভিং সিটে মাসুদ রানা। সারা রাত একাই গাড়ি চালাচ্ছে ও।

সিঙ্গাপুর থেকে কজওয়ে পার হয়ে মালয়েশিয়ায় ঢোকার সময় কাস্টমস চেক হয়েছে নামে মাত্র। ইমিগ্রেশনে নিজেদের আসল পরিচয়ই দিয়েছে ওরা, ফলে ঝামেলা কম পোহাতে হয়েছে।

ব্রেকফাস্ট খাওয়ার জন্য একটা রেস্তোরাঁর সামনে থামল ওরা। ওয়েটারকে ডেকে অর্ডার দেওয়ার পর বাথরুমে গেল মানস, ফেরার সময় তাকে একটা পে বুদে ঢুকতে দেখল রানা। কার সঙ্গে কথা বলল কে জানে, ফিরল বেশ খানিক দেরি করে।

নিজের চেয়ারে বসে রানাকে বলল, 'একটা ঝামেলার কাজ সেরে এলাম, বুঝলেন না!'

'কী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কোটা বারুতে নামকরা ভারতীয় হোটেল আছে, তাজমহল,' বলল মানস। 'আমাদের জন্যে দুটো স্যুইট রিজার্ভ করলাম। এদিকে এলে ওখানেই উঠি আমি।'

অবাক হলো রানা। 'আমাকে না জিজ্ঞেস করেই?'

'না, মানে,' অপ্রতিভ হয়ে উঠল মানস, '...দাদা, তাতে কি কোনও সমস্যা হবে? আমি কিছু না ভেবেই...'

'আমাদের এজেন্টকে আমি বলেছি... ঠিক আছে, যা হবার হয়েছে। তাকে জানালেই হবে যে আমি তাজে উঠেছি।'

'দাদা, আপনি বললে রিজার্ভ এখনই ক্যানসেল করে দেয়া

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

যায়...'

'না, তার দরকার নেই,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'আমারও এখন ইচ্ছে করছে তাজে উঠতে।'

পাহাড় ও উঁচু-নিচু ঢাল পার হয়ে এই মুহূর্তে সমতলভূমিতে রয়েছে পোর্শ। গুনগুন করে পুরানো একটা হিন্দি গান গাইছে মানস: 'হাম জিকে কিয়া করেঙ্গে যাব দিল হি টুট গ্যায়া...'

'হৃদয়টা সত্যি সত্যি ভাঙেনি তো, মিস্টার মানস?' জানতে চাইল রানা, তীরবেগে গাড়ি চালাচ্ছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল মানস। 'থাক।' জোর করে হাসল সে। তারপর বলল, 'তারচেয়ে গাড়িটার বৈশিষ্ট্য একটু শোনা যাক। বুকলেটে টেকনিকাল ভাষায় কী সব লেখা রয়েছে বুঝলাম না। বড় কৌতূহল হচ্ছে।'

'ওই বোতামে চাপ দিন,' বলল রানা, আঙুল দিয়ে বোতামটা দেখাল।

ওয়ালনাট ড্যাশবোর্ডে বসানো লাল বোতামটার দিকে তাকাল মানস। 'কী হবে?' চোখে প্রচুর সন্দেহ, কিছুটা ভয়।

'না টিপলে বুঝবেন কীভাবে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বোতামটায় চাপ দিল মানস। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ ইঞ্চি চওড়া চৌকো একটা সেমি-ট্র্যান্সপারেন্ট স্ক্রিন বেরিয়ে এল ওয়ালনাট ড্যাশবোর্ডের উপর। তাতে দু'সারিতে সাজানো রয়েছে কিছু শব্দ। প্রতিটি শব্দের পাশে রুপালি রঙের জ্বলজ্বলে একটা চৌকো দাগ রয়েছে।

জিনিসটা কী বোঝার জন্য সামনে ঝুঁকল মানস। 'ব্যাখ্যা করুন, বুঝলেন না, হুজুর – থুক্কু, মিস্টার রানা!' হাত বাড়াল সে।

'ওটায় হাত না দেয়াই ভাল,' সাবধান করল রানা। 'এই গাড়ি চলে মাইক্রোকমপিউটার সিস্টেমে। যেমন ধরুন, আমি যখন দরজায় তালা দিই, ওগুলো সত্যি সত্যি তালা দেয়া হয় – আমি ছাড়া আর কেউ গাড়িতে চড়তে পারবে না। চাবিটা আমার সিস্টেমের সঙ্গে ইলেকট্রনিকালি সেনসিটাইজ্ করা আছে। ওই চাবির মাধ্যমে আমার বডি রিদম চিনতে পারবে কমপিউটার, ফলে অন্য কেউ কী হোলে চাবি ঢোকালে তালা খুলবে না ওটা। আবার যখন আমি ওই একই চাবি কী হোলে ঢোকাব, অমনি খুলে যাবে দরজা।'

'বাহ্, আজব তো!' প্রশংসা করল মানস। 'আর এই আশ্চর্য প্যানেলটা?' দ্বিগুণ উৎসাহে জানতে চাইল। 'এটার কী কাজ?' উত্তেজনায় ছাগলদাড়ি মোচড়াচ্ছে সে।

'ওটা কমপিউটার সিস্টেমেরই অংশ। প্রতিটি শব্দ একটা করে কমান্ড। আপনাকে শুধু ওগুলোর একটা স্পর্শ করতে হবে – চৌকো ঘর হোক, কিংবা পাশের শব্দ – সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন দেখতে পাবেন।'

'ঠিক কী ধরনের অ্যাকশন হতে পারে, মিস্টার রানা?' জিজ্ঞেস করল মানস। 'স্রেফ কৌতূহল, বুঝলেন না!'

'ধরুন স্পাইক লেখা শব্দটা ছুঁলেন আপনি, ঠিক আছে? সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির পেছন থেকে পেরেকের মত দেখতে বিস্ফোরক ছড়িয়ে পড়বে রাস্তায়। খুব ভারী কিছু ওগুলোকে চাপা দিলে তবে ফাটবে। যে গাড়িই এটার পিছু নিক, সেটার টায়ার বলে কিছু থাকবে না।'

'মাইরি বলছি, সার, ভারি চমৎকার তো!'

'এবার পোর্ট ও স্টারবোর্ড,' বলল রানা, খেয়াল করল উৎসাহে চকচক করছে মানসের সরল চোখ দুটো, 'এই দুটো শব্দের ব্যাখ্যা দিই। দু'দিকের টায়ারের ওপর দুটো সাবমেশিন গানের কথা বলছে ওগুলো। ফেনডার পিছিয়ে যাবে, বেরিয়ে আসবে গান, ড্যাশ-এ উদয় হবে চারটে বুল'স-আই, চালক

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

যাতে গুলি করার জন্যে লক্ষ্যস্থির করতে পারে। কিংবা এত ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে কমপিউটার ইন্টেলিজেন্সের সাহায্যও নেয়া যায়, হেয়ারলাইনে টার্গেট চলে এলে আমার হয়ে ওটাই ফায়ার করবে।'

সিটে হেলান দিল মানস। 'এত অবাক হচ্ছি যে মনে হচ্ছে চৈতন্য লোপ পাবে, সার – মিস্টার রানা! আর এই শব্দটা, এস্কেপ?'

'আমার খুব পছন্দের শব্দ ওটা,' বলল রানা। 'ঘণ্টায় নব্বুই মাইল স্পিডে ছুটছেন আপনি, তবে জানেন এটার স্পিড একশো বিশ পর্যন্ত তুলতে পারবেন। যে-ই পিছু নিয়ে থাকুক, আপনি চিন্তিত নন। হঠাৎ করে, আরও দুটো গাড়ি হাজির হলো আপনার সামনে। আপনি ফাঁদে পড়ে গেছেন। কী করবেন?'

'প্রার্থনা,' বলল মানস। 'মা দুর্গার দয়া চেয়ে প্রার্থনা। ইচ্ছে হলে তিনিই উদ্ধার করবেন।'

'না। আপনি আঙুল ছোঁয়াবেন এস্কেপ শব্দটায়, ওই সময় ওটাই আপনার দুর্গার পদতল, আর ওই স্পর্শই আপনার প্রার্থনা। কমপিউটারের সবগুলো ফাংশন কাজ শুরু করে দেবে। প্রতিরক্ষার সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেবে ওটা। আপনার চারপাশের তিনশো ষাট ডিগ্রি কাভার করবে – বারোটা বাজাবে নড়াচড়া করছে এমন যে-কোনও গাড়ির। মেশিন গান, স্মোক, পেরেক, গ্যাস – কিছুই ব্যবহার করতে বাকি রাখবে না। আরও আছে। টারবো জেট আপনাকে ঘণ্টায় তিনশো মাইল স্পিড পাইয়ে দেবে। সব মিলিয়ে, একটা ছোট আর্মির নেতৃত্ব চলে আসবে আপনার হাতে, তাদের সাহায্যে আপনি এস্কেপ, অর্থাৎ, পলায়ন করবেন।'

'নিশ্চয়ই বুলেটপ্রুফ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'শুধু বুলেটপ্রুফ নয়, বোমাপ্রুফও।' একটা বোতামে চাপ দিল ও, স্ক্রিনটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

'এরকম একটা গাড়িতে বসে নিজেকে বেশ নিরাপদ মনে হচ্ছে,' বলল মানস। 'বুঝলেন না!'

মৃদু হাসল রানা। জানে, এ-ধরনের গাড়ি ভারতও তৈরি করছে; কথাটা মানসের না জানার কথা নয়।

কুয়ালালামপুর থেকে কোটা বাহারু প্রায় সাড়ে তিনশো কিলোমটার দূরে, পৌঁছাতে বেশ বেলা হয়ে গেল। কোটা বাহারু পর্যটন শহর, কয়েক লাখ লোকের বাস, রাস্তায় রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম লেগে আছে। পৌঁছাতে দেরি হবে বুঝতে পেরে হোটেল শেরাটনে ফোন করল রানা, রিসেপশনকে জিজ্ঞেস করল লাবণী সামাদ নামে কোনও গেস্ট নাম রেজিস্ট্রি করেছে কি না।

করেছে। রানা জানতে চাইল, ফোনের লাইনটা লাবণীকে দেওয়া যায় কি না। উত্তর পেল, ঘণ্টা দুয়েক আগে হোটেলে নাম লিখিয়েই আবার বেরিয়ে গেছেন তাদের গেস্ট।

হোটেল তাজমহলে উঠল ওরা। হোটেলের কার পার্কিং-এ পোর্শ থেকে নামছে ওরা, শুনতে পেল কচি গলায় কেউ বলছে, 'মিস্টার! ও মিস্টার! আপনাদের কি গাইড দরকার?'

রানা ও মানস দুজনেই ঘুরে দাঁড়াল। নিচু পাঁচিলের ওপারে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা ছেলে উৎসাহের সঙ্গে ওদের উদ্দেশে হাত নাড়ছে। বছর বারো বয়স হবে তার, পরিচ্ছন্ন হাফপ্যান্ট ও শার্ট পরে আছে।

'আমি খুব ভাল গাইড, সার! যেখানে বলবেন সেখানেই নিয়ে যাব। আমরা বিদেশি ট্যুরিস্টকে পছন্দ করি।'

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল রানা। 'দুঃখিত, বন্ধু, আজ আমাদের গাইড দরকার নেই।' কয়েক পা হেঁটে গিয়ে দশ রিঙেত-এর একটা নোট পাঁচিলের মাথায় রাখল ও।

মানস বলল, 'রিজার্ভ তো করেছি, কিন্তু স্যুইটগুলো কোথায়

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

দেবে কে জানে। আমাদের স্যুইট টপ ফ্লোরে হলে ভাল হয়, পাশাপাশি।'

'পাশাপাশি কেন?'

কৃত্রিম সন্ত্রস্ত একটা ভাব নিয়ে চারদিকে চোখ বুলাল মানস। 'আমি বিপদে পড়লে আপনি যাতে সাহায্য করতে পারেন, বুঝলেন না!' গাড়ির দিকে পিছন ফিরে এগোচ্ছে ওরা, আবার ডাকল ছেলেটা।

'আমি খুব কম পয়সায় কাজ করি, মিস্টার,' বলল সে। 'আপনারা যা দেবেন। পাহাড়ের ওপর মন্দিরে নিয়ে যাব, হাতির পিঠে চড়াব, বোটে কোরে মাছ ধরতে নিয়ে যাব...'

'তোমাকে বললাম না আমাদের গাইড লাগবে না!' বলল রানা।

'ও। ঠিক আছে,' বলে পাঁচিলের মাথা থেকে নোটটা না নিয়েই ঘুরে দাঁড়াল সে, আরেকদিকে চলে যাচ্ছে।

'এই, টাকাটা তোমাকে বকশিশ দিয়েছি।'

মাথা নাড়ল ছেলেটা। হাঁটা থামায়নি। 'বকশিশ নিই না, সার।'

'এই থামো,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'আমাদের একটু ভুল হয়েছে। তোমাকে দিয়ে আমরা বোধহয় অন্য একটা কাজ করাতে পারি।'

সমর্থন করল মানস। 'দারুণ আইডিয়া!'

'আমরা একজনকে খুঁজছি,' বলল রানা।

'বলুন না, কে সে? দেখতে কেমন?' আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল ছেলেটা, চট করে একবার দেখে নিল পাঁচিলের মাথায় পড়ে থাকা নোটটা।

'মাথার চুল জুলফির কাছে একটা দুটো পাকা,' বলল রানা। 'আমার গায়ের রঙ। বাঙালী, শাড়ি পরেন। চোখে সরু ফ্রেমের চশমা আছে। দেখলে মনে হবে এখুনি বুঝি ১৭-র নামতা বলতে বলবেন। তবে তোমার ভয় নেই, তোমাকে অঙ্ক ধরবেন না। ভদ্রমহিলা কয়েকজন থাই লোকের সঙ্গে আছেন। ওদের কয়েকজনের নাম – চক্রি চুয়ান, হো টাকসিন, তাইম আনন্দ, ফিবান সংগত। চক্রি চুয়ানের ডান কপালের পাশে একটা লাল জরুল আছে। তবে আমরা চাই না, ওরা জানুক ওদের খুঁজছি – চমকে দিতে চাই আসলে, বুঝলে?'

পাঁচিলের মাথা থেকে টাকাটা নিয়ে পকেটে ভরল ছেলেটা। 'এঁরা যদি এখানে থাকেন, আমি ঠিকই পেয়ে যাব।' ঘুরে ছুটল সে।

রিসেপশনে এসে খাতায় সই করল ওরা, তারপর যে যার স্যুইটের চাবি নিল। ওদের স্যুইটগুলো এগারোতলায়।

শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল রানা। আসবার পথে গাড়ি থামিয়ে কিছু কাপড়চোপড় কিনেছে, সেগুলো পরল। হোটেলে ঢুকেই একবার ফোন করেছে শেরাটনে, আবার ফোন করল লাবণীর স্যুইটে। ফেরেনি সে।

রানা ভাবল, লাবণী কি কোনও সূত্র পেয়েছে? ও কোটা বাহারুতে আসছে জানে সে, তারপরেও হোটেলে না থাকার কী কারণ থাকতে পারে!

মানসকে নিয়ে লাঞ্চ খেতে তাজের একটা রেস্তোরাঁয় চলে এল রানা, পাঁচতলায় সেটা।

লং ড্রাইভের পর দুজনেরই প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। বেশ সময় নিয়ে খাচ্ছে ওরা। শুরু করবার খানিক পর একটা মোবাইল রিসিভার নিয়ে এল ওয়েটার, রানার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার ফোন, সার। হোটেল শেরাটন থেকে।'

রিসিভারটা নিয়ে কানে ঠেকাল রানা। 'হ্যালো?'

'মাসুদ ভাই, আমি ফিরেছি,' লাবণীর পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, একটু যেন উত্তেজিত। 'একটা জরুরি কাজে ব্যস্ত ছিলাম...'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

‘তুমি খেয়েছ?’ জানতে চাইল রানা, ফোনে কাজের কথা নিয়ে আলাপ করতে চাইছে না।

‘হ্যাঁ, বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি।’

‘ক’তলায় তুমি? স্যুইট নাম্বার বলো।’

‘সেকেন্ড ফ্লোর, একশো এক,’ বলল লাবণী।

‘অপেক্ষা করো,’ বলল রানা। ‘লাঞ্চ শেষ করেই আসছি আমি।’ রিসিভারটা ট্রেতে রাখল রানা। ‘ধন্যবাদ।’

‘আপনার এজেন্ট তা হলে অবশেষে পৌঁছেছেন?’ জিজ্ঞেস করল মানস।

‘হ্যাঁ।’

‘কোটা বাহারুতে আগে কখনও এসেছেন আপনি?’ ফ্রায়েড শ্রিম্প চিবাতে চিবাতে জানতে চাইল মানস।

‘কয়েকবার,’ বলল রানা। ‘এখান থেকে দক্ষিণে খ্রিশ্চান জেলেদের কয়েকটা গ্রাম আছে, ছবির মত সুন্দর। ওরা দেশী মদ তৈরি করে, বিক্রির জন্যে নয়, নিজেদের জন্যে। খুবই ভাল।’

‘তা হলে তো একবার সময় করে যেতেই হয় ওখানে।’ রুমালে মুখ মুছে চেয়ারে হেলান দিল মানস, তৃপ্তির সঙ্গে হাত বুলাচ্ছে দাড়িতে।

টেবিল পরিষ্কার করবার পর কফি দিয়ে গেল ওয়েটার। নিজের কাপ শেষ করে বিল মেটাল রানা।

মানস বলল, ‘আপনি তো এখন আপনার এজেন্টের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন শেরাটনে। আমি ব্যস্ত থাকব ফোন নিয়ে, কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ঠিক আছে, দাদা, বিকেলে দেখা হবে।’

মাথা ঝাঁকিয়ে টেবিল ছাড়ল রানা, মানসের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বেরিয়ে এল রেস্তোরাঁ থেকে।

এলিভেটরে চড়ে নীচে নামল ও। তাজ থেকে বেরিয়ে এসে দু-আড়াইশো গজে হেঁটে চলে এল হোটেল শেরাটনে। রিসেপশনিস্টকে খুব ব্যস্ত দেখে লবিতে থামল না ও, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে।

তিনতলায়, সিঁড়ির পাশের স্যুইটটাই একশো এক নম্বর। করিডরে এখনও ওঠেনি, ল্যান্ডিঙেই রয়েছে, দরজায় ১০১ লেখা দেখে নক করতে যাচ্ছে ও। হঠাৎ কবাট একটু ফাঁক মনে হলো। চাপ দিতে দেখল খুলে যাচ্ছে। স্যুইটের ভিতর থেকে খসখসে আওয়াজ ভেসে আসছে।

ওর জন্য খুলে রেখেছে লাবণী?

ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠে কবাটটা পুরোপুরি খুলে ফেলল রানা। স্যুইটের অপরদিকে কোথাও আরেকটা দরজা আস্তে করে বন্ধ হলো। ও ভাবল, স্যুইটে ঢোকার জন্য করিডরের দিকে আরেকটা দরজা আছে?

দ্রুত ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা, পিছনে হাত নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে দিল দরজাটা। এটা লিভিং রুম। পাশেরটাই বেডরুম। দোরগোড়া থেকে লাবণীকে দেখতে পেল ও।

চেয়ারে কাত হয়ে বসে রয়েছে লাবণী, পিঠের বাম দিকে একটা ছোরার কারুকাজ করা হাতলটাই শুধু বেরিয়ে আছে বাইরে।

[প্রথম খণ্ড শেষ]

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

মাসুদ রানা
দুরন্ত ঈগল ২
কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

মালয়েশিয়া। মালয় পেনিনসুলা পুব উপকূল, কোটা বাহারু। জায়গাটা থাই সীমান্ত থেকে বেশি দূরে নয়।

হোটেল শেরাটন ইন্টারন্যাশনাল। দুপুর দুটো। তিনতলা, সিঁড়ি সংলগ্ন একশো এক নম্বর স্যুইট।

রানা এজেন্সির ব্যাংকক শাখার প্রধান লাবণী সামাদের স্যুইট এটা। কদিন আগে পর্যন্ত ওই শাখার প্রধান ছিল ইমরুল কায়েস। থাইল্যান্ডের হাট খোয়াই-এ থাই টং তাকে খুন করবার পর ওই পদের দায়িত্ব লাবণীকে দিয়েছে মাসুদ রানা।

কিন্তু এই মুহূর্তে নিঃসাড় লাবণীর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে রানা। তীব্র ব্যথায় টনটন করছে ওর বুকের ভিতরটা।

কাত হয়ে চেয়ারের হাতলে আটকে আছে লাবণীর শরীর, পিঠ থেকে বেরিয়ে আছে বড় একটা ছোরার অলঙ্কৃত হাতলটা।

রানা শুধু লাবণীর গলায় হাত দিয়ে পালস দেখবার জন্য থামল। তার সাদা ব্লাউজ তাজা লাল রক্তে ভিজে গেছে। রক্তের স্রোত পরনের সিল্ক শাড়িটাকেও ভিজিয়ে দিচ্ছে। যতই অবিশ্বাস্য ও নির্মম মনে হোক, লাবণী বেঁচে নেই; তবে প্রাণের স্মৃতি নিয়ে এখনও গরম হয়ে রয়েছে তার শরীরটা।

এজেন্সির প্রধান হিসাবে তার প্রতি রানার একটা দায়িত্ব তো আছেই, তাছাড়াও এই অ্যাসাইনমেন্টে এসে মেয়েটির সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা জন্মে যাওয়ায় মনটা আবেগপ্রবণ হয়ে উঠতে চাইছে।

নিজেকে শক্ত করল রানা, চেহারায় তার ছাপ পড়ায় নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে মুখটা। কে আর ওর চেয়ে ভাল জানে যে কঠিন এই পেশা শোকাভিভূত হওয়ারও সময় দেয় না।

দ্রুত কামরা থেকে বেরুবার সময় সেল ফোনের বোতাম টিপে সামান্য দায়িত্বটুকুই শুধু সারতে পারল রানা। রিসেপশন হয়ে হোটেলের সিকিউরিটি সেন্টারে খবর চলে গেল, তারা পুলিশ ডাকবে। তারপর ওর এজেন্সির কুয়ালালামপুর শাখায় ফোন করে জানিয়ে দিল কী হয়েছে, কী করতে হবে– লাশটা কফিনে পুরে প্লেনে করে পাঠিয়ে দিতে হবে ঢাকায়।

একটু আগে একটা দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেয়েছে, দ্রুত সেটার দিকে এগোল রানা। হোটেলের করিডরে বেরিয়ে এল। ডানদিকে কেউ নেই, শেষ মাথায় এলিভেটর। বাম দিকেও কেউ নেই, শেষ মাথায় দরজা। সেটা ভিতর দিক থেকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ছুটল রানা। লম্বা করিডর পার হয়ে দরজার কাছে পৌঁছাল। ওটার মাথায় লেখা রয়েছে, 'সার্ভিস স্টেয়ার'। কবাটে ধাক্কা দিতেই খুলে গেল সেটা, সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল দরজাটা সিঁড়ির দিক থেকে বন্ধ করবার কোনও ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

প্রতিবার তিনটে করে ধাপ টপকে নীচে নামল ও। আঙিনা পেরিয়ে সরু একটা গলিতে বেরিয়ে এল। গলির একটা দিক ধনুকের মত বেঁকে চোখের আড়ালে হারিয়ে গেছে, আরেকদিক মিশেছে ব্যস্ত মেইন রোডের সঙ্গে।

প্রায় অন্ধকার গলি থেকে মেইন রোডের কড়া রোদের দিকে চেয়ে চোখটা ধাঁধিয়ে গেছে রানার। পলকের জন্য দেখতে পেল, গলি থেকে মেইন রোডে বেরিয়ে যাচ্ছে হালকা নীলরঙা স্কার্টের একটা প্রান্ত। মেয়েটি ব্লাউজ পরেছে, নাকি শার্ট, ভাল করে দেখবার সুযোগ হলো না। রঙটা সম্পর্কেও নিশ্চিত নয় ও, একবার মনে হলো সাদা, আবার মনে হলো নাকি হলুদ?

www.MurchOna.com

মেইন রোডে যেমন ট্রাফিকের জ্যাম, ফুটপাথে তেমনি মানুষের ঠেলাঠেলি। ভিড়ের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোচ্ছে রানা, চোখ রেখেছে মেয়েটার দিকে।

আকাশী রঙের স্কার্ট আর টি-শার্ট পরে আছে মেয়েটা। দ্রুত রাস্তা পার হলো সে, তবে মনে হলো না রানার কাছ থেকে পালাচ্ছে। তারপর একটা বাঁক নিল। বাঁক নেওয়ার সময় গলাটা একটু লম্বা করল, যেন সামনের কাউকে দৃষ্টিপথে ধরে রাখবার চেষ্টায়।

রানা আন্দাজ করল, মেয়েটিও কাউকে ফলো করছে।

রাস্তা পেরিয়ে বাঁক ঘোরার পর বোঝা গেল, ওর ধারণা মিথ্যে নয়। বেশ কিছুটা সামনে আরেকটা মেয়েকে দেখতে পেল রানা, যাকে ওর সামনের মেয়েটি অনুসরণ করছে। এ-ও নীলচে স্কার্ট আর টি শার্ট পরেছে। দলবেঁধে বেড়াতে বেরুনো পরিবারগুলোর ভিতর মিশে গেছে সে, আচরণে শান্ত স্বাভাবিক একটা ভাব ধরে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

এখনও বেশ খানিক দূরে, এবং ওর দিকে পিছন ফিরে থাকা সত্ত্বেও, এই দ্বিতীয় মেয়েটাকে চিনতে পারল রানা।

দোই ইনথাননে উত্তরা উৎকর্ণার রেশমকালো চুল ছিল মাথার পিছনে মস্ত একটা খোঁপায় আটকানো, এখন একজোড়া মোটা বেণী হয়ে কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে। তার হাঁটার মধ্যে দৃঢ়তা আছে, আছে নিশ্চিত একটা ভাব ও ছন্দ– রানার সন্দেহ হলো, এ-সবই নার্ভাসনেস লুকানোর চেষ্টা। একটু খুঁটিয়ে লক্ষ করতেই বুঝতে পারল, যে-কোনও কারণেই হোক তটস্থ হয়ে আছে সে। লোকজন ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে তার দিকে। তারা দেখছে– গর্বিত ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে যেন কোনও রাজকন্যা!

রানার মনে পড়ল, কোনও এক রাজারই মেয়ে বটে উত্তরা!

হাঁটার গতি কমিয়ে এনে প্রথম মেয়েটার পিছনে থাকছে রানা, তবে উত্তরার উপরও চোখ রাখছে।

দুজনের মধ্যে লাবণীকে কে খুন করেছে রানা জানে না। তবে উত্তরার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও অপরাধ বোধ আছে, তা না হলে পিছনের মেয়েটিকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করছে কেন?

থাই কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট উত্তরা। নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না, তবে লক্ষণ দেখে রানার মনে হচ্ছে সে-ই খুন করেছে লাবণীকে। শত্রুর সংখ্যা কি বাড়ল তা হলে? থাই কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স নীরব, অসহায় দর্শকের ভূমিকা ত্যাগ করে অশুভ কোনও শক্তিকে সাহায্য করছে?

আরেকটা বাঁক নিয়ে কোটা বাহারু সৈকতের দিকে ঘুরে যাওয়ার পর উত্তরার কাঁধ দুটো যেন উত্তেজনায় আড়ষ্ট হয়ে উঠল। মাথাটা একদিকে একটু কাত হলো, কী যেন শোনার চেষ্টা করছে। কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিকে একবারও তাকাল না, তবে ওর চঞ্চল ভাবই বলে দিচ্ছে ও জানে, পিছু নেওয়া হয়েছে।

প্রথম মেয়েটির পিছু নিয়ে স্বাভাবিক ভাবে রাস্তা পার হলো রানা, দুজনের মাঝখানের দূরত্ব একটু কমিয়ে আনল।

হাঁটার গতি আবার বাড়িয়ে দিল উত্তরা। ঢালু রাস্তা ধরে ফিশ মার্কেটের দিকে যাচ্ছে ও। শুধু মাছের বাজার নয়, পাথর দিয়ে বাঁধানো সাগরতীরে প্রচুর দোকান-পাটও আছে।

যে মেয়েটি ওর পিছু নিয়েছে তার বয়স হবে পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির মত লম্বা, স্বাস্থ্য ভাল। পা দুটো অত্যন্ত শক্তিশালী, হাঁটছে অনায়াস একটা ভঙ্গিতে।

একজন পেইন্টার আর তার ক্যানভাসকে ঘিরে ভিড় করেছে একদল ট্যুরিস্ট, সেই ভিড়ের ভিতর ঢুকে পড়ল উত্তরা। তার কাছাকাছি থাকার জন্য পিছু নেওয়া মেয়েটাও কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে লোকজনকে সরিয়ে এগোবার চেষ্টা করছে।

ভিড় থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি একটা নটিকল স্টোর দেখতে পেয়ে ঝট্ করে ভিতরে ঢুকে পড়ল উত্তরা।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

পিছিয়ে পড়ল রানা, তারপর একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

অপর মেয়েটা ভিড়ের ভিতর দাঁড়িয়ে পড়েছে। তরুণ পেইন্টার নিজের ছবির প্রসঙ্গে দর্শকদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। তার দিকে মুখ করে থাকলেও, নটিকল স্টোরের দরজার দিকে তাকিয়ে উত্তরার বেরিয়ে আসবার অপেক্ষায় রয়েছে সে।

নটিকল স্টোর থেকে বেরুবার আরেকটা দরজা থাকতে পারে ভেবে লোকজনের ভিড় এড়িয়ে ওটার পিছনদিকে চলে এল রানা।

সাগরের উপর ঝুলে থাকা পাহাড়ের কারনিস থেকে বিকিনি পরা মেয়েরা লাফ দিয়ে পড়ছে পানিতে, প্রায় সবাই শ্বেতাঙ্গ। কাছাকাছি সৈকতে শুয়ে-বসে রোদও পোহাচ্ছে অনেকে।

নটিকল স্টোরের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল উত্তরা। রাস্তা পার হয়ে হনহন করে হাঁটছে সে, পিছু নেয়া মেয়েটার কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে চায়।

আবার তার পিছু নিল রানা।

সামনে অ্যান্টিকস, জুয়েলারি, পটারি আর উডকার্ভিং-এর সারি সারি দোকান। ডিসপ্লে শো-কেসে কত কী সাজানো। উত্তরার উপর একটা চোখ রেখে ওগুলো দেখতে দেখতে এগোচ্ছে রানা। মেয়েটির পদক্ষেপে এখনও দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্ট, তবে কাঁধ দুটো আড়ষ্ট হয়ে আছে–পিছন ফিরে না তাকালেও ও জানে তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে।

ভাব দেখে রানার মনে হলো, গন্তব্যের কাছাকাছি চলে এসেছে উত্তরা।

অবশেষে একটা বুকস্টোরে ঢুকল ও। দোকানের দোরগোড়া পেরুবার সময় একটা ডোরবেল বেজে উঠল। কাঁচ ঘেরা শেলফে মহাথির মোহাম্মদের উপর লেখা কয়েকটা বই সাজানো।

দোকানের পাশ ঘেঁষে শান্তভাবে হেঁটে যাচ্ছে রানা। জানালা দিয়ে দেখল কাউন্টারের পিছনে দাঁড়ানো দোকানদারের সঙ্গে কথা বলছে উত্তরা। কাছাকাছি নিউজ স্ট্যান্ড থেকে দৈনিক পত্রিকা ডেইলি সান কিনল ও, মুখের সামনে ওটা মেলে ধরে আবার বুকস্টোরের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল।

জানালার ভিতরে কোথাও উত্তরাকে দেখা যাচ্ছে না। দোকানটা বেশ বড়, হয়তো সরে অন্য কোনও দিকে চলে গেছে।

হনহন করে হেঁটে বুকস্টোরের পিছন দিকে, সরু একটা গলির ভিতর চলে এল রানা। এদিকের দরজা বন্ধ দেখল ও। এটা যেহেতু কানাগলি, দু'পাশে বাড়ির দেয়াল, বেরুলে ওকে পাশ না কাটিয়ে উপায় ছিল না উত্তরার।

আবার বুকস্টোরের সামনে ফিরে এল রানা। সানগ্লাস খুলে একজোড়া রিমলেস চশমা পরল, কাঁধ দুটো একটু নিচু ও ঢালু করল, তারপর দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

'ইয়েস, সার? বলুন, কী বই খুঁজছেন।' বুকস্টোরের মালিক ছোটখাট একজন লোক, বেশ বয়স হয়েছে, চোখের দৃষ্টি যেন বহুদূরে নিবদ্ধ। লোকটা থাই কি না নিশ্চিত হতে পারছে না রানা। মালয়েশিয়া আর থাইল্যান্ডের লোকের চেহারা অনেকটাই মেলে।

'মালয়েশিয়ার ইতিহাস সম্পর্কে একটা বই দরকার আমার,' বলল রানা, বড়সড় দোকানটার চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে। 'লেখাটা ভাল হওয়া চাই, শুধু গাদা গাদা তথ্য থাকলেই চলবে না। আর, আধুনিক যুগও যেন কাভার করে।'

'ভেরি গুড, সার। আমার কাছে আছে সেরকম বই।'

লোকটার পিছু নিয়ে শেলফের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা, সাজিয়ে রাখা বইগুলোর শিরদাঁড়ায় চোখ বুলাচ্ছে। 'একটু আগে সুন্দরী এক ভদ্রমহিলা ঢুকেছেন আপনার দোকানে,' বলল রানা, তারপর জানতে চাইল, 'কোথায় গেলেন, তাঁকে দেখছি না যে?'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

মাথার এলোমেলো চুল হাত দিয়ে ঠিকঠাক করছে।

'জী? কিছু বললেন?'

'আমার ধারণা তিনিও মালয়েশিয়ান হবেন। হয়তো তার কাছ থেকেও দেশটা সম্পর্কে অনেক কিছু জানার আছে আমার।'

চোখে-মুখে সবিনয় একটা ভাব ধরে রেখে রানার কথা না শোনার ভান করছে দোকানদার, শেলফ থেকে একটা বই টেনে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল ওর দিকে। 'এই নিন, মালয়েশিয়ার ইতিহাসের ওপর লেখা এই বইটাই সবচেয়ে নামকরা,' বলল সে।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বলল রানা। 'প্যাকেটে ভরে মেমো করুন। আমি শুধু এক মিনিটের জন্যে আপনার রেস্টরুমটা ব্যবহার করতে চাই, হাত-মুখ ধোব।'

'সার!'

ফাঁক গলে কাউন্টারের পিছনে চলে গেল রানা, তারপর সরু ও অন্ধকার প্যাসেজে বেরিয়ে দ্রুত এগোল। ওর পিছু নিয়েছে দোকানদার, প্রতিবাদের সুরে বলছে, 'আরে, কী আশ্চর্য, এ আপনি কী করছেন!'

একটা দরজা খুলল রানা। ভিতরে শুধু বই আর বই, কারও লুকাবার জায়গা নেই।

'প্লিজ, সার! আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি...'

দ্বিতীয় দরজাটা বাথরুমের। এটা খালি। তারপর দোকানের সামনের দরজা খুলল কেউ, ভেসে আসা ঘণ্টির আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল রানা।

দোকানদারকে ধাক্কা দিয়ে পাশ কাটাল রানা, দ্রুত ফিরে এল দোকানে। দুই হাতে প্যাকেট নিয়ে বুকশেলফের দিকে এগোচ্ছে এক মোটাসোটা মহিলা।

লোকটাকে আবার ধাক্কা দিয়ে প্যাসেজের শেষ মাথায় চলে এল রানা। পিছনের দরজার ছিটকিনি খুলে একটা সরু গলির দু'পাশে তাকাল। কেউ কোথাও নেই। তারপর হঠাৎ করেই বুঝতে পারল কী ঘটেছে।

দরজা খুলে মোটাসোটা মহিলা যখন ভিতরে ঢুকল, তখনই বেরিয়ে গেছে উত্তরা। দোকানের ভিতরেই কোথাও লুকিয়ে ছিল আড়ালে।

এখন আর ওকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, এতক্ষণে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে।

নিজের ব্যর্থতায় হতাশ বোধ করল রানা। লাবণীর সম্ভাব্য খুনিকে পালিয়ে যেতে দিয়েছে সে।

হাত দিয়ে কাপড়চোপড় ঝেড়ে চশমাটা ঠিকমত চোখে আটকাল রানা। 'কত যেন দাম বললেন বইটার?' জিজ্ঞেস করল দোকানদারকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোকটা, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ঘাম মুছল কপালের, তারপর দাম বলল।

কাউন্টারে একশো রিংগিত-এর তিনটে নোট রেখে বইটা নিল রানা, দোকানদারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'রাজকন্যা যদি ফিরে আসেন, তাঁকে বলবেন শহরে মাসুদ রানাকে দেখা গেছে। তাজমহলে পাওয়া যাবে তাকে।'

সূর্য পাটে বসেছে, বুকস্টোর থেকে শেষ বিকেলের নিস্তেজ রোদে বেরিয়ে এল রানা। চোখ থেকে রিমলেস চশমাটা খুলে পকেটে রাখল ও, বাদামী কাগজে মোড়া বইটা বগলদাবা করে হোটেল তাজমহলের দিকে ফিরছে।

ইতোমধ্যে বিদেশি পর্যটকদের ভিড় কমে গেছে, আবার সন্ধের দিকে বাড়বে, মোমের আলোয় ওয়াইন সহযোগে ডিনার খেতে বেরুবে ঝাঁকে ঝাঁকে।

কিন্তু তাজমহল ইন্টারন্যাশনালের সামনে ছোটখাট একটা ভিড় দেখতে পেল রানা। ফুটপাথ ঘেঁষে পুরানো একটা অ্যামবুলেন্স পার্ক করা রয়েছে, ওটার পিছনের দরজা হাঁ-হাঁ

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

করছে।

সাদা কোট ও মাস্ক পরা অ্যাটেনড্যান্টরা একটা স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে এল। ওটার উপর শোয়ানো মানুষটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা, শুধু এক পাটি জুতোর অংশবিশেষ বেরিয়ে আছে চাদরের বাইরে। রানা বিশেষভাবে লক্ষ করল, বেশ ছোটখাট একটা শরীর।

ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন ফিসফাস করছে, বেশিরভাগই হোটেলের স্টাফ আর গেস্ট। সবাই তারা বিষণ্ন ও উদ্বিগ্ন।

একজন স্থানীয় লোককে রানা বলতে শুনল, 'হার্ট অ্যাটাক।'

তার সঙ্গী লোকটা মাথা নেড়ে বলল, 'তুমি কচু জানো! খুব বেশি মদ আর সেক্স! এ-সব করতেই তো এখানে আসে ওরা।' লাশের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল দুজনেই।

সাইরেন বাজিয়ে চলে গেল অ্যামবুলেন্স।

লবিতে ঢুকে রিসেপশনে চলে এল রানা, জানতে চাইল, 'স্ট্রেচারে তুলে কাকে ওরা নিয়ে গেল বলুন তো?'

'কী?' তরুণ ভারতীয় ক্লার্ক ঘামছে। হোটেলে কেউ মারা গেলে ব্যবসায় ধস নামে।

'ভদ্রলোকের নাম মানস ঘোষ নয় তো?' জানতে চাইল রানা, পায়ের এক পাটি জুতো একটু চেনা চেনা লেগেছে ওর।

কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল তরুণ। তারপর একটা ঢোক গিলে বলল, 'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি– ইয়েস, সার, ওই ভদ্রলোকই। বিরাট একটা ট্র্যাজেডি।'

তারপর অন্যদিকে ফিরে ফিসফিস করল সে, রানা যাতে শুনতে না পায়, 'মরার আর জায়গা পেল না, এত থাকতে আমাদের হোটেলে!'

দুই

অদৃশ্য কারও উপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। কাউন্টারে জোরে একটা কিল মারল রানা। লাফ দিয়ে উঠল তরুণ ক্লার্ক, রানার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল।

'কী দুর্ভাগ্য দেখুন না, সার, তাঁকে চেনে এমন কাউকে আমরা পেলাম না,' বলল সে। 'ব্যাপারটা স্রেফ অ্যাক্সিডেন্ট। আমি আপনাকে হানড্রেড পারসেন্ট নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি: এখানে নিরাপত্তা বা শান্তি-শৃঙ্খলায় কোনও রকম বিঘ্ন ঘটবে না...'

ঘুরল রানা, লবি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

'সার, বিলিভ মি! আমাদের গেস্টরা...'

আবার ঘুরল রানা। অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে ওর, মানস ঘোষ মারা যেতে পারে না। 'ভদ্রলোককে কোথায় নিয়ে গেল জানেন?' ঠাণ্ডা সুরে জিজ্ঞেস করল ও।

'মিস্টার ঘোষকে? হাসপাতালে... মর্গে... ঠিক জানি না, সার। তাতে কি কিছু আসে যায়?'

কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে রানা, গুণ্ডাদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর পর ওর সেই অবাক চোখে তাকিয়ে থাকা। 'হ্যাঁ,' বলল ও। 'আমার আসে যায়।'

রানার দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল ক্লার্ক। 'ঠিক আছে, সার,' অবশেষে বলল সে, রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। 'কতটুকু কী জানা যায় দেখছি আমি।' ক্রেডল থেকে টেলিফোনের রিসিভার তুলল সে।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

অলস পায়ে লবির দরজার দিকে এগোল রানা, অন্যমনস্ক, তবে জানে কোনও তথ্য পেলে ওকে ডাকবে ক্লার্ক।

কাঁচ লাগানো দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। সঙ্গে সঙ্গে চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল। মুখ তুলে কার পার্কিং এরিয়ার দিকে তাকাল ও। দেখল ওদিক থেকে কে যেন হাত নাড়ছে। ওর দিকে তাকিয়ে না?

দিনের আলো এখনও সবটুকু মুছে যায়নি, তাই কিশোর ছেলেটিকে চিনতে পারল ও। ওদের গাইড হতে চেয়েছিল সে। রানা দশ রিংগিত দিলেও, বকশিশ নিতে রাজি হয়নি। অগত্যা তাকে একটা কাজ দিয়েছিল ও। বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরার চেহারা ও সম্ভাব্য পরিচ্ছদের বর্ণনা দিয়ে বলেছিল, তিনি একদল থাই লোকের সঙ্গে থাকতে পারেন।

নিচু পাঁচিলের ওপারে, অর্থাৎ রাস্তায় দাঁড়িয়ে রানার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে ছেলেটা। একটা হাত তুলে তাকে হোটেলের মেইন গেটটা দেখিয়ে দিল রানা. তারপর নিজেও ধাপ ক'টা টপকে গাড়ি-পথ ধরে এগোল সেদিকে।

গেট দিয়ে ফুটপাথে বেরিয়ে এল রানা।

ছেলেটাও গেটের কাছে পৌঁছে গেছে। দ্রুত হেঁটে আসায়, কিংবা উত্তেজনায়, সামান্য হাঁপাচ্ছে। 'ওদেরকে পেয়েছি আমি, সার!' বলল সে।

ভ্রূ কোঁচকাল রানা।

'বাঙালি ভদ্রমহিলা, আপনি যাঁর কথা বলেছিলেন,' বলল ছেলেটা। এক পা পিছাল, রানাকে উৎসাহিত হতে না দেখে অনিশ্চয়তায় ভুগছে। 'থাইরা... ভাবলাম আপনি...'

কী যেন ভাবল রানা, তারপর শ্রাগ করে ছেলেটার কাঁধে একটা হাত রাখল। 'কোথায় তারা?'

'আমার সঙ্গে আসুন, দেখিয়ে দিচ্ছি,' বলে ফুটপাথ ধরে হাঁটা ধরল ছেলেটা।

'তোমার নামটা যেন কী?' তার পিছু নিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি যোধন।'

মনে মনে বিস্মিত হলেও কিছু বলল না রানা। যোধন মানে যোদ্ধা, শব্দটা বাংলা অভিধানেও আছে।

রাস্তায় রাস্তায় বৈদ্যুতিক লণ্ঠন জ্বলে উঠল। দ্রুত পায়ে কাফে ও আন্টিকস-এর দোকানগুলোকে পাশ কাটাচ্ছে ওরা। হাইওয়ে ফাইভ ধরে এগোচ্ছে, তিলক দাঙ্গুন সি বিচকে পাশ কাটিয়ে এল। ডিনারের আগে বেশ কিছু দম্পতি হাঁটতে বেরিয়েছে।

'আমাদের শহর আপনার পছন্দ হয়েছে, সার?' জানতে চাইল কিশোর গাইড। 'সুন্দর সি বিচ, পাহাড়, লেক, জঙ্গল, হোটেল ফ্যাসিলিটি, সিকিউরিটি–সব মিলিয়ে দারুণ না?'

'সত্যি দারুণ,' বলল রানা। 'তবে বেশ বড় শহর। এতই বড়, তোমার একার পক্ষে নির্দিষ্ট কোনও লোককে খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।'

'হ্যাঁ, প্রচুর ট্যুরিস্ট,' সায় দিয়ে বলল যোধন। 'তবে আমার এক আংকেল পোস্টম্যান, এক আন্টি কাজ করে বিউটি শপে। আর কাজিনরা সবাই রাস্তা পরিষ্কার করে।' গর্বের সঙ্গে হাসল সে। 'কোটা বাহারু আমাদের শহর।'

'আচ্ছা,' বলে ম্লান একটু হাসল রানা। 'দুনিয়ায় তোমার তা হলে কেউ নেই।'

অবাক হলো যোধন। 'কী করে বুঝলেন?'

'সবার কথাই বলছ, শুধু মা-বাবার কথা বাদে,' বলল রানা। 'তা ছাড়া, এত কম বয়সে তোমাকে কাজ করতে হয়।'

'কাজ না করলে লেখাপড়ার খরচ যোগাবে কে? আমার মা-বাবা নেই,' বলল ছেলেটা। 'ফিশিং অ্যাক্সিডেন্ট, সার।'

'দুঃখিত,' বলল রানা।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

কাঁধ ঝাঁকাল যোধন। 'জীবন যখন যেমন, সার।'

বারো বছরের একটা ছেলের মুখ থেকে ঠিক এরকম একটা দার্শনিক কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না রানা।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে যোধন বলল, 'আমি আমার খালার সঙ্গে থাকি, সার।'

'যিনি বিউটি শপে কাজ করেন।'

'দুজন আমরা ভালই আছি,' হেসে উঠে বলল ছেলেটা। 'খালা তার চুল আগুনের মত লাল করে রাখে। উৎসবের সময় আমার গালে ড্রাগন এঁকে দেয়।'

'দুজন তোমরা খুব মজা করো।'

'তবে লেখাপড়া শিখে চায়নায় যেতে চাই আমি, অনেক বড় বিজ্ঞানী হতে চাই। আপনার কোনও ধারণা আছে, চায়না কেমন দেশ?'

'বিশাল দেশ, মহান একটা জাতি,' বলল রানা। 'এক সময় বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে ওরাই তো সবার চেয়ে এগিয়ে ছিল। ওদের ভবিষ্যৎও খুব উজ্জ্বল।'

হাইওয়ে ছেড়ে ক্রমশ উঁচু একটা সরু পথ বেয়ে উঠছে ওরা। সামনে ছোট পাহাড়, অন্ধকারে অশুভ ও বিপজ্জনক লাগছে।

'ড্রাইভওয়েটা ওপাশে,' হাত তুলে ডানদিকটা দেখাল যোধন। 'এটা শর্টকাট পথ।'

'আশপাশে আর কোনও বাড়ি-ঘর আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আর মাত্র দু'চারটে, তবে কাছেপিঠে একটাও নয়। লোকজন এদিকটায় ছুটি কাটাতে আসে। মালিকরা তো আর থাকে না, তাই বেশিরভাগ সময় খালিই পড়ে থাকে।'

'আচ্ছা,' বলল রানা। 'আমি আমার বন্ধুকে সারপ্রাইজ দিতে চাই। এই নাও।' ছেলেটার হাতে কয়েকটা নোট গুঁজে দিল ও। 'টাকা-পয়সা জমাতে শুরু করো, চিনে তুমি ঠিকই যেতে পারবে।'

'সত্যি?' প্রত্যাশায় চকচক করছে ছেলেটার চোখ দুটো।

'সত্যি।' ওর মাথার চুল একটু এলোমেলো করে দিল রানা। 'আমি জানি তোমার যুদ্ধে তুমি জিতবে, মাই সান।'

নোটগুলো উঁচু করে চাঁদের আলোয় ধরল যোধন। 'এত টাকা!' আনন্দে হেসে উঠল সে। 'আপনার অনেক বড় কাজ করে দিয়েছি?'

'অ-নে-ক ব-ড়,' বলল রানা। 'এবার শহরে ফিরে গিয়ে পুলিশকে খবর দাও। আমার কথা বলবে–বাংলাদেশী একজন এজেন্ট। আর বলবে–থাই থান্ডার। কী বলবে?'

'বাংলাদেশী একজন এজেন্ট আর থাই থান্ডার!' চোখ দুটো গোল গোল হয়ে উঠল যোধনের, অর্থাৎ সে-ও জানে থাই থান্ডার মাফিয়াদের একটা সংগঠন।

'গুড। বলবে এদিকে থাই থান্ডারের একটা আস্তানা আছে। ভাল করে বুঝিয়ে দেবে কোথায়। ওরা এসে আমাকে পেতেও পারে, তবে সম্ভাবনা কম। এত কথা মনে রাখতে পারবে তুমি?'

'ইয়েস, সার!' হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে ওঠায় যোধনের মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে।

'তা হলে দৌড় দাও!' তার পিঠ মৃদু চাপড় দিল রানা।

ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে যোধন, ঝোপ ও গাছপালার ভিতর দিয়ে ছুটছে, একসময় বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেল।

ঘুরল রানা, সরু পথ ধরে আবার উঠছে। একটু পরেই গাছপালার ফাঁক দিয়ে সামনে একটা বাড়ির ম্লান আলো দেখতে পেল ও।

হাঁটার গতি কমাল, নিশাচর পাখি ও ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনছে। বাড়ির বাইরে নিশ্চয়ই কোথাও পাহারা বসানো হয়েছে। সিঙ্গাপুরে বেশ কিছু লোককে হারানোর পর থাই থান্ডারের

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

লোকবল কম হতে পারে, তাই বলে নিজেদেরকে অরক্ষিত রাখবে না ওরা।

সামনের পথ থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল, যেন সরু ডাল ভাঙল। তারপর বারুদ ও তামাকের ক্ষীণ গন্ধ ঢুকল নাকে, দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরিয়েছে কেউ।

সাবধানে এগোচ্ছে রানা, নরম পায়ে হাঁটছে। ডালগুলোর পাতা ঘষা খাচ্ছে ওর কাপড়ে।

সেন্ট্রি লোকটা দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা পাইন গাছের তলায়। চওড়া শাখাগুলোর নীচে সে-ও যেন ছোট একটা গাছ। বুকের কাছে আড়াআড়ি ভঙ্গিতে ধরে আছে একটা একে-ফোরটিসেভেন। মুখে সিগারেট।

ট্রেইল থেকে সরে এল রানা। প্রতিবার এক পা করে নিঃশব্দে এগোচ্ছে। হঠাৎ কাছাকাছি কোথাও থেকে একটা পেঁচা ডেকে উঠল। ভয় পেয়ে দু'তিনটে নিশাচর পাখি ডানা ঝাপটে উড়ে গেল।

ঘুরল সেন্ট্রি, রানার দিকে পিছন ফিরল। আরেকটা পেঁচা ডাকল, বোধহয় সাড়া দিচ্ছে।

সাবধানে এগিয়ে চলেছে রানা।

ছ'ফুট দূরে সেন্ট্রি তার সিগারেট মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে আগুন নেভাল।

লাফ দিল রানা।

ঝট করে ঘাড় ফেরাল সেন্ট্রি।

লোকটার গলায় একটা হাত পেঁচাল রানা, জোরে ঝাঁকি দিয়ে পিছিয়ে আনল। পচে নরম হয়ে থাকা পাতার স্তূপে পড়ল একে-ফোরটিসেভেন। হাঁপিয়ে ওঠায় প্রথমে রানার হাতটা গলা থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল সেন্ট্রি, ব্যর্থ হয়ে কনুই গাঁথল ওর পেটে। তার ট্রেনিং মন্দ নয়।

আবার ঝাঁকি দিল রানা, অনুভব করল উত্তেজনা আর নড়াচড়ায় ওর হাতের পেশিতে ঢেউ উঠছে।

কয়েক সেকেন্ড হাত-পা ছুঁড়ল সেন্ট্রি, তারপর নেতিয়ে পড়ল; জ্ঞান হারিয়েছে। ধীরে ধীরে তাকে মাটিতে নামাল রানা। তার গলায় বাঁধা রুমালটা খুলল ও, গুঁজে দিল মুখের ভিতর। পকেট থেকে নিজের রুমালটা বের করে মুখে বাঁধল, জ্ঞান ফেরার পর প্রথম রুমালটা যাতে ভিতর থেকে বের করতে না পারে।

লোকটার বেল্ট দিয়ে তার পা দুটো বাঁধা হলো। পকেট থেকে একপ্রস্থ নাইলন রশি বের করে কাটল রানা, সেন্ট্রিকে উপুড় করল, তারপর হাত দুটো এক করে বাঁধল। ওর উপস্থিতির কথা এখন আর কাউকে জানাতে পারবে না সে।

তাকে টেনে খানিকটা দূরে আনল রানা, তারপর ঘন ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর ফেলে রাখল। থেঁতলানো পাইন কাঁটার গন্ধে বাতাস ভরে উঠেছে। নিঃশব্দ পায়ে পাইনগাছগুলোর দিকে ফিরছে ও, যেখানে দাঁড়িয়ে ডিউটি দিচ্ছিল সেন্ট্রি।

'টাকসিন!' গাছপালার ভিতর থেকে নরম সুরে ডাকল কেউ। নিশ্চয়ই আরেকজন সেন্ট্রি। 'টাকসিন! কোথায় তুমি? কাছে এসো, সিগারেট ধরাই।'

জায়গামত পৌঁছে ওত পেতে অপেক্ষায় থাকল রানা।

'টাকসিন!' আবার ডাকল লোকটা, গলার স্বরে সামান্য উদ্বেগ।

পায়ের আওয়াজ অস্পষ্ট, চুপিসারে এগোবার চেষ্টা করছে দ্বিতীয় সেন্ট্রি। রশির বাকি অংশটা দু'হাতে ধরে তৈরি হয়ে আছে রানা। এই লোকটাকে কাবু করা সহজ হবে না।

'এখন ইয়ার্কি মারার সময় নয়, টাকসিন!' গলার সুরে এবার রাগ। 'তাইম আনন্দ বলছে...'

রানার মনে পড়ল, বসের কাছ থেকে শোনা নামগুলোর মধ্যে হো টাকসিন ছিল। গাল কাটা জামালের স্বীকারোক্তি অনুসারে,

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

থাই থান্ডারের প্রথম দলে ছিল সে, টিম লিডার তাইম আনন্দের সহকারী হিসাবে; ওরাই তো ঢাকা এয়ারপোর্টের স্পেশাল হ্যাঙ্গারে ঢুকে ঈগল দুরন্তে আগুন দিয়েছে।

আর দ্বিতীয় দলটা বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে কিডন্যাপ করে এনেছে।

তার মানে, ভাবল রানা, থাই থান্ডারের দুই গ্রুপ এক হয়েছে এখানে।

রশিটা কাছাকাছি গাছের গুঁড়িতে, নীচের দিকে বাঁধল রানা। হামাগুড়ি দিয়ে পাঁচ ফুট দূরের গাছটার কাছে চলে এল, রশির অপরপ্রান্ত বাঁধল এটার নীচের দিকে।

পায়ের আওয়াজ থেমে গেল। হঠাৎ করে সেন্ট্রির সন্দেহ হয়েছে, জঙ্গলে তার সঙ্গী হয়তো টাকসিন নয়।

নিঃশব্দে প্রথম গাছটার কাছে ফিরে এল রানা।

বেশি দূরে নয়, শক্ত কিছুর সঙ্গে আলতোভাবে ঘষা খাচ্ছে ডালপালা। এ লোক জানে সতর্কতার সঙ্গে কীভাবে এগোতে হয়, প্রতিবার পা ফেলতে প্রচুর সময় নিচ্ছে। দিক বদলে ফেলেছে সে, টাকসিনের সেন্ট্রি পোস্টে পৌঁছাতে চাইছে বড় একটা বৃত্ত তৈরি করে।

পচা পাতার উপর পা বুলিয়ে একটা পাইনকোন পেল রানা। তারপর আরও দুটো খুঁজে নিল।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে অস্পষ্ট পদশব্দ।

অবশেষে, সেন্ট্রি যখন বাম দিকে চলে এসেছে, টাকসিনের পোস্ট থেকে প্রায় বারো ফুট দূরে, নিঃশব্দে দাঁড়াল বিসিআই এজেন্ট।

প্রথম পাইনকোন দশ ফুট দূরে, দ্বিতীয়টা পনের ফুট আর শেষটা বিশ ফুট দূরে ছুঁড়ল রানা, পালাবার সম্ভাব্য একটা সরল পথের উপর।

শত্রু লেজ তুলে পালাচ্ছে ভেবে পিছু নিল সেন্ট্রি, এখন আর সাবধানে এগোচ্ছে না– মত্ত একটা জানোয়ারের মত ছুটছে। রানাকে পাশ কাটাল সে, দুই পাইনগাছের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে।

তার জুতোয় বেঁধে গেল রশিটা। দড়াম করে আছাড় খেল, মুখ থুবড়ে পড়ল পাতার নরম স্তরে। একটা ভোঁতা চিৎকার বেরুতে শুরু করেছিল, পচা পাতায় মুখটা ডুবে যাওয়ায় থেমে গেল। তার পাঁজরে ঝেড়ে একটা লাথি কষল রানা।

একটা গড়ান দিয়ে চিৎ হলো সেন্ট্রি। দু'হাতে ধরা একে-ফোরটিসেভেন চালাল রানার মাথা লক্ষ্য করে। মাথাটা ঝট করে সরিয়ে নিল রানা, হাতের কিনারায় লেগে পিছলে যেতে দিল অস্ত্রটার আঘাত, তারপর লাফ দিয়ে চড়ে বসল সেন্ট্রির ফুলে ওঠা বুকে।

সঙ্গে সঙ্গে রানার নাক বরাবর ধাম করে মোক্ষম একটা ঘুসি চালাল লোকটা।

কান ভোঁ-ভোঁ করছে রানার। মাথা ঝাঁকিয়ে স্বাভাবিক হতে চাইছে ও, নাক ফেটে রক্ত বেরিয়ে এসেছে।

আবার ঘুসি চালাল সেন্ট্রি।

এবার কবজিটা মাঝপথে ধরে ফেলল রানা, ওর নীচে ছায়ায় থাকা মুখটার দিকে তাকিয়ে আছে। সেন্ট্রির ঠোঁট সরে গেল, অন্ধকার জঙ্গলে আইভরির মত জ্বলজ্বল করছে তার দাঁত।

দুজন যোদ্ধা এক মুহূর্ত ওভাবেই স্থির হয়ে থাকল, যেন শক্তি ও দৃঢ়তার প্রতিযোগিতা চলছে।

ঘামছে রানা, ধীরে ধীরে লোকটার মুঠো গায়ের জোরে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। ঠেকাবার চেষ্টায় পাল্টা শক্তি খাটাচ্ছে সেন্ট্রি, তার গালের মাংস ও চোয়ালের পেশি থরথর করে কাঁপছে।

'কে... তুমি... ?' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল প্রশ্নটা।

'বাংলাদেশ,' নরম সুরে বলল রানা। খালি হাতটা দিয়ে ঘুসি মেরে গুঁড়িয়ে দিল লোকটার নাক-চোখ ও চোয়ালের একাংশ।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

তার চোখ উল্টে গেল। নিথর হয়ে গেল শরীর।

এর মুখেও কাপড় গুঁজে হাত-পা বাঁধল রানা, সঙ্গী হো টাকসিনের কাছ থেকে পনের ফুট দূরে একটা ঝোপের ভিতর রেখে এল, জ্ঞান ফেরার পরেও যাতে পরস্পরকে সাহায্য করতে না পারে।

আবার ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা, শ্রবণেন্দ্রিয় আগের মতই সজাগ। বাড়ির ভিতর কোথাও থেকে রেডিওর অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছে, সম্ভবত খবর-পাঠকের কণ্ঠস্বর।

খানাখন্দে ভরা ড্রাইভওয়েটা আড়াআড়িভাবে পার হলো রানা। সেটা ধরে ঝোপ-ঝাড় ঘেঁষে আরেকটু এগোতেই তিনতলা বাড়ির পুরোটা দেখতে পেল।

গাছপালার ভিতর দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে রানা। খোলা বারান্দাসহ প্রশস্ত একটা কাঠের বাড়ি, দু'পাশ থেকে ধাপ নেমে এসেছে। বাড়িকে ঘিরে থাকা মেঠো পথের দু'পাশে উঁচু ঝোপ ও আগাছা জন্মেছে। চারপাশে প্রচুর পাইনগাছ দেখা যাচ্ছে।

সবগুলো জানালায় আলো দেখছে রানা। ও যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখান থেকে উজ্জ্বল দেখালেও, দূর থেকে গাছপালার বাধা পাওয়ায় ম্লান লাগবে। নীচের হাইওয়ে থেকে কিছুই দেখা যাবে না।

তিনতলায়, পরদা ঢাকা জানালার ভিতর, ছায়ামূর্তির নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে রানা। সাবধানে, নিঃশব্দ পায়ে সামনে বাড়ল। কাঠের বারান্দা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করবে, তাই মেটো পথেই থাকছে ও।

বড় একটা জানালার ভিতর লিভিং রুম দেখতে পেল রানা, অয়েলক্লথ ঢাকা টেবিলে বসে রয়েছে দুজন লোক আর এক তরুণী। তাস খেলছে ওরা। এই তরুণীই পিছু নিয়েছিল উত্তরা উৎকর্ণার।

এখন তাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা, চিনতেও কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। চক্রি চুয়ানের বান্ধবী সে, চিত্রলেখা মাহিদল; থাই থান্ডারের তরফ থেকে দোই ইনথানন দুর্গে গিয়েছিল থাই টঙের সঙ্গে সমঝোতা বৈঠকে যোগ দিতে।

দাঁড়াল চিত্রলেখা। নড়াচড়ায় ক্ষিপ্র ভাব। সুন্দরী সে, সন্দেহ নেই। তবে চেহারা দেখেই বোঝা যায়, দেমাকে যেন মাটিতে পা পড়ে না। লাল স্কার্ট ও সাদা টি-শার্ট পরেছে, চেয়ারের পিঠে একটা মিঙ্ক কোট। রেডিওর কাছে হেঁটে গিয়ে আওয়াজটা বাড়িয়ে দিল ও।

ইংরেজি খবর হচ্ছে: 'ভয়ংকর মাফিয়া সংগঠন থাই থান্ডার বাংলাদেশী বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে ফিরিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে বেইজিং সরকারের কাছ থেকে দুশো মিলিয়ন ইউএস ডলার মুক্তিপণ চেয়েছে...'

চিত্রলেখার গম্ভীর মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটল, আদর করবার ঢঙে রেডিওর গায়ে চাপড় মারল সে। বাকি তিনজন হেসে উঠল।

তবে খবর এখনও শেষ হয়নি: 'এদিকে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, মহাচিন কঠিন ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করায় আশপাশের অন্তত তিনটে দেশের সরকার পুলিশকে থাই থান্ডারের বিরুদ্ধে চিরনি অভিযান চালাবার নির্দেশ দিয়েছে। এরই মধ্যে থাই থান্ডারের অন্তত দেড়শো গুণ্ডাকে ধরে জেল-হাজতে ভরা হয়েছে...'

নিঃশব্দে এগোচ্ছে রানা, লিভিং রুমকে পাশ কাটিয়ে এল। আরেক কামরার ভিতর তিনজন লোক টেবিলে বসে সরাসরি বোতল থেকে বিয়ার খাচ্ছে, কী বিষয়ে যেন গভীর আলোচনায় মগ্ন।

পরের জানালার কাঁচ আংশিক অস্বচ্ছ, ওটা সম্ভবত বাথরুম।

তৃতীয় জানালার ভিতর একা প্রৌঢ়া এক ভদ্রমহিলাকে দেখল

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

রানা, কাঠের চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।

তাঁর মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, হয় জ্ঞান না থাকায়, নয়তো ক্লান্তিতে। ব্লাউজ দু'এক জায়গায় ছেঁড়া, মেঝেতে লুটাচ্ছে নীল জর্জেট শাড়ির আঁচল। বড় করে শ্বাস নিল রানা। বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে পেয়েছে ও। এই সময় আওয়াজটা ওর পিলে পর্যন্ত চমকে দিল।

জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে বহু লোকের পায়ের শব্দ। নীরবেই এগোবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সংখ্যায় অনেক বেশি ওরা। এত তাড়াতাড়ি পুলিশ আসতে পারে না, ভাবল রানা। তা হলে কারা ...?

জানালার সামনে থেকে পিছু হটছে রানা, তাকিয়ে আছে ডক্টর নাদিরার দিকে। স্থির ও চুপচাপ রয়েছেন তিনি, জানেন না তাঁকে নিয়ে কী রোমহর্ষক নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

পায়ের আওয়াজ দ্রুত হলো। ছুটে কাছে চলে আসছে ওরা। বড়সড় একটা ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ল রানা, হাতে বেরিয়ে এসেছে প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথার।

'বা-বাম দিকে!' কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর হিসহিস করে উঠল। 'তুমি ডা-ডানে যাও! বাঁক ঘুরে! পে-পেছনে যাও!'

ঝোপের ভিতর নড়ছে না রানা, হাতে পিস্তল। ওর মনে পড়ল, এই তোতলা লোকটার কণ্ঠস্বর আগেও শুনেছে। থাই থান্ডারের বেযমেন্টে যখন বন্দি ছিল ও, থাই টং তখন ওখানে হামলা চালায়, তাদের সঙ্গে ছিল লোকটা।

থাই থান্ডারের সেফ হাউসে তা হলে আবার হামলা চালাতে যাচ্ছে থাই টং।

একটু পরেই শুরু হয়ে গেল তুমুল গুলিবর্ষণ। শান্ত, পাহাড়ি এলাকা কেঁপে কেঁপে উঠছে। ট্রেসার বুলেটগুলো আলোর রেখা তৈরি করে আঘাত করছে বাড়িটার গায়ে।

তিন

ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বুলেটের মতই ছুটল রানা। অকস্মাৎ ওর সামনে পড়ে গেল থাই টঙের একজন খুনি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাওয়ায় হাতের কারবাইন তাক করতে দেরি করে ফেলল লোকটা। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তার ঘামে ভেজা হলদেটে কপালে একটা লাল টিপ পরিয়ে দিল রানার হাতের ওয়ালথার।

পড়ে যাচ্ছে লোকটা, কারবাইন ছেড়ে দিয়েছে। ঝট্ করে হাত বাড়িয়ে সেটা ধরে ফেলল রানা।

ওয়ালথারটা নিজের জায়গায় ফিরে গেল, ওর হাতে এখন অটোমেটিক কারবাইন। চারদিকে শত্রু, দু'দলে যুদ্ধ লেগে গেছে, এরকম সময়ে হাতে একটা রাইফেল থাকা দরকার।

লাফ দিয়ে রেইলিং টপকে বারান্দায় চড়ল রানা, আরেক লাফ দিল জানালা লক্ষ্য করে– ওটার ভিতরই ডক্টর নাদিরাকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

কাঁধের ধাক্কায় ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল জানালার কাঁচ, ওগুলোর পিছু নিয়ে কামরার মেঝেতে নামল রানা। ডক্টর নাদিরা ধীরে ধীরে মাথাটা তুললেন, ঝাপসা দৃষ্টি কাটিয়ে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর মাথাটা আবার নেতিয়ে পড়ল সামনের দিকে।

সিধে হলো রানা, কাঁধটা এক হাতে ডলতে ডলতে সামনে এগোল। থাই থান্ডারের সেফ হাউস হুঙ্কার, আর্তনাদ ও গোলাগুলির আওয়াজে অনবরত কাঁপছে।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

দড়াম করে কামরার দরজা খুলে যেতে রানার বুকটাও কেঁপে উঠল। সেদিকে বন্ করে ঘুরল ও, ওর সঙ্গে ঘুরে গেছে কারবাইনের নলও। চৌকাঠ পার হয়ে কামরার ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছে থাই থান্ডারের লিডার, চক্রি চুয়ান।

এই চক্রি চুয়ানই ঢাকায় গিয়ে বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে কিডন্যাপ করেছে, তাঁর বোনকে হত্যা করেছে, আগুন দিয়েছে এয়ারপোর্টের হ্যাঙ্গারে।

পরস্পরকে দেখে দুজনেই চমকাল। গুলিও চালাল দুজন প্রায় একইসঙ্গে। চক্রি চুয়ানের পিস্তল গর্জে উঠল, গুলিটা রানার একেবারে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আধ সেকেন্ড আগে রানা করেছে ব্রাশফায়ার। বুলেটগুলো সেলাই-এর ফোঁড় তৈরি করছে। ঘুরে গেল চুক্রি চুয়ান, যেন হাতের কাজটা দেখে রানাকে তৃপ্তি পেতে দিতে রাজি নয়, পিস্তল ফেলে দু'হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে বসে পড়ল, তারপর ঢলে পড়ল একপাশে।

নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে, জানে পনেরো-বিশটা বুলেট খেয়ে খুব বেশিক্ষণ টিকবে না লোকটা। পিস্তলটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরল ও, তারপর দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে ফিরে এল ডক্টর নাদিরার কাছে।

ছুরি বের করে বিজ্ঞানীর বাঁধনগুলো কাটল ও। ওর হাতের ভিতর ঢলে পড়ল শরীরটা। ছোট্ট কাঠামো, হালকা। মুখে আঁচড়ের দাগ, একটা চোখের চারপাশ কিছুটা ফুলে কালচে হয়ে আছে।

বাড়ির ভিতর ছুটোছুটি করছে বুট পরা কয়েক জোড়া পা। দিকভ্রান্ত কয়েকটা বুলেট দেয়াল ফুটো করে ছোট কামরাটার ভিতর ঢুকে চেয়ারের খাড়া পিঠ ভেঙে ফেলল, যে চেয়ারটায় বেঁধে রাখা হয়েছিল ডক্টর নাদিরাকে।

তাঁকে নিয়ে জানালার সামনে চলে এল রানা, লাথি মেরে আরও কিছু কাঁচের টুকরো ঝরাল।

জানালার পাশে একটা ক্লজিট, রানাকে চমকে দিয়ে সেটার ভিতর থেকে আওয়াজ বেরিয়ে এল। বন্ধ কবাটের গায়ে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারছে কেউ। তারপর ক্ষুব্ধ গলা শোনা গেল, কে যেন হিন্দি ও বাংলায় বলল, 'ইয়ে দরওয়াজা তোড় দো! ভাঙ শালার দরজা– ভাঙ! ভাঙ!' তারপর সুর করে শুরু হলো, 'লাথি মার, ভাঙরে তালা...'

আবার ধাক্কা লাগায় থরথর করে কেঁপে উঠল ক্লজিটের কবাট আর পাশের দেয়াল।

'মানস!' দরজার হাতল ধরে ঘোরাল রানা। ঘুরল না, তালা দেওয়া।

'সেলাম, হুজুর! নমস্তে, সার! আরে, দাদা নাকি?'

'অপেক্ষা করুন!'

ঘুরে চেয়ারটার কাছে ফিরে এল রানা, ধীরে ধীরে ডক্টর নাদিরাকে আবার বসাল ওটায়। দ্রুত হাতে পকেট থেকে টুথপিক বের করে ক্লজিটের তালা খুলে কবাট ফাঁক করল। ভিতর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল মানস ঘোষ।

হাত দুটো রানার বুকে পেঁচাল সে, মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা কাঁচের টুকরোগুলোকে গ্রাহ্য না করে রানাকে নিয়ে সারা ঘরে এক পাক নাচছে।

'আরে, ছাড়ুন! আহ্, কী করছেন!'

'ধন্যবাদ, মা দুর্গা, থ্যাঙ্কিউ!' অদৃশ্য দেবীর উদ্দেশে দু'হাত এক করে কপালে ঠেকাল মানস। 'কত বড় ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি, স্বনামধন্য মাসুদ রানা স্বয়ং আমাকে উদ্ধার করলেন!'

'মানস, আপনার পাগলামি থামান! পালাতে না পারলে মারা পড়ব!' নিজেকে ছাড়িয়ে আবার ডক্টর নাদিরাকে পাঁজাকোলা করে বুকের কাছে তুলে নিল রানা।

'আহা, কী ভক্তি!' আবেগে আপ্লুত কণ্ঠে বলল মানস, ঘুরে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। 'আপনি হিন্দু হলে বলতাম, ডক্টর নাদিরাকে তো নয়, এ যেন স্বয়ং মা দুর্গাকে বুকে তুলে নিয়েছেন। তার বদলে বলতে ইচ্ছে করছে– আহা, কী দেশপ্রেম, যেন জননী জন্মভূমিকে বুকে তুলে নিয়েছেন!'

তার কথায় কান নেই রানার। 'আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি মারা গেছেন,' মাথা নিচু করে জানালা গলে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলল ও।

'কক্ষনো না!' বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলল মানস। 'আমার মা, দিদি আর ভোলার অনুমতি নেই। ওরা আমাকে ভালবাসে না!'

'সাবধান!' খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে মানসকে সতর্ক করল রানা। 'চারদিকে থাই থান্ডার আর থাই টং ছুটোছুটি করছে।'

মাথাটা একদিকে কাত করল মানস। গোলাগুলির আওয়াজ ক্রমশ কমে আসছে। ফার্নিচার ভাঙচুরের আওয়াজ ভেসে এল। তারপর ভারী কিছু পতনের কম্পন অনুভব করল। কেউ একজন কাউকে গালি দিল। তীব্র ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল আরেক লোক।

'আনআর্মড কমব্যাট শুরু হয়েছে,' বলল মানস, তারপর খানিকটা কসরত করে রেইলিংটা টপকাল। 'দিন, দাদা, ওঁকে আমার কাছে দিন...'

রেইলের উপর দিয়ে ডক্টর নাদিরাকে মানসের হাতে তুলে দিল রানা।

'থাই টং?' জিজ্ঞেস করল মানস। 'শালা থান্ডাররা রুম সার্ভিসের কথা বলে হোটেল স্যুইটে ঢুকে কাবু করল আমাকে, তারপর কী একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে বেহুঁশ করে ফেলল। ওদের সঙ্গে একটা অ্যামবুলেন্সও ছিল, নিশ্চয়ই থাইল্যান্ড থেকে আনিয়েছে, তাই না? সীমান্ত তো কাছেই। ভাল কাভার, কি বলেন?'

'তা বটে,' রেইলিং টপকে বলল রানা। 'গাছগুলোর ভেতর দিয়ে পথ আছে। আমার পিছু নিন।'

'ওস্তাদ, আমার কাছেও একটা তথ্য আছে,' বলল মানস। 'থাই থান্ডারদের মুখে শুনলাম গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সও থাইল্যান্ডে ঢুকে পড়েছে, কিংবা ঢুকতে যাচ্ছে।'

'সব ব্যাপারে ছোঁক ছোঁক করা ওদের একটা বাজে অভ্যাস,' বলল রানা। 'থাইল্যান্ডে কী চায় ওরা?'

'সুযোগ পেলে তার সদ্ব্যবহার করতে চায়,' বলল মানস।

'বুঝলাম না।'

'শোনা যাচ্ছে পিসিআই নাকি দুটো গ্রুপ পাঠিয়েছে। একটা গ্রুপ কমান্ডোদের নিয়ে তৈরি, তাদের কাজ ডক্টর নাদিরা কিংবা তাঁর ডেভেলাপ করা প্লেনের কাছে কেউ পৌঁছাতে চাইছে দেখলে বাধা দেয়া,' বলল মানস। 'ওদের দ্বিতীয় গ্রুপটায় কয়েকজন পাইলট ও বিজ্ঞানী আছে, তাদের কাজ কোনও ভাবে সুযোগ করে নিয়ে রহস্যময় প্লেনটাকে থাইল্যান্ড থেকে করাচীতে নিয়ে যাওয়া। তা নিয়ে যেতে পারলে প্লেনটার ইউনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পাবে তারা। পিসিআই ধরেই নিয়েছে ওই প্লেনটা আসলে ডক্টর নাদিরার ডেভেলাপ করা দুরন্ত ঈগল।'

'বাহ্, শালারা যেন মগের মুল্লুক পেয়েছে!'

কবজিতে জড়ানো হাতঘড়ি কাঁপছে, অনুভব করে চট করে আড়চোখে একবার রানাকে দেখে নিল মানস। না, কিছুই টের পায়নি রানা।

জোরে জোরে শ্বাস ফেলল মানস, যেন কষ্ট পাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে ডক্টর নাদিরাকে নিজের হাতে তুলে নিল রানা।

রানাকে অনুসরণ করছে মানস, তবে অলস পায়ে। ক্রমশ

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

পিছিয়ে পড়ছে ও। ছোট একটা ডোবাকে পাশ কাটাবার সময় দাঁড়িয়ে পড়ল, কিনারা থেকে নীচে নামতে যাচ্ছে। 'আপনি এগোন, ওস্তাদ,' গলা চড়িয়ে বলল, ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে। 'এমন এক তাগাদা অনুভব করছি, সাড়া না দিয়ে পারা যায় না।' একটু পরপরই হাতঘড়িটা কাঁপছে।

রানা বিরক্ত। এমন বিপদের সময় প্রকৃতির ডাক অগ্রাহ্য করতে পারে না, এ কেমন এসপিওনাজ এজেন্ট! ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও, কিন্তু ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে ছোটখাট লোকটা কোথায় বসেছে ঠাহর করতে পারল না।

অচেতন ডক্টর নাদিরাকে কাঁধে নিয়ে সাবধানে এগোচ্ছে রানা। একটু সন্দেহ হচ্ছে ওর, মানস কি ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে? রাখবারই কথা, তাতে ওর কিছু মনে করা উচিত নয়।

ওদিকে ডোবার কিনারায় বসে হাতঘড়ির একটা বোতামে চাপ দিল মানস ঘোষ। ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিস হেডকোয়ার্টার থেকে কর্মকর্তাদের কেউ ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।

শক্তিশালী রেডিওটা অন হলো। 'ইয়েস, সার। মানস ঘোষ স্পিকিং, সার।'

ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিস, নতুন দিল্লি।

ডিরেক্টর রমেশ ঠাক্‌রে-র চেম্বার। সাউন্ডপ্রুফ কামরার ভিতর, কার্পেটের উপর অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন তিনি। ছোট্ট টু-ওয়ে রেডিও সেটটা কানের কাছে তুলে কথা বলছেন তরুণ এজেন্ট মানস ঘোষের সঙ্গে।

'দিস ইজ অ্যান ইমারজেন্সি, মানস,' বললেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'কাজেই নতুন নির্দেশগুলো মন দিয়ে শোনো।'

'ইয়েস, সার!' আনুগত্য প্রকাশ পেল মানসের কথায়।

'তুমি তো জানোই যে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স দুরন্ত ঈগলকে করাচীতে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে।'

'আজ্ঞে, সেরকমই শুনছি, সার।'

'এরকম পরিস্থিতিতে আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না,' রমেশ ঠাক্‌রে বললেন। 'থাই সরকারের সঙ্গে কথা হয়েছে আমাদের। কথা হয়েছে ফার্স্ট পার্টির সঙ্গেও। কেউ কিছু স্বীকার করতে চাইছে না, বলছে আমরা যা শুনেছি তার সবই নাকি নিছক গুজব। কিন্তু ওরা যাই বলুক, আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট ফটো তো আর মিথ্যে কথা বলছে না! কাজেই দোই ইনথাননে আমাদেরও থাকা দরকার। ইতিমধ্যে দুটো টিম রওনা হয়ে গেছে। তার মধ্যে একটা টেকনিকাল টিম, সদস্যদের মধ্যে বিজ্ঞানী আর পাইলটরা আছে।'

মানস উদ্বিগ্ন। 'আমাদের টিম ওখানে গিয়ে কী করবে, সার?'

'ওদের প্রথম কাজ, সুযোগের সন্ধানে থাকা। যখনই দেখবে সম্ভব, অমনি ছোবল হানবে।'

দু'সেকেন্ড বোবা হয়ে থাকল মানস। 'ছোবল মারবে, সার? ছোবল মারবে কাকে?'

রেগে গেলেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'তুমি বোকার মত প্রশ্ন করছ, মানস। ছোবলটা মারা হবে প্লেন এবং ডক্টর নাদিরাকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে, প্লেন ও ডক্টর নাদিরা সেই মুহূর্তে যাদের কাছে থাকবে তাদেরকেই মারতে হবে– এই সহজ কথাটা তুমি বুঝতে পারছ না?'

'কিন্তু, সার, আপনি আমাকে ব্রিফ করার সময় বলেছিলেন, অন্তত এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও চিনকে আমরা স্বেচ্ছায় নিঃশর্তভাবে সাহায্য করছি, এখানে আমাদের অন্য কোনও স্বার্থ নেই।'

'তখন কী বলেছিলাম ভুলে যাও, মানস,' শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'চিন অস্থির, বাংলাদেশ অস্থির,

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

এরকম আঁচ পেয়েই তোমাকে পাঠানো হয়েছিল ওয়াচ করার জন্যে। তোমার পাঠানো রিপোর্ট এবং অন্যান্য সূত্র থেকে এখন আমরা জানতে পেরেছি আসলে কী ঘটছে। কাজেই এখন এটা সম্পূর্ণ নতুন একটা অ্যাসাইনমেন্ট। তোমাকে আমি ব্রিফ করছি।'

আধ সেকেন্ড ইতস্তত করে মানস সাড়া দিল: 'ইয়েস, সার... নো, সার!'

'এক্সপ্লেইন ইওরসেলফ!' প্রায় গর্জে উঠলেন রমেশ ঠাক্‌রে।

'সার,' দৃঢ়কণ্ঠেই বলল মানস, 'আমাকে যে অ্যাসাইনমেন্টে পাঠানো হয়েছে তাতে আমার নৈতিক সমর্থন ছিল। কিন্তু এই নতুন অ্যাসাইনমেন্টে আপনি আমাকে দিয়ে ঠিক কী করাতে চান...'

নরম সুরে হাসলেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'খুব কঠিন কয়েকটা কাজই তোমাকে দেয়া হচ্ছে, মাই ডিয়ার সান। তুমি একজন ট্রেনিং পাওয়া কিলার, মানস, অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট দ্যাট এভার, ওকে?'

'ইয়েস, সার, বাট...'

মানসকে কথা বলতে না দিয়ে বলে চলেছেন রমেশ ঠাক্‌রে, 'আমাদের কৌশল কাজে লেগেছে, বর্তমান সময়ের সেরা এক এসপিওনাজ এজেন্টের কাছাকাছি থাকার সুযোগ করে নিতে পেরেছ তুমি, এরচেয়ে বড় সুখবর আর কিছু হতে পারে না। ওই মাসুদ রানাকে তুমি পরপারে পাঠাবে...'

'অসম্ভব, সার। এ আপনি কী বলছেন! তিনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন...'

'কোথায়? সিঙ্গাপুরের বিগ ডিল-এ তো?' আবার হাসলেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'ওখানে মাসুদ রানা তোমার প্রাণ বাঁচায়নি। কীভাবে বাঁচাবে, প্রাণ হারাবার মত কোনও বিপদ ওখানে তোমার হলে তো!'

'মানে, সার?' বিভ্রান্ত বোধ করছে মানস। 'আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ওটা ছিল আমাদের সাজানো নাটক,' বললেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'যারা তোমাকে মারধর করছিল তারা আমাদেরই ভাড়াটে গুণ্ডা। স্রেফ অভিনয় করছিল, সত্যি সত্যি মারলে তোমাকে খুঁজে পাওয়া যেত ভেবেছ?'

'ও ভগবান!' মানস শুধু হতবিহ্বল নয়, ব্যাপারটা বিশ্বাসও করতে পারছে না। 'এ কী শুনছি আমি!'

'ঠিকই শুনছ। মাসুদ রানা খুব নরম প্রকৃতির মানুষ: কারও ওপর অত্যাচার সহ্য করতে পারে না, এটা আমাদের জানা আছে। নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে আমাদের কয়েকজন এজেন্টকে আগেও বাঁচিয়েছে ও নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। নাটকটা এমনভাবে সাজানো হয়, ও যাতে তোমার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। হয়েছেও ঠিক তাই।'

'আমাকে কিছুই না জানিয়ে এ-সব করতে গেছেন... কাজটা ভাল করেননি, সার,' বলল মানস। 'এতে আমার নৈতিক সমর্থন নেই। তা ছাড়া...'

'ইয়েস, মানস?'

'এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে আমার প্রতি মাসুদ রানার মনে সহানুভূতি জাগাবার কী দরকার ছিল?' জিজ্ঞেস করল মানস। 'ওই গুণ্ডাগুলোকে দিয়ে তাকে মেরে ফেললেই তো পারতেন– সেটাই যখন আপনার ইচ্ছে।' মার খাওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতাটা মনে পড়ে গেল ওর। অসম্ভব! ভাবল সে, সাজানো নাটক হলে ওভাবে কেউ কাউকে মারে? মাসুদ রানা ঝাঁপিয়ে না পড়লে আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ও তো মারাই যাচ্ছিল!

পরিষ্কার বুঝল সে, বস্ সত্যি কথা বলছেন না।

'ওহ্, নো!' বললেন ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের ডিরেক্টর। 'মারবে তো বটেই, তবে তার আগে ওকে দিয়ে নিজেদের

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

স্বার্থটা উদ্ধার করে নিতে হবে তোমাকে।'

'কী স্বার্থ, সার?' মানসের নিজের কানেই কণ্ঠস্বরটা কর্কশ শোনাল। 'কী করতে হবে আমাকে?'

'তার আগে মনে করিয়ে দিই– ভারতমাতার স্বার্থই তোমার স্বার্থ। আর সেটা চরিতার্থ করা হবে তুমি যদি ওই বিরল মেধার অধিকারী বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরা আর রহস্যময় প্লেনটাকে থাইল্যান্ড থেকে হিন্দুস্তানে নিয়ে আসতে সাহায্য করো। আমরা এর কলকব্জা ও নির্মাণকৌশল বুঝে নিয়ে আমেরিকার হাতে তুলে দেব প্লেনটা–নাদিরাকেও।'

হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছে না মানস। 'কী করে তা সম্ভব, সার?'

'খুব সহজে,' রেডিওর অপরপ্রান্ত, অর্থাৎ নতুন দিল্লি থেকে বললেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'আমাদের প্রথম টিমের সদস্য সংখ্যা আট, দুজন স্পাই ছাড়া সবাই তারা বিজ্ঞানী ও পাইলট। দ্বিতীয় টিমের সদস্য মাত্র একজন। দেখতে অবিকল মাসুদ রানা। ছদ্মবেশের সাহায্যে নিয়ে আরও নিখুঁত করা হবে চেহারাটা।

'তার নাম উদয় চ্যাটার্জি। তোমার কাজ হবে ঠিক সময় মত মাসুদ রানাকে মঞ্চ থেকে আউট করে দেয়া, উদয় চ্যাটার্জি যাতে ইন করতে পারে। বাকিটা টেকনিকাল টিমের সাহায্য নিয়ে যা করার সে-ই করবে।'

'যা করার, সার? সেটা কী, একটু বিস্তারিত বলবেন, প্লিজ?' গলার আওয়াজ স্বাভাবিক রাখতে গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছে মানস।

মৃদু শব্দে হাসলেন ঠাক্‌রে। তারপর বললেন, 'ব্যাপারটার মধ্যে লালচিনের স্বার্থ ষোলোআনা। কাজেই ধরে নেয়া যায় মাসুদ রানাকে সাহায্য করবে চিনা সিক্রেট সার্ভিস। প্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি দুরন্ত ঈগলকে নিয়ে দুনিয়ার আরেক মাথায় চলে যাবে, চিনা এয়ার ফোর্সও এটা মেনে নেবে না। গুরুত্বপূর্ণ সব ফ্যাক্টর মনে রেখে হিসেব করলে দেখতে পাবে– ওদের সাহায্য নিয়ে মাসুদ রানাই দুরন্ত ঈগলকে উদ্ধার করবে। সম্ভবত সে-ই ওটাকে নিয়ে যাবে বেইজিঙে। এবার কল্পনা করো, মাসুদ রানা মনে করে চিনারা সাহায্য করছে উদয় চ্যাটার্জিকে।'

কল্পনা করতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল মানস। রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল, 'তারপর?'

'রানাকে চিনারা বিশ্বাস করে, কাজেই তার ওপর ওদের নজরদারি থাকবে না,' বললেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'সেই সুযোগে রানা, অর্থাৎ উদয়, মাঝ আকাশ থেকে প্লেনটা হাইজ্যাক করে নিয়ে আসবে ইন্ডিয়ায়।'

কঠিন কাজ, তবে অসম্ভব নয়, উপলব্ধি করল মানস। প্ল্যানটা ভাল, কাজ হবে কি না নির্ভর করছে উদয়ের উপর– রানার ভূমিকায় কতটা সফল অভিনয় করতে পারবে, স্পাই হিসেবে তার ব্যক্তিগত দক্ষতা কতটুকু, তার উপর। 'চিনা ক্রু ও এজেন্টদের খুন করে?' জিজ্ঞেস করল মানস।

'এ-সব বাহুল্য প্রশ্ন কেন করছ বুঝছি না!' বিরক্ত হলেন ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের ডিরেক্টর। 'প্রয়োজনে খুন তো করতেই হবে– উদয়কেও, তোমাকেও। প্ল্যানটা কেমন লাগল, কোনও খুঁত পাচ্ছ কি না, সেটা বলো।'

'শুনেছি মাসুদ রানা একাই একশো,' বলল মানস। 'তার পক্ষেও এই অ্যাসাইনমেন্ট সফল করা সম্ভব কি না বুঝতে পারছি না। উদয় সম্পর্কে কিছুই না জেনে কী বলতে পারি, সার!'

'উদয়ের সফল হবার সম্ভবনা হানড্রেড পার্সেন্ট,' বললেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'কারণ মাসুদ রানা তো একা, উদয়ের সঙ্গে আমাদের অন্যতম সেরা একজন এজেন্ট আছে–তুমি।'

নিজের প্রশংসা শুনে খুশি হতে পারল না মানস। 'মাসুদ রানাকে আউট করা মানে তাকে খুন করা।' অনেকটা আপন মনে মন্তব্য করল সে।

'অভকোর্স!'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

'সার, এটা সম্ভব নয়...'

'দ্যাট'স অ্যান অর্ডার, মানস!'

চুপ করে আছে মানস।

'তুমি কিছু বলছ না,' অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা সুরে বললেন রমেশ ঠাক্‌রে।

'সার,' বলল মানস, তার কণ্ঠও শান্ত। 'আমি এই মুহূর্তে কাজে ইস্তফা দেয়ার কথা ভাবছি।'

'কিন্তু কোনও অ্যাসাইনমেন্টে কর্মরত অবস্থায় তা তুমি পার না,' বললেন আইএসএস ডিরেক্টর। 'সেরকম কিছু করলে তোমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হবে, কিংবা...'

জানা থাকায় শূন্যস্থানটা মানসই পূরণ করল, '...ডিউটিতে থাকার সময় অ্যাক্সিডেন্টালি মারা যাব।' তার জানা আছে, এরকম পরিস্থিতিতে আজ পর্যন্ত কাউকে বাঁচিয়ে রাখা হয়নি।

এবার অপরপ্রান্তে রমেশ ঠাক্‌রে চুপ করে থাকলেন।

মানসের মাথার ভিতর চিন্তার ঝড় বইছে। মাসুদ রানা নিজের জীবনের মায়া করেননি, গুণ্ডাদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। যে-কোনও দুই দেশের এসপিওনাজ এজেন্টরা পরস্পরের শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী, এটা সবাই জানে, অথচ আমাকে বারবার বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন তিনি। এই ঋণ আমার শোধ করা উচিত না? উচিত নয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা? কিন্তু আরেকদিকে আমার জন্মভূমি– ভারতমাতা– এবং বস্ রমেশ ঠাক্‌রের নির্দেশ। বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সে। 'ঠিক আছে,' ঝাড়া বিশ সেকেন্ড পর মানসই নীরবতা ভাঙল। 'বলুন, সার, আর কী করতে হবে।'

'কী করতে হবে সেটা তোমাকে বলা হয়েছে। কখন কীভাবে করতে হবে, সে-সব তোমাকে আমরা সময় মত জানাব,' বললেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'তবে মনে রাখবে যে ব্যাপারটার সঙ্গে একাধিক পরাশক্তি জড়িত, কাজেই প্রতিটি কাজ সাবধানে সারতে হবে তোমাকে।'

'আপনি আমাকে এখনই নির্দেশ দিচ্ছেন না কেন, মাসুদ রানাকে মেরে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতাম?' জানতে চাইল মানস।

'না-না, কাজটা সময়মত করতে হবে,' তাড়াতাড়ি বললেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'আমাদের টিম দুটো দোই ইনথানন দুর্গ পেনিট্রেট করতে পারল কি না তার ওপর নির্ভর করছে পরবর্তী পদক্ষেপ। আমরা আশা করছি, দুর্গ এলাকায় পৌঁছাবার পর তুমি নিজেই বুঝতে পারবে মাসুদ রানাকে কখন তোমার সরাতে হবে–হয়তো দেখতে পাবে একই চেহারা নিয়ে দুজন লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'বেশ।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মানস। 'কিন্তু, ধরুন, উদয় দুর্গ এলাকা পেনিট্রেট করতে পারল না। তখন কী হবে?'

'সব প্ল্যানেরই একটা ব্যাক-আপ থাকা উচিত, থাকে, এটারও আছে,' বললেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'একটা প্ল্যান কাজ করবে না বুঝতে পারলে আরেকটা প্ল্যান ধরে এগোতে হবে। সেজন্যেই মাসুদ রানাকে তুমি এখনই সরাতে পার না।'

'ব্যাক-আপ প্ল্যানটা কী, সার?'

'সেটা সময় মত জানানো হবে তোমাকে।'

'বেশ।'

'আরেকটা কথা, মানস,' প্রসঙ্গ বদলে বললেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'তোমার কুকুর, ভোলা।'

শিরদাঁড়ায় শিরশিরে একটা ভাব অনুভব করল মানস। ভোলা তার পোষা, আদর করে ট্রেনিং দেওয়া কুকুর। 'ইয়েস, সার? কী হয়েছে ভোলার?'

হাসলেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'তোমাকে দেখতে না পেয়ে খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছে ভোলা। ভাবলাম তোমার কাজে

www.MurchOna.com

লাগতে পারে, তাই ওকে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। ওর খাবার নিয়ে এক লোক ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গেছে, বলে দিচ্ছি কোথা থেকে কালেক্ট করতে হবে,' বললেন আইএসএস-এর ডিরেক্টর।

'ও, আচ্ছা,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মানস। 'ভালই করেছেন, ভোলাকে হয়তো দরকার হতে পারে আমার।'

'আরেকটা কথা,' বললেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'খবরদার, মানস, ওই ভদ্রমহিলার যেন কোনও ক্ষতি না হয়! রানা যেমন তাঁর যত্ন নিচ্ছে, তুমিও ঠিক সেরকম যত্ন নেবে। মনে রাখবে, দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজন তিনি, তাঁর বিরল মেধা কাজে লাগিয়ে ভারতমাতাকে আরও এগিয়ে নিতে চেষ্টা করব আমরা।'

'জী?' অসহায় বোধ করছে মানস, নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে ভয়ও পাচ্ছে। 'জী।'

সন্তুষ্টির হাসি হাসলেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'আই উইশ ইউ গুড লাক, মাই বয়। তবে আরেকটা কথা, মাই ডিয়ার।'

'জী, বলুন, সার।'

'আমাদের দুই টিমের প্রত্যেকে জানে এটা তাদের সুইসাইড মিশন। তোমার ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়, তোমাকে কোনও সুইসাইডাল মিশনে পাঠানো হয়নি। এরকম পরিস্থিতিতে, ভগবান না করুন, ধরো মিশনটা ব্যর্থ হলো। সেক্ষেত্রে কী হবে? ওরা তোমাকে দায়ী বলে ভাববে না?'

একটা ঢোক গিলল মানস। কিছু বলতে যাবে, অনুভব করল যোগাযোগ কেটে দিয়েছেন রমেশ ঠাক্‌রে।

খানিক দূর এগিয়ে ইতস্তত করল রানা, তারপর ট্রেইলের পাশে কয়েকটা গাছের আড়ালে মানসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল। খুব বেশি দেরি করেনি সে, পাঁচ-সাত মিনিটের মাথায় ফিরে এল।

রানা ওর জন্য অপেক্ষা করছে দেখে অমায়িক হাসি ফুটল মানসের মুখে। 'দুঃখিত, বুঝলেন না!'

বুঝব না কেন, মনে মনে বলল রানা, তোমার আচরণ সন্দেহজনক। মুখে বলল, 'চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আপনি সুখি নন।'

'আরে, মশাই, আপনি সবজান্তা নাকি?' বেসুরো গলায় হেসে উঠল মানস। 'সত্যিই আমি সুখি নই!'

'কেন জানতে পারি?' প্রশ্ন করল রানা।

'আর সময় পেল না, ডোবার ধারে বসা মাত্র হেডঅফিস দিল্লি থেকে মেসেজ এল,' বলল মানস। 'কী মেসেজ? না, যে-কোনও মূল্যে দুরন্ত ঈগলকে নিয়ে পাকিস্তানীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে হবে। যেভাবেই হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে চলতি সময়ের সেরা এসপিওনাজ এজেন্ট মাসুদ রানাকে।'

'আচ্ছা! তাতে আপনার মন খারাপ করার কী হলো?' জানতে চাইল রানা, মেসেজটা কীভাবে এল জানার প্রয়োজন বোধ করছে না।

'মন খারাপ করব না? আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আপনাকে সাহায্য করতে হবে, অথচ এখানে ঘটছে ঠিক উল্টোটা– বারবার বিপদে পড়ছি আমি, আপনিই আমাকে সেই বিপদ থেকে বাঁচাচ্ছেন। সত্যি কথা বলতে কী, এজেন্ট হিসেবে আমি আমার সুনাম বজায় রাখতে পারছি না।'

রানা ভাবল, 'তোমার অভিনয় ধরা পড়ে যাচ্ছে, মানস, তুমি সত্যি কথা বলছ না।'

'আপনাকে আরেকটা খবর দিই,' হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মানস। 'ওরা আমার ভোলাকে পাঠাচ্ছে। ও এলে আমাদের খুব কাজে লাগবে, বুঝলেন না!'

ভ্রূ কোঁচকাল রানা। এই ভোলার কথা আগেও একবার বলেছে মানস। 'আপনার এই ভোলাটা আবার কে?'

'এহ্‌হে, আপনাকে বলিনি বুঝি? ভোলা আমার একমাত্র

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

ফ্রেন্ড! যদিও আমি দু'পেয়ে আর ও চারপেয়ে, তবু পরস্পরকে আমরা অসম্ভব ভালবাসি।'

কুকুর? জিজ্ঞেস করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রানা। দরদ যেভাবে উথলে উঠছে, কুকুর বললে লোকটা না আবার অভিমান করে বসে।

ওদের পিছনে বাড়ির পরিবেশ ইতিমধ্যে শান্ত হয়ে এসেছে। তারপর হঠাৎ চিনা ভাষায় হইচই করে উঠল একদল লোক।

'দাদা, থান্ডাররা বোধহয় হেরে গেল,' বলল মানস, রানা হাঁটতে শুরু করায় তার পিছু নিয়েছে সে।

'টংরা এখন ডক্টর নাদিরাকে খুঁজবে।' ভদ্রমহিলাকে এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে নেবার জন্য থামল রানা।

'আমি হয়তো দু'এক মিনিট ওঁকে কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব,' ব্যাপারটা লক্ষ করে বলল মানস। 'কিন্তু হাঁটতে পারব না। আমার ফিজিকাল কন্ডিশন সেটা অ্যালাও করবে না।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'তার কোনও দরকার নেই। আমার কোনও সমস্যা হচ্ছে না।'

গাছপালার ভিতর দিয়ে যথা সম্ভব দ্রুত এগোচ্ছে ওরা। জঙ্গলের পশুপাখিরা কোনও শব্দ করছে না, শান্তিময় পরিবেশে সগর্জন অনুপ্রবেশ ঘটায় এখনও সন্ত্রস্ত হয়ে আছে ওগুলো। গাছগুলোর মাথা এলোমেলো করে দিচ্ছে সাগরের বাতাস। অবশেষে সরু ট্রেইলে পৌঁছাল ওরা।

হঠাৎ খালি কাঁধে হাতের ছোঁয়া অনুভব করল রানা।

'থামুন,' ওর কানের কাছে ফিসফিস করল মানস। কাঁধটায় আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে মৃদু চাপ দিয়ে নামিয়ে নিল হাত। 'সামনে কেউ আছে। সম্ভবত একজন টং, এই দিকটা পাহারা দিচ্ছে।'

'আমি কোনও শব্দ পাইনি,' বলল রানা। 'আপনার ভুল হচ্ছে না তো?'

মাথা নেড়ে ছাগলদাড়িতে হাত বুলাল মানস। 'আমার ষষ্ঠইন্দ্রিয় কখনও ভুল করে না!' ফিসফিস করল সে। 'এখনই আসছি।'

দ্রুত হারিয়ে গেল ছোটখাট ছায়ামূর্তিটা। পিছিয়ে এসে গাছপালার আড়াল নিল রানা। চোখ বুলাল হাতঘড়ির ডায়ালে।

পশমে ঢাকা ছোট একটা প্রাণী মেটো পথ দিয়ে ছুটে গেল, ধুলোর লম্বা একটা মেঘ তৈরি হতে দেখল রানা। গর্তের ভিতর লুকাল সেটা। একটু দূরে একটা পাখি সুর করে ডেকে উঠল, সাড়া দিয়ে গেয়ে উঠল আরও দু'একটা। ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠছে বনের পশু-পাখি।

ডক্টর নাদিরাকে আবার এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে নিল রানা। গাছগুলোর মাথার উপর আকাশটা কালো। ডালপালার ফাঁকে আধখানা চাঁদ বেশ উজ্জ্বল।

ঘুমের মধ্যে প্রৌঢ়া বিজ্ঞানী শিউরে উঠলেন একবার। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা লাগছে রানারও। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। গাছপালার ভিতর দিয়ে বাড়িটার আলো অস্পষ্ট লাগছে। গেছে তো অনেকক্ষণ হলো, মানস ফিরছে না কেন!

হাত ও পা নাড়াচাড়া করে আড়ষ্ট ভাব দূর করছে রানা। ঠাণ্ডাটা বিরক্ত করছে ওকে। শুধু ঢিলে ট্যুরিস্ট শার্ট আর ট্রাউজার পরে আছে ও। ওর কাঁধে নেতিয়ে থাকা ভদ্রমহিলা অস্ফুটকণ্ঠে গুঙিয়ে উঠলেন একবার।

'আমি কোথায়?' বিড়বিড় করলেন তিনি।

কাঁধ থেকে নামিয়ে ওঁকে দাঁড় করাল রানা। 'মাসুদ রানা, ম্যাডাম,' বলল ও। 'ওদের পিছু নিয়ে বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আপনি মালয়েশিয়ার কোটা বাহারুতে রয়েছেন।'

মাথাটা ঝাঁকালেন তিনি, যেন পরিষ্কার করতে চাইছেন। তৈরিই ছিল রানা, ভারসাম্য হারাতে যাচ্ছেন দেখে তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

'আমার শীত করছে,' বললেন তিনি, তবে এখনও তাঁকে রানার পুরোপুরি সচেতন বলে মনে হচ্ছে না।

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে আপনাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি আমরা,' বলল রানা।

ঝাঁকি দিয়ে মাথা তুললেন তিনি। 'সন্ত্রাসীরা!'

'আপতত আপনি নিরাপদ।' ডক্টর নাদিরার বাহু দুটো একটু ডলে দিল রানা, রক্ত-চলাচল যাতে স্বাভাবিক হয়ে আসে। 'নড়াচড়া করুন,' বলল ও। 'শরীরটা গরম হবে।'

ধীরে ধীরে পা তুললেন ডক্টর নাদিরা, সাবধানে নামালেন, তারপরেই কাত হয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম করলেন। খপ করে ধরে ফেলল রানা।

আবার ঘড়ি দেখল ও। ভারতীয় এজেন্ট মানস অনেকক্ষণ হলো গেছে, তবে ডক্টর নাদিরাকে ফেলে তাকে খুঁজতে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। 'আরেকবার চেষ্টা করে দেখবেন হাঁটতে পারেন কি না?' ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'চেষ্টা করতে আমি বাধ্য,' বললেন ডক্টর নাদিরা। 'কারণ তুমি যে সেই ঢাকা পর্যন্ত আমাকে কাঁধে করে বয়ে নিতে পারবে, তার নিশ্চয়তা কী?' আড়চোখে দেখলেন রানাকে।

রানা চুপ করে আছে।

'শোনো, কাউকে আমি কিচ্ছুটি বলিনি!' চোখ দুটো কুঁচকে সরু হয়ে গেল ভদ্রমহিলার। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জিয়া ইন্টারন্যাশনালে পৌঁছে দাও আমাকে, ভাই। দুরন্ত ঈগলে এখনও কিছু কাজ বাকি আছে আমার, বুঝলে!'

'জী। আসুন।' ডক্টর নাদিরার হাত ধরল রানা, ট্রেইলের উপর দিয়ে ধীর পায়ে হাঁটিয়ে আনছে তাঁকে।

'তুমি খুব কম কথা বলছ,' অভিযোগের সুরে বললেন ডক্টর নাদিরা।

'আমরা কোনও শব্দ করব না, কেমন?' নরম সুরে বলল রানা। 'আশপাশে থাই টং থাকতে পারে।'

'থাই টং? মানে?'

'প্লিজ, ডক্টর। আস্তে।'

'থাই টং আমার কাছে কী চায়?' ট্রেইলের উপর দাঁড়িয়ে পড়লেন বিজ্ঞানী, তাঁর গলা আরও চড়ছে।

জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করল রানা, 'থাই থান্ডার আপনাকে নিয়ে কী করতে চেয়েছিল, জানেন আপনি?'

'ওরা আমাকে কিডন্যাপ করে এনেছে বেইজিং সরকারের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করার জন্যে,' বললেন ডক্টর নাদিরা।

'এর মধ্যে আরও জটিল অনেক ব্যাপার আছে, সে-সব আপনার না জানলেও চলবে,' বলল রানা। 'শুধু এটুকু জেনে রাখুন, থাই টং আপনাকে একটা পরাশক্তির হাতে তুলে দিতে চায়।'

'আমি যাতে তাদেরকে দুরন্ত বানাতে সাহায্য করি?'

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ রানাকে অবাক করে দিয়ে হেসে উঠলেন ডক্টর নাদিরা। হাসির ধরনটা এমনই, বুঝতে অসুবিধে হয় না যে তাঁর একেবারে ভিতর থেকে উঠে আসছে।

'হাসছেন যে?' কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না রানা।

'এখানে ভিলেনের ভূমিকায় কোন্ পরাশক্তি, তা আমি ভাল করেই জানি,' বললেন বিজ্ঞানী। 'খুব ভাল হত যদি ওদের হাতে ধরা পড়তাম আমি!'

'জী?' থতমত খেয়ে গেল রানা। 'ধরা পড়লে ভাল হত? কী বলছেন!'

'ঠিকই বলছি। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না তা হলে কী রকম ঘোল খাইয়ে দিতে পারতাম ওদেরকে!' এখনও হাসছেন ডক্টর নাদিরা।

www.MurchOna.com

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না,' স্বীকার করল রানা। 'তবে, এ-সব এখন থাক। চলুন, এই জায়গা ছেড়ে কেটে পড়া যাক। আমরা...'

'না, এক মিনিট থামো,' বলে হাঁ করলেন ডক্টর নাদিরা। মুখের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে মাড়ী থেকে টান দিয়ে বের করে আনলেন একটা দাঁত। 'এটার ভেতরে কি আছে জানো? সায়ানাইড। ওদের হাতে ধরা পড়ার পর এটা আমি স্রেফ গিলে ফেলব। ব্যস, ওদের সাধের গুড়ে বালি।'

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠল রানা। 'এ জিনিস কে দিয়েছে আপনাকে?'

'কেউ না,' বললেন ডক্টর নাদিরা, রানা বাধা দেওয়ার আগেই দাঁতটাকে আবার মাড়ীতে বসিয়ে ফেললেন। 'আমি নিজেই রেখেছি ওখানে– প্রয়োজন হলে ওদেরকে যাতে বোকা বানানো যায়।'

'তাই বলে নিজের জীবন দিয়ে?' বৃদ্ধাকে অপ্রকৃতিস্থ বলে মনে হচ্ছে রানার।

'হ্যাঁ,' হাসিমুখে মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রমহিলা। 'দামটা একটু চড়াই হয়ে যায়।'

হাঁটার গতি মন্থর দেখে তাঁকে ধরে প্রায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে রানা। এগোচ্ছেন তিনি, তবে এখনও এলোমেলোভাবে পা ফেলছেন। মাঝে-মধ্যে অন্ধকারে লুকানো গাছের শিকড়ে পা বেধে যাওয়ায় হোঁচট খাচ্ছেন, তবে রানা ধরে থাকায় আছাড় খাচ্ছেন না।

'আমার শক্তিতে আর কুলাচ্ছে না!' বলে হঠাৎ ট্রেইলের উপর বসে পড়লেন ডক্টর নাদিরা।

'ঠিক আছে।' ঝুঁকে তাঁকে আবার দু'হাতের মাঝখানে তুলে নিল রানা।

পরমুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠলেন ডক্টর নাদিরা।

হাতটা বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে, যেমন ক্ষিপ্র তেমনি লক্ষ্যভেদেও অব্যর্থ, আঘাত করল রানার ঘাড়ের পাশে।

ওর হাঁটু ভাঁজ হয়ে মাটি ছুঁলো, ডক্টর নাদিরার শরীরটা গড়িয়ে সরে গেল দূরে।

পরের আঘাতটা পিছন থেকে লাগল রানার খুলিতে, সম্ভবত রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারা হয়েছে।

রানার চেতনা দখল করে নিচ্ছে রাশি রাশি কালো মেঘ। মাথাটা যেন ভেঙে গেছে, ভিতরে প্রচণ্ড ব্যথা। চোখ বুজল ও। জ্ঞান হারিয়েছে।

চার

ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে কেউ। ভেজা কাপড় খুব নরম লাগছে রানার, আরও নরম হাতটা। যেন ব্যথায় ফুলে উলের একটা বেলুন হয়ে উঠেছে ওর মাথা। তবে কামরাটা বেশ গরম, পানির স্পর্শে আরাম লাগছে। ধীরে ধীরে মাথাব্যথাটা কমে যাচ্ছে।

'হ্যাঁ, ইনিই,' কিশোর যোধনের গলা চিনতে পারল রানা।

চোখ মেলল ও। থাই থান্ডারের সেফ হাউসে, লিভিং রুমে রয়েছে ও। কার্ড টেবিলটা উল্টে পড়ে রয়েছে, অসংখ্য বুলেটে ক্ষতবিক্ষত। মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে তাস, গড়াগড়ি খাচ্ছে বিয়ারের কয়েকটা বোতল।

এক দুই করে গুনল রানা, ছয়টা লাশ পড়ে রয়েছে কামরার চারদিকে। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে সবাই তারা থাই, নিশ্চয়ই

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

থান্ডারের সদস্য; প্রতিটি লাশের পাশে একটা করে একে-ফোরটিসেভেন।

তাদের মধ্যে এক তরুণীও রয়েছে– থান্ডার লিডার চক্রি চুয়ানের বান্ধবী চিত্রলেখা মাহিদল।

লাশগুলোর উপর আরেকবার চোখ বুলাল রানা। এখানে চক্রি চুয়ান নেই।

স্থানীয় কয়েকজন পুলিশ লাশগুলোর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মেঝে থেকে নিঃশব্দে তুলে নিচ্ছে অস্ত্র আর অন্যান্য এভিডেন্স।

'ইনিই আমাকে পাঠিয়েছিলেন,' আবার বলল যোধন, তার কচি মুখটা টান টান হয়ে আছে, চোখে-মুখে সন্ত্রস্ত ভাব। 'ইনি সুস্থ হয়ে উঠবেন তো?'

'আমি তেরোটা লাশ গুণলাম, সার,' কামরায় ঢোকার সময় এক পুলিশ রিপোর্ট করল। 'তার মধ্যে দুটো ওপরতলায়। একজনকে জীবিত পেয়েছি, তবে তার জখমও সিরিয়াস।'

রানার সামনে বসে থাকা পুলিশ অফিসার গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'খানিকটা সুস্থ বোধ করছেন?' রানাকে জিজ্ঞেস করল সে। 'কথা বলতে পারবেন বলে মনে হয়?'

'পারব,' শান্ত গলায় বলল রানা।

ইউনিফর্ম পরা মেয়েটির উদ্দেশে হাত নাড়ল অফিসার, এতক্ষণ যে রানার মুখ মুছিয়ে দিচ্ছিল। 'এখানে তোমার কাজ শেষ, বসুমতি,' বলল সে। 'ওদিকে যাও।'

মাথা ঝাঁকাল সুশ্রী মেয়েটি, তারপর একবারও রানার দিকে না তাকিয়ে পানির পাত্র ও ভেজা কাপড়ের টুকরোটা নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

'রাজধানী কুয়ালামালপুর থেকে গোটা বিষয়টা নিয়ে আজই আমাদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে,' রানাকে বলল অফিসার, নিজের চেয়ারে নড়েচড়ে বসল। 'আমরা অন্তত এটুকু জানি যে বাংলাদেশী এক বিজ্ঞানীকে কিডন্যাপ করে মালয়েশিয়ায় নিয়ে আসা হয়েছে, এবং ব্যাপারটার সঙ্গে থাই ক্রিমিনালদের কয়েকটা সংগঠন জড়িত। তারা যে কোটা বাহারুতে এসে জড়ো হয়েছে, এটা আমাদের কল্পনাতেও ছিল না। এবার আপনি বলুন।'

মাথাটা এখনও ব্যথা করছে রানার, কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। নিজের পরিচয় দিয়ে সংক্ষেপে জানাল কী কারণে কাদের পিছু নিয়েছে ও, কোত্থেকে আসছে, এখানে পৌঁছে কী দেখেছে। মানসের কথাও বলল।

সবশেষে বলল, 'ডক্টর আমার মনোযোগ কেড়ে নেন, সেই সুযোগে সম্ভবত থাই টঙের একজন সেন্ট্রি হামলা চালায়, আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।'

'তা হলে একজন ভারতীয় এজেন্টও নিখোঁজ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এখানে আপনাদের খুব বেশি কিছু করার আছে বলে মনে হয় না। ওরা বোধহয় গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে থাইল্যান্ডে ফিরে যাচ্ছে। যদি পারেন তো সীমান্তরক্ষীকে সতর্ক করে দিন।'

'ইয়েস, অফিসে পৌঁছে ওটাই আমার প্রথম কাজ হবে,' বলল অফিসার।

'যে লোকটা মারা যায়নি,' বলল রানা। 'আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাবল অফিসার, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। দোরগোড়ায় দাঁড়ানো কনস্টেবলের দিকে তাকাল সে। 'আহত লোকটা কোথায়? আমাদেরকে তার কাছে নিয়ে চলো।'

অফিসারের সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে এগোল রানা, অনুভব করল কে যেন ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ঘাড় ফিরিয়ে যোধনের দিকে তাকাল ও, হাসল, তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'দারুণ উপকার করেছ। ধন্যবাদ।'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

'আমি দুঃখিত,' হতভম্ব দেখাচ্ছে যোধনকে, কামরার চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে।

'হওয়ারই কথা। কিন্তু কারও কিছু করার ছিল না। তুমি বারান্দায় আমার জন্যে অপেক্ষা করো, ঠিক আছে?' তাকে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা। 'শহরে আমরা একসঙ্গে ফিরব, কেমন?'

মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল ছেলেটা। মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে।'

কামরায় ফিরে এল রানা, কনস্টেবল হাত তুলে পাশের বেডরুমটা দেখাল ওকে।

বেডরুমে ঢুকে রানা দেখল, মেঝেতে পড়ে থাকা আহত এক লোকের অবস্থা ভাল করে দেখবার জন্য হাঁটু গেড়ে রয়েছে পুলিশ অফিসার, ইউনিফর্মে রক্ত লাগার ভয়ে অত্যন্ত সতর্ক মনে হলো তাকে।

আহত লোকটাকে দেখেই চিনতে পারল রানা। চক্রি চুয়ান, ওরই ব্রাশ ফায়ারে আহত হয়েছে সে।

চক্রি চুয়ান রোগা-পাতলা, চেহারায় শান্ত একটা ভাব, চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। তার ডান কপালের পাশে একটা লাল জরুল দেখা যাচ্ছে। লোকটার অবস্থা সিরিয়াস বললে কিছুই বলা হয় না, এরকম বীভৎস দৃশ্য সারাজীবনে খুব কমই দেখেছে রানা। তার জখমের সঙ্গে চেহারার শান্ত ভাব একেবারেই খাপ খাচ্ছে না।

কাত হয়ে শুয়ে পেট থেকে বেরিয়ে আসা নিজের সমস্ত নাড়ীভুঁড়ির দিকে তাকিয়ে আছে চক্রি চুয়ান। পিচ্ছিল, টকটকে লাল রক্তের মধ্যে কেউ যেন স্তূপ করে রেখেছে ওগুলোকে।

লোকটার মুখে এমন কোনও রেখা বা ভাঁজ পড়েনি যেটা দেখে বোঝা যাবে ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে সে। গান পাউডারের দাগ ফুটে রয়েছে শরীরের সামনের অংশে। সেলাই করবার প্যাটার্ন ধরে বুক থেকে নাভি পর্যন্ত ফুটো তৈরি করেছে বুলেটগুলো।

পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল চক্রি চুয়ান।

'কী খবর?'

চেহারায় কোনও ভাব নেই, চক্রি চুয়ান এত নিচু গলায় কথা বলল যে কোনও রকমে শুনতে পেল ওরা। 'যার আয়ু শেষ তার খবর জেনে কী হবে?'

'মিস্টার রানা,' পুলিশ অফিসার বলল, 'আপনি একে চেনেন?'

'ঢাকা থেকে ওর চেহারার বর্ণনা পেয়েছি,' বলল রানা। 'আমার গুলি খেয়েই ওর এই অবস্থা। ভাল কথা, আপনার লোকদের বাড়ির পুব দিকে তল্লাশি চালাতে বলে দিন। এখানে আসার সময় ওদের দুজন সেন্ট্রিকে অজ্ঞান করে রেখে এসেছিলাম। একজনের নাম টাকসিন, তার সঙ্গীর নাম জানি না।'

'ফিবুন সংগত,' চিঁ চিঁ করে বলল চক্রি চুয়ান।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা কনস্টেবলের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল অফিসার। তল্লাশি চালাতে চলে গেল লোকটা।

'তাইম আনন্দ... এবং আর যারা ঢাকায় গিয়েছিল?' প্রশ্ন করল রানা, বীভৎস দৃশ্যটার দিকে বাধ্য হয়ে তাকিয়ে আছে।

'পাশের কামরায়,' বিড়বিড় করল চুয়ান।

'অন্তত এই কেসে আম আর ছালা, দুটোই হারিয়েছ তোমরা,' বলল রানা। 'টং পুরো পেমেন্ট করেনি, বেইজিঙের কাছ থেকেও মুক্তিপণ আদায় করতে পারলে না...'

হাসতে চেষ্টা করে পারল না চুয়ান। 'তুমি কৌশলে আমার কাছ থেকে তথ্য পাবার চেষ্টা করছ।' মাথা নাড়ল সে। 'যদি ভেবে থাকো আমি মারা যাচ্ছি বলে থাই থান্ডার শেষ হয়ে গেল, ভুল করবে।'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

'সব মিলিয়ে এই বাড়িতে তোমাদের লাশ পাওয়া গেছে তেরোটা, তোমাকে বাদ দিয়েই। নেতৃত্ব দেয়ার মত আর থাকল কে!'

'আমাদের আরও বহু যোগ্য লোক আছে।'

'আমার ধারণা,' বলল রানা, 'তোমার বান্ধবী চিত্রলেখা আমাদের এক এজেন্টকে হোটেল শেরাটনে খুন করেছে আজ।'

'ঠিক করেছে! আমিই তাকে নির্দেশ দিই!' বলল চুয়ান। 'আমাদের এই আস্তানার খোঁজ পেয়ে গিয়েছিল সে।'

'এই মাত্র দেখলাম পাশের ঘরে মরে পড়ে রয়েছে চিত্রলেখা,' বলল রানা। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ?'

'খানিক পরেই আমাদের আত্মা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবে।'

সে থামতেই অফিসার বলল, 'তুমি যদি মিস্টার রানার সঙ্গে সহযোগিতা করো, তোমাকে আমরা হাসপাতালে পাঠাব।'

'হুঁহ্, আমাকে যেন মেরামত করা যাবে!' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল চুয়ান।

'তুমি জানো,' জিজ্ঞেস করল রানা, 'ডক্টর নাদিরাকে কোথায় নিয়ে গেছে থাই টং?'

'আমাকে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না?' বলল চুয়ান। 'জানলেও তোমাকে আমি বলতাম না।'

অফিসারের দিকে তাকাল রানা। 'ওকে ইন্টারোগেট করার দরকার আছে। বাঁচবে কি না ডাক্তাররাই ভাল বলতে পারবেন, আপনি এখনই একটা অ্যামবুলেন্স ডেকে ওকে হাসাপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন, প্লিজ।'

এই প্রথম চুয়ানের চোখে একটা ভাব দেখতে পেল রানা– ঘৃণা। রানাকে দেখছে সে।

মাথা ঝাঁকাল অফিসার।

'আরেকটা কথা,' বলল রানা। 'শুনলেনই তো যে ওর বান্ধবী আমাদের এক এজেন্টকে খুন করেছে। আপনি জানেন, লাশটা এয়ারপোর্টে পাঠানো হয়েছে কি না?'

'সত্যি আমি দুঃখিত, এত কম বয়েসে মারা গেলেন তিনি। আমি নিজে ছিলাম লাশের সঙ্গে, মিস্টার রানা,' বলল অফিসার, দাঁড়াল। 'প্লেন টেকঅফ করার পর এয়ারপোর্ট থেকে ফিরেছি।'

তার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল রানা। 'ধন্যবাদ।'

'আমার লোককে বলি, শহরে পৌঁছে দিক আপনাকে, মিস্টার রানা?'

নরম একটা আওয়াজ হলো কামরার ভিতর, যেন বড় করে শ্বাস নিতে চেষ্টা করল কেউ। দুজনেই ওরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

চোখ খোলা, তবে মণি স্থির হয়ে গেছে চুয়ানের। এক ধরনের স্বস্তি অনুভব করল রানা– যাক, মারা যাওয়ার পর লোকটাকে অন্তত কষ্ট-না-পাওয়ার অভিনয় করতে হচ্ছে না।

'আপনার মাথার অবস্থা বিশেষ ভাল নয়,' করিডর ধরে হাঁটার সময় রানাকে বলল অফিসার। 'ডাক্তারকে একবার দেখানো দরকার।'

'ব্যথাটা কমেছে,' বলল রানা। 'আগে আমাদের বিজ্ঞানীকে খুঁজে বের করি, তারপর ডাক্তারের কাছে যাব।'

'ভুলবেন না। আপনারও কিন্তু বয়স খুব কম।'

পাঁচ

হোটেল তাজমহল। শেষ রাত।

www.MurchOna.com

নিজের স্যুইটে ফিরে এসে শাওয়ার সারল রানা, তারপর ক্ষতগুলোর যত্ন নিল। কাপড়চোপড় পরে নিজের সুটকেসটা গুছাল, পাশের স্যুইটে ঢুকল মানসের জিনিস-পত্র নেওয়ার জন্য। দু'হাতে দুটো সুটকেস নিয়ে নীচে নেমে বিল মেটাল দুজনের।

তরুণ ক্লার্ক পেটব্যথার অজুহাতে ডিউটি ছেড়ে চলে গেছে, তার জায়গায় নতুন একটা মেয়ে রয়েছে রিসেপশন কাউন্টারে। রানার ধারণা, মানসের ভুল মৃত্যুসংবাদ দেওয়ার পর ওর মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে ক্লার্ক, তাই পালিয়েছে।

সুটকেস দুটো নিয়ে তাজের গ্যারেজে চলে এল রানা।

রানার ধারণা, মানসের ষষ্ঠইন্দ্রিয় এতটাই সতর্ক, টং সেন্ট্রির উপস্থিতি আগেভাগে টের পেয়ে তাকে এড়াতে কোনও অসুবিধে হয়নি ওর, ফলে রানার মত আহত হতে হয়নি ওকে। তবে অবশ্য ওদের হাতে ধরা পড়েও থাকতে পারে।

রানার বিশ্বাস, ডক্টর নাদিরার সঙ্গে মানসকেও ধরে নিয়ে গেছে থাই টং। যাই ঘটে থাকুক, তার জিনিস-পত্র নিজের হেফাজতেই রাখবে রানা।

পোর্শ-এর পাশে রেন্ট-আ-কার কোম্পানির একটা মার্সিডিজ রয়েছে, ওটার সামনের সিটে বসে রয়েছে মেয়েটি। রেশমের মত কালো চুল এখন আবার মাথার উপর স্তূপ করা। গায়ের রঙ ঠিক যেন মধু। হলুদ আর নীল ফুলে ভরা স্কার্ট পরেছে, তার উপর কোট।

'মাসুদ রানা।' হাসল উত্তরা উৎকর্ণা।

'হ্যালো, উত্তরা।' পোর্শ-এর পিছনের দরজা খুলে সুটকেস দুটো ভিতরে রাখল রানা, তারপর সামনের দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। আর কিছু না বলে প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজাটা খুলল। অপেক্ষা করছে।

মার্সিডিজ থেকে নেমে দরজা বন্ধ করল উত্তরা, লক করল, তারপর ঘুরে ঢুকে পড়ল পোর্শ-এ। 'ব্যাংকক যাচ্ছ?' ছোট ডাফ্‌ল্ ব্যাগটা কোলের উপর রাখল সে।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'তুমি জানলে কীভাবে আমি এখানে?'

'বিজনেস সিক্রেট,' বলে হাসল উত্তরা। 'লং ড্রাইভের জন্যে দারুণ একটা রাত, কি বলো? বিশেষ করে আকাশে যখন আধখানা চাঁদ রয়েছে।'

গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এসে যানবাহনের দ্রুতগতি স্রোতে মিশে গেল পোর্শ। থাই সীমান্তের দিকে যাচ্ছে ওরা। 'সব খবরই রাখো মনে হচ্ছে।'

কথা না বলে মৃদু হাসল উত্তরা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটাল

'লাবণীকে আমি খুন করিনি,' অবশেষে বলল উত্তরা।

'জানি। করেছে থাই টঙের চিত্রলেখা, নটিকাল স্টোরে ঢুকে যে মেয়েটিকে তুমি ফাঁকি দাও।'

'ও, ওই মেয়েটা! কিন্তু ও কেন আমার পিছু নেবে?'

'ওর বোধহয় ধারণা হয়, তুমি ওকে খুনটা করতে দেখে ফেলেছ, পুলিশকে ওর চেহারার বর্ণনা দিতে পারবে। তোমার উপস্থিতি টের পেয়ে হোটেল থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়, তারপর মেইন রোডে লোকজনের ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তুমি ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার পর তোমার পিছু নেয়। তোমাকে কোথাও একা পাবার আশায় ছিল, যাতে খুন করতে পারে।'

নিজের গলায় একটা হাত তুলল উত্তরা, হঠাৎ করে চুপ হয়ে গেছে। 'ওকে আমি আগে কখনও দেখিনি। কেন পিছু নিয়েছে তা-ও বুঝতে পারিনি।' শ্রাগ করল সে। 'লাবণীর লাশ দেখার পর আমি খুব নার্ভাস ছিলাম।'

'সেজন্যেই বোধহয় আমাকেও তুমি চিনতে পারনি,' বলল রানা। 'নাকি পেরেছিলে?'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

'না।'

'তবে বুকস্টোরের মালিক পরে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন,' বলল রানা।

'আমাকে শুধু বললেন তোমাকে খুব সন্দিহান মনে হয়েছে।'

'থাই কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর ফ্রন্ট, ক্যামফ্লাজ আরও নিখুঁত হওয়া উচিত ছিল।'

'দুর্বল একটা দেশে পরাশক্তি ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকলে কত রকমের অসুবিধে দেখা দেয়, বলে বোঝানো কঠিন,' বলল উত্তরা। 'আমাদের ইন্টেলিজেন্স দু'ভাগ হয়ে গেছে; একটা গ্রুপ ওদের পক্ষে, তারাই শক্তিশালী। এ-সব ব্যাপারে তাদের কোনও নজর নেই।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সে। 'যাক গে। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি খুশি, রানা।'

'খুশি আমিও,' বলল রানা। 'যদিও কিছুক্ষণের জন্যে মনে হয়েছিল তুমিই বোধহয় আমাদের লাবণীকে খুন করেছ।'

'আমরা বান্ধবী ছিলাম, লাবণী আমাকে শাড়ি পরা শিখিয়েছে,' বলল উত্তরা। 'আমাদের রাজপ্রাসাদে বেশ কয়েক রাত কাটিয়েছে ও।'

'আমার জানা ছিল না।'

থাই-মালয়েশিয়া সীমান্ত পশ্চিমদিকে, নদী পেরিয়ে সেদিকে না গিয়ে দক্ষিণে যাচ্ছে রানা। সোজা পথে সীমান্ত না পেরিয়ে একটু ঘুরপথ ধরা উচিত বলে মনে করছে ও।

অন্ধকার গ্রাম্য এলাকার ভিতর দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে পোর্শ, দু'পাশে তারা জ্বলা আকাশে মাথা তুলে আছে নিচু পাহাড়। আধখানা চাঁদ এখন দিগন্তে ঢলে পড়েছে।

'দোই ইনথানন পাহাড়ে তুমি আমাকে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছিলে,' বলল রানা। 'সেগুলো আমার কাজে লেগেছে। ধন্যবাদ।'

'তার মানে কি দুর্গে ঢুকেছ তুমি?' প্রায় রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল উত্তরা। 'জেট প্লেনটা তুমিও দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তেরপল আর ফোমে ঢাকা অবস্থায়,' বলল ও। 'ঢাকায় থাই থান্ডারের যারা অপারেশনে গিয়েছিল, তারা প্রায় সবাই মারা গেছে। ওদের সঙ্গে চিত্রলেখাও।'

'এই পরিচ্ছন্নতা অভিযান আসলে আমাদের চালাবার কথা,' বলল উত্তরা। 'কাজটা আমাদের হয়ে তুমি করে দিচ্ছ, সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'না, আমি একা নই,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'বেশিরভাগই ওরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরছে।'

'তাই বা মন্দ কী!' হাসল উত্তরা। একটু পর বলল, 'প্লেনটাকে আবার কিন্তু বাইরে বের করে আনা হয়েছে।'

ঝট করে তার দিকে তাকাল রানা। 'মানে? কেন?'

'কারণটা অবভিয়াস নয়?' রানার আশঙ্কাটাই সমর্থন করছে উত্তরা। 'পাখিটাকে নিয়ে উড়াল দেবে ওরা।'

'তুমি তো এখানে, খবরটা পেলে কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল উত্তরা। 'ভুলে গেলে ওখানে আমাদের প্রজারা বাস করে?'

'বাইরে বের করে কোথায় রেখেছে?'

'যেখানে আগে ছিল, লুকানো রানওয়েতে,' বলল উত্তরা। 'অন্তত শেষ খবরে তাই জেনেছি। কৌতূহলী পর্যটক ছাড়াও কিছু লোকজন যাচ্ছে ওদিকের উপত্যকায়, কেউ তারা ফিরছে না। আমার ধারণা, সবাইকে মেরে ফেলা হচ্ছে।'

'এ-সব কি প্রজারা রিপোর্ট করছে তোমাকে?'

'হ্যাঁ,' বলল উত্তরা। 'তবে আমাদের নায়েব কাকা ব্যাপারটা বিশেষ পছন্দ করছেন না। প্রজাদেরকে এ বিষয়ে কৌতূহলী না হতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বাবার বন্ধু, তাঁর সঙ্গে আমি তর্ক করতে পারি না।'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

'তার মানে আর কোনও খবর আসছে না?'

শ্রাগ করল উত্তরা। 'তবে সর্বশেষ খবর যেটা পেয়েছি সেটা সত্যিই মারাত্মক।'

উত্তরার দিকে তাকাল রানা। 'কী রকম?'

'আবার আগুন লেগেছে পাহাড়ের কয়েক জায়গায়,' বলল উত্তরা। 'প্রজারা দেখেছে আগুন লাগার একটু পরেই প্লেনটা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে শ্বেতাঙ্গ ক্রুরা, অস্থির আর উদভ্রান্ত লাগছিল ওদেরকে।'

'তার মানে আগুন লাগানোর জন্যে হয়তো ওরাই দায়ী,' বলল রানা।

'এর আরেকটা মানে আছে,' বলল উত্তরা। 'প্লেনটাকে ওরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। যা করতে চাইছে, উল্টো হয়ে যাচ্ছে।'

'কেউ মারা গেছে?' জানতে চাইল রানা।

'না,' বলল উত্তরা। 'প্রথমবার যেখানে আগুনটা লেগেছিল, এবার লেগেছে ঠিক তার উল্টোদিকে। আমার ওই জেটটাকেই দায়ী বলে মনে হচ্ছে।'

'হুম।' চিন্তায় পড়ে গেল রানা। ওর অ্যাসাইনমেন্টে দুর্গের ওই জেট প্লেনটার কী যেন একটা গুরুত্ব আছে। তবে সাধারণ একটা জেট প্লেন ওরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না কেন? নাকি ওটা সাধারণ কোনও প্লেন নয়? এখন হয়তো নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না শ্বেতাঙ্গ পাইলট আর ইঞ্জিনিয়াররা, কিন্তু পারতে কতক্ষণ? তখন তো ওটা উড়ে ওর নাগালের বাইরে চলে যাবে।

না, কিছু একটা করা দরকার। এখনই!

থাই-মালয়েশিয়া সীমান্ত এখান থেকে আরও চল্লিশ কিলো পশ্চিমে, ওটার সঙ্গে সমান্তরাল একটা রেখা ধরে একশো কিলোমিটারের বেশি চলে এসেছে পোর্শ।

এখনও বাঁক নেয়নি রানা, সরাসরি সীমান্তের দিকে যাচ্ছে না। সিদ্ধান্ত নিল, সামনের কোনও শহরে থামবে ও, ফোন করবে বেইজিং-এ। চিনই বর্তমানে দ্বিতীয় পরাশক্তি, দুনিয়ার যে-কোনও জায়গার উপর নজর রাখবার প্রযুক্তি তাদের আছে।

'বলতে পারবে,' উত্তরাকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'বেইজিঙে এখন কটা বাজে?'

'মালয়েশিয়ার সঙ্গে চিনের সময়ের পার্থক্যটা আমার জানা নেই,' বলল উত্তরা। 'তবে আমরা তো থাইল্যান্ডের কাছাকাছি রয়েছি, তাই না? ব্যাংককের ঘড়িতে এখন সকাল সাতটা হলে বেইজিঙের ঘড়িতেও তাই।'

ছোট একটা শহরে ঢোকার মুখেই পাওয়া গেল পে বুদ, সরকারী হাসপাতালের ঠিক পাশেই। চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের নম্বরে ডায়াল করে নিজের পরিচয় দিল রানা, তারপর সরাসরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ফুচুংকে চাইল, যদিও জানে ওকে সম্ভবত বলা হবে এত সকালে অফিসে আসেনি সে। সেক্ষেত্রে তার মোবাইল নম্বর চাইতে হবে ওকে।

ঠিক যা ধারণা করেছে রানা। সিএসএস হেডকোয়ার্টার থেকে ওকে বলা হলো, 'অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফিসে নেই, তবে তিনি বলে গেছেন আপনি খোঁজ করলে আমরা যেন আপনাকে তাঁর মোবাইল নম্বর দিই। লিখে নিন, প্লিজ।'

মোবাইল নম্বরে ডায়াল করল রানা। দু'বার রিঙ হওয়ার পরেই ফুচুঙের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'কী ব্যাপার, দোস্ত? তোর পোর্শ সীমান্ত পেরুচ্ছে না কেন?'

'মানে?' আকাশ থেকেই পড়তে হলো রানাকে। 'আমি কোথায় তুই কীভাবে জানলি?'

অপরপ্রান্তে হাসল ফুচুং। 'আমি যে শুধু তোর কল পাবার অপেক্ষায় আছি, তা নয়, সেই সঙ্গে তোর গতিবিধিও মনিটর করছি। আমার কাছে খবর আছে, ভোর রাতে থাইল্যান্ডের কোনও এক আদিবাসী রাজার মেয়েকে নিয়ে তাজমহল

www.MurchOna.com

ছেড়েছিস তুই।'

'মনিটর করছিস?' রানার গলায় সতর্কতা। 'কীভাবে শুনি?' 'নানাভাবে। শুধু একটার কথা বলি, তোর গাড়িতে ব্লিপার আছে।'

'তা-ই বল্!' এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো রানার কাছে। 'তার মানে ওই ব্লিপার আর গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের সাহায্য নিয়ে বেইজিঙে বসে দেখতে পাচ্ছিস কোথায় রয়েছে পোর্শ।'

'ঠিক তাই, তবে বেইজিঙে বসে নয়। আমরা এখন অন্য দেশে রয়েছি, সময় হলে জানাব কোথায়। আর, এটা গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম-এর চিনা সংস্করণ।' ফুচুঙের শ্বাস ফেলার আওয়াজ ভেসে এল। 'কী খবর, এবার তাই বল্। আমরা খুব দুশ্চিন্তায় আছি। কোনও কোনও ব্যাপারে কৌতূহলেও।'

'কৌতূহল আবার কী নিয়ে?'

'এই যেমন ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিসকে নিয়ে,' বলল ফুচুং।

'ওদের একজন জুটে গেছে আমার সঙ্গে। আচ্ছা, ওদের সম্পর্কে ঠিক কী ভাবছিস তোরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জানিসই তো, এশিয়ায় এক-ঘর-মে-দো-পির পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে চলেছে?'

'হ্যাঁ, আজ হোক আর দুদিন পর, ভারতও সুপারপাওয়ার হতে চলেছে,' বন্ধুর কথায় সায় দিল রানা। 'তবে এই কেসটায় ওরা সম্ভবত কারও প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চাইছে না, মনে হয় সাহায্যই করবে। অন্তত আমার তাই ধারণা হয়েছে।'

'আমরাও সেরকম আভাস পাচ্ছি,' বলল ফুচুং। 'সেটা সত্যি হলে ব্যাপারটাকে আমরা অ্যাপ্রিশিয়েট করব।' একটু থেমে যোগ করল, 'এই মেসেজ তুই মিস্টার মানসকে জানিয়ে দিতে পারিস।'

'তবে সেটা সত্যি না হওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা আছে, এরকমও ভাবছিস, নাকি?'

'ঠিক ধরেছিস,' হাসল ফুচুং। 'এবার খবর শোনা।'

'বেশ,' বলল রানা। 'শোন্ তা হলে। এদিকের খবর ভাল নয়।' সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাল রানা বন্ধুকে, তারপর ব্যাখ্যা করে বলল কী চায় ও। বক্তব্য শেষ করল এভাবে, 'যদি দেখা যায় প্লেনটাকে নিয়ে দুনিয়ার আরেক মাথায় চলে যাচ্ছে ওরা, পারলে আকাশ থেকে ফেলে দিতে হবে ওটাকে।'

এক সেকেন্ড পর ফুচুং জানতে চাইল, 'আর কী?'

'আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দরকার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব,' বলল রানা।

'বল্।'

'তোরা যাদের কাছে ঈগল বিক্রি করেছিস, তাদের প্রত্যেকের বিমানঘাঁটিতে সরেজমিনে তদন্ত করে দেখা দরকার সবগুলোর হিসেব ঠিক আছে কি না, আমি জানতে চাই কোনও প্লেন খোয়া গেছে কি না। সম্ভব?'

'রানা, তোর প্রশ্নের জবাব এখনই জেনে নে,' বলল ফুচুং। 'আমাদের নিজেদের একটা কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করে দেখে এসে রিপোর্ট করেছে। আমরা যে-সব দেশকে যে-কটা ঈগল বিক্রি করেছিলাম সবগুলোরই হিসাব পাওয়া গেছে, শুধু একটি দেশের একটি ঈগলকে আমাদের সদস্যদের দেখার সুযোগ হয়নি।'

'কেন?' জানতে চাইল রানা।

'ওরা বলছে, ওই ঈগলটায় যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়ায় একটা হ্যাঙ্গারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মেরামত করার জন্যে। হ্যাঙ্গারটা ওদের কোনও গোপন ঘাঁটিতে, তাই আমাদেরকে নিয়ে যেতে রাজি হয়নি ওখানে, আমরাও জোর-জবরদস্তি করতে পারিনি।'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

হতাশ বোধ করল রানা। সন্দেহ নিরসন হচ্ছে না। 'দেশটার নাম জানতে পারি?'

'হয়তো পরে কোনও দিন,' জানাল ফুচুং।

'ওরা যদি সত্যি কথা বলে তা হলে দোই ইনথাননে ওটা কী?' রানা বিমূঢ়। 'কোত্থেকে এল?'

'দোস্ত,' ধীরে ধীরে বলল ফুচুং, 'প্রশ্নটার জবাব তোর কাছ থেকে পাব বলে আশা করছি আমি।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমরা সবাই।'

'হুম।'

'আর কিছু?' জিজ্ঞেস করল চিনা সিক্রেট সার্ভিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর।

'আপাতত আর কিছু নয়।'

'যে সাহায্যই লাগুক, সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে তোর খুব কাছাকাছি তৈরি হয়ে আছি আমরা,' বলল ফুচুং। 'চাওয়া মাত্রই পাবি। শর্ত একটাই, দোস্ত, আমার মুখ যেন রক্ষা হয়। তোকে নিয়ে আমাদের ওপর মহলে এত বোলচাল মেরেছি...'

'জানি,' বলল রানা, 'তোর যা স্বভাব!'

'তারপরও বলছি– ডক্টর নাদিরাকে আমরা ফেরত চাই,' বলল ফুচুং। 'আমরা মানে, ঢাকা এবং বেইজিং। একটা কোড দিচ্ছি, মুখস্থ করে রাখ্।' কোডটা বলবার পর রানাকে দিয়ে উচ্চারণ করাল সে, তারপর বলল, 'আপাতত বিদায়, দোস্ত।'

'আপাতত।'

ছয়

গাড়িতে ফিরে এসে রানা বলল, 'তুমি বলছিলে পাহাড়ে নতুন করে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে।'

'ভাগ্যই বলতে হবে, ওই আগুনে নতুন করে বানানো কুঁড়েগুলোর কোনও ক্ষতি হয়নি।' মুখের সামনে হাত রেখে হাই তুলল উত্তরা। 'খুব ক্লান্তি লাগছে। মনে করতে পারছি না শেষ কখন ঘুমিয়েছি।' সিটে হেলান দিল সে।

'আমারও একই অবস্থা। ব্যাংককে ফিরি, হোটেলে উঠে লম্বা ঘুম দেব।'

মাথাটা রানার কাঁধে ঠেকাল উত্তরা। 'একা?'

মৃদু হাসল রানা। 'না, পাশে রাজকন্যেকে নিয়ে।'

চোখ বুজল উত্তরা। 'তবে,' ঘুম জড়ানো গলায় বলল, 'ব্যাংককে নয়।'

'মানে?' ভ্রূ উঁচু করল রানা। 'ব্যাংককে নয়তো কোথায়?'

প্রশ্নটার কোনও উত্তর পাওয়া গেল না, কারণ এরইমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে উত্তরা।

নির্জন হাইওয়ে ধরে তীরবেগে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। পুবের আকাশ প্রথমে ফরসা হলো, তারপর রাঙা। নদীটাকে অনেক আগেই পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। এখনও দক্ষিণে ছুটছে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

পোর্শ।

ওর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে উত্তরা, ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কী সব বলছে। একবার বলল, 'সত্যশুভ চুনাভান, সার!'

মেয়েটার গায়ের সেন্টে ভরে আছে গাড়ির বাতাস, নতুন ওঠা সূর্য আর ঘাসের ডগায় লেগে থাকা শিশিরবিন্দু তাতে আশ্চর্য একটা মাদকতা এনে দিয়েছে।

ঘুম ভাঙার পর বিড়ালের মত আড়মোড়া ভাঙল উত্তরা। 'স্বপ্ন দেখছিলাম,' বলে অলস একটু হাসল। 'তোমাকে।'

'কী করছিলাম আমরা?'

উত্তরার ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। 'এতই যখন আগ্রহ, গাড়িটা আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে মহাশয় একটু ঘুমিয়ে নিন, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখুন– ব্যস, তা হলেই জেনে যাবেন কী করছিলাম।'

'আমাকে নিজে দেখে নিতে হবে? এমন কাজই করছিলাম, মুখে আনতে পারছ না?'

রানার কাঁধে হালকা একটা ঘুসি মারল উত্তরা।

'লাবণী সম্পর্কে এখনও কিছু বলোনি তুমি আমাকে,' মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে বলল রানা। 'থাইল্যান্ড থেকে কোটা বাহারুতে এসে খুব ব্যস্ত ছিল ও, হোটেলে নাম লিখিয়েই কোথায় যেন চলে গিয়েছিল।'

'গিয়েছিল আমার কাছে,' বলল উত্তরা। 'তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না, তাই ভাবলাম লাবণীর মাধ্যমে কিছু তথ্য দিই। শুনে আমার হোটেলে চলে আসে ও।'

'কিন্তু পরে তুমিও তার হোটেলে যাও। গিয়ে দেখো চেয়ারে তার লাশ। কেন?'

'লাবণী তার পার্সটা আমার হোটেল রুমে ফেলে গিয়েছিল,' বলল উত্তরা। 'ও বেরিয়ে যাবার সাত থেকে দশ মিনিটের মধ্যে আমার চোখে পড়ে ওটা। ভেতরে প্রচুর টাকা, একটা নোটবুক, এই সব ছিল। কাজেই তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি নিয়ে শেরাটনে চলে যাই। গিয়ে দেখি...' নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল সে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে ওর হাতে ধরিয়ে দিল রানা। উত্তরা চোখ মুছল। 'কী তথ্য, উত্তরা?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল ও।

নিজেকে সামলে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল উত্তরা। কচি রোদ লেগে ঝলমল করছে ঢেউ খেলানো ধানখেত, মাইলের পর মাইল। এরই মধ্যে দু'একজন কৃষক গরু ও লাঙল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে খেতের কাজে।

'আমরা ব্যাংককে যাচ্ছি না, রানা,' বলল উত্তরা। 'যাচ্ছি চিয়াং মাই-এ।'

রানা ভাবছে– চিয়াং মাই বেশ বড় শহর, ব্যাংকক থেকে প্রায় ছয়শো কিলোমিটার দূরে। 'কেন।'

'চিয়াং মাই থেকে দোই ইনথানন আর টং দুর্গ একদম কাছে, মাত্র কয়েক কিলোমিটার...'

'তা জানি।'

'মোহনা কৃত্তিকাচরণের কথা মনে আছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল উত্তরা। 'রানা এজেন্সির শাখাপ্রধান ইমরুল কায়েসের সঙ্গে যার বিয়ে হবার কথা ছিল?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কেন মনে থাকবে না!' এক ধরনের তৃপ্তি অনুভব করল ও, মনে মনে ছেলেটার উদ্দেশে বলল– তোমার খুনিকে আমরা ছাড়িনি, ইমরুল!

'আমাদের অপারেশন্স চিফ, সত্যশুভ চুনাভান, ওখানে ডিউটিতে পাঠিয়েছে মোহনাকে। ওখানে মানে... ওখানকার একটা ব্রথেল-এ।'

'কেন, কী আছে ওখানে?'

'ওটা খুব নামকরা ব্রথেল,' বলল উত্তরা। 'শুধু গডফাদাররা আসা-যাওয়া করে। আর যায় বিদেশিরা। কারা, আশা করি বুঝতেই পারছ– যে-সব বিদেশি কাছাকাছি আছে। তারা খদ্দের

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

হিসেবে ওখানে যায়, আর বকবক করে। সে-সব রেকর্ড করা হয়। ওগুলোয় গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য থাকলে সত্যশুভ চুনাভানকে রিপোর্ট করা হয়।' বড় করে একটা দম নিল সে। 'মোহনা ওখানে তোমাকে ডেকেছে।'

'কেন?' রানার কণ্ঠস্বরে একটু যেন সন্দেহ। নাকি দ্বিধা?

'কেন, সেটা ওখানে গিয়ে তার মুখ থেকে শুনতে হবে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল উত্তরা। 'এই মেসেজটাই তোমার কাছে পৌঁছানোর জন্যে লাবণীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম আমি। এখন তুমি যাবে কি না, সেটা তোমার ব্যাপার।'

'ঠিক আছে, সীমান্ত পেরিয়ে থাইল্যান্ডে আগে ঢুকি, তারপর সিদ্ধান্ত নেব,' বলল রানা। 'মোহনা হয়তো এমন কিছু জানে, যা আমাদের নিখোঁজ বিজ্ঞানীর হদিস পেতে সাহায্যে আসবে।'

'তিনি এখন থাই টঙের হাতে,' বলল উত্তরা।

রানা চিন্তিত। 'উপত্যকার ওই জেট আর ডক্টর নাদিরার মধ্যে কী যেন একটা কানেকশন আছে।'

'কেন তোমার এ-কথা মনে হচ্ছে?'

'তোমাদের পাহাড়ে ওই রহস্যময় আগুন লাগছে দেখে। ওগুলোর জন্যে দায়ী লেযার,' বলল রানা। 'ডক্টর নাদিরা লেযার সম্পর্কে একজন এক্সপার্ট।'

পরিষ্কার আকাশ। সীমান্তের দিকে বাঁক নেওয়ার পর থেকে সূর্য ওদের পিছনে। মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক পাখি। হাইওয়েতে এখন তরি-তরকারি আর মাংস ঠাসা ট্রাক দেখা যাচ্ছে প্রায়ই।

ক্যামপং লালুক শহরটাকে পাশ কাটিয়ে এসে হঠাৎ করে দ্রুত হুইল ঘোরাল রানা, হাইওয়ে ছেড়ে সরু একটা সাইড রোডে ঢুকে পড়ল পোর্শ।

তাড়াতাড়ি ড্যাশবোর্ড আঁকড়ে ধরল উত্তরা, জানালা দিয়ে তাকাতে একটা রোড সাইন দেখতে পেল: ক্যামপং কোচি–দশ কিলোমিটার।

'সামনে সীমান্ত,' বলল রানা। 'আমার কাছে নানা ধরনের কাগজ-পত্র আছে, তবে কোনও মেয়ের কাজে লাগবে না। তোমার কী অবস্থা?'

দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণ কামড়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল উত্তরা।

'ঠিক যা ভেবেছি,' হাসিমুখে বলল রানা। 'পাহাড়ী ট্রেইল ধরে সীমান্ত পেরুতে অভ্যস্ত তুমি।' উত্তরার হাঁটুতে মৃদু চাপড় মারল ও।

উঁচু-নিচু ট্রেইল ধরে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট সাবধানে গাড়ি চালাল রানা। ধুলোময় গ্রাম্য পথে গরুর গাড়ি চলছে, পাশের খেতে লাঙল দিচ্ছে চাষী, আড়াআড়িভাবে হেলেদুলে রাস্তা পেরুচ্ছে হাঁসের ঝাঁক, মাথায় খাবারের পোঁটলা নিয়ে আল ধরে হাঁটছে চাষীবউ; এ-সবের মাঝখানে ঝলমলে পোর্শটা একেবারেই বেমানান, যেন ভিনগ্রহের ইউএফও।

ধুলোর ধূসর একটা মেঘ, দিগন্তকে ঢেকে দিচ্ছে, উত্তরার আগে রানাই প্রথম দেখতে পেল। এখন ওরা থাইল্যান্ডে। এখান থেকে হাইওয়ে পনের মিনিটের পথ। তবে হাইওয়ের নিরাপত্তা আর ওদের মাঝখানে ছোট একটা ভেহিকেল দেখা যাচ্ছে।

'মোটরসাইকেল,' অবশেষে আন্দাজ করতে পারল রানা।

দ্রুত মুখ তুলল উত্তরা। রানার হাত থেকে বিনকিউলারটা নিয়ে চোখে তুলল। 'সর্বনাশ, লক্ষণ ভাল নয়!' নার্ভাস হয়ে পড়ল ও, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুতে চাইছে না। 'এখানে থাই ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ কেন?'

'থাই ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ?' রানার গলায় সন্দেহ।

'আমি শিওর।'

'এত দূর থেকেও চিনতে পারছ? কীভাবে?'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

'চিনছি ব্রাউন সাফারি সুট আর মোটরসাইকেল দেখে,' বলল উত্তরা। 'থাই ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ-এর ড্রেস ওটা।'

'তার মানে তোমার পরিচিত,' বলল রানা। 'লক্ষণ ভাল নয় বলছ কেন?'

'না, পরস্পরকে আমরা চিনব না। এরা শুধু দেশের ভেতরে, বিশেষ করে সীমান্ত এলাকায় ডিউটি দেয়।'

'আচ্ছা, হুম।'

'কী করব আমরা? আমাকে বোধহয় তোমার নামিয়ে দেয়া উচিত...'

'সমস্যা এখন শুধু তোমাকে নিয়ে নয়,' বলল রানা। 'পোর্শও একটা সমস্যা। মরুভূমিতে নিঃসঙ্গ কৃষ্ণচূড়ার মত, সবার চোখেই ধাক্কা মারছে।'

'কিন্তু একা একজন আই.বি এজেন্ট কী করছে এখানে?' মাথা নাড়ল উত্তরা, ব্যাপারটা মেলাতে পারছে না। 'ওকে পাঠানো হয়েছে বিশেষ করে এই রাস্তা পাহারা দেয়ার জন্যে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, তোমার খোঁজে সীমান্তের সবগুলো পথে লোক পাঠানো হয়েছে, এ তাদেরই একজন।'

'প্রথমে তো শোনা গেছে তোমাদের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স বিদেশি এক শক্তির ভয়ে অসহায় বোধ করছে, এখন দেখছি আই.বি ওদের হয়ে একেবারে মাঠে নেমে পড়েছে! সেটা কীভাবে সম্ভব?'

'আমাদের সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেক আগেই দু'টো ভাগ হয়ে গেছে, রানা,' বলল উত্তরা। 'নানান রকম সুযোগ-সুবিধে পাবার জন্যে একটা অংশ আমেরিকার কথায় ওঠে-বসে।'

দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। ধূসর মেঘ ছড়িয়ে পড়ছে মাঠ থেকে মাঠে, ছোট্ট বিন্দুটা পরিণত হচ্ছে সগর্জন মোটরসাইকেলে।

রাস্তার পাশে সরিয়ে এনে গাড়িটাকে দাঁড় করাল রানা। নীচে নেমে ফ্রন্ট টায়ারের একটা ভালভ-এ চাপ দিল। হিস্‌হিস্ করে বাতাস বেরিয়ে যাওয়ায় চ্যাপ্টা হয়ে গেল সেটা।

ছোট ডাফ্‌ল্ ব্যাগটা হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল উত্তরা। ট্রাঙ্ক থেকে জ্যাক আর টায়ার আয়রন বের করল রানা।

গাড়ি ও রানার দিকে পিছন ফিরে হাঁটা ধরল উত্তরা, ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা গাছের দিকে যাচ্ছে।

তুমুল বেগে ছুটে আসছে মোটরসাইকেল। সেদিকে যেন কোনও খেয়াল নেই, এরকম একটা ভাব ধরে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে রইল রানা। কার ফ্রেমের নীচে জ্যাকটা ঢোকানো হয়ে গেছে ওর।

বিরাট মোটরসাইকেলটা থামল। হেলমেট পরা দীর্ঘদেহী ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ এজেন্ট রানার উপর চোখ রেখে নীচে নামল। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে সে। বোতাম খোলা জ্যাকেটের ভিতর হোলস্টার দেখা যাচ্ছে, সেটা থেকে উঁকি দিচ্ছে ল্যুগারের চকচকে বাঁট।

মাথা তুলে তাকাল রানা, নিঃশব্দে হাসল, জ্যাক পাম্প করছে। 'হ্যালো!' বলল ও, তারপর হাতটা মুছে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল। 'ঠিক আমাদের দেশের মতই। প্রয়োজনের সময় সার্ভিস স্টেশন পাবেন না।'

'কী?' থাই ভাষায় জিজ্ঞেস করল ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের এজেন্ট, মারমুখো একটা ভাব নিয়ে আছে সে, চোখে-মুখে রাজ্যের সন্দেহ। রানার বাড়ানো হাতটা গ্রাহ্যই করছে না।

ড্যাশবোর্ড থেকে থাইল্যান্ড ভ্রমণের কাগজ-পত্র আর পাসপোর্ট বের করল রানা, সেগুলোয় ওর নাম মাসুদ রানা দেখানো হয়নি। অধৈর্য একটা ভাব নিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে আই.বি এজেন্ট।

'দুঃখিত, সার,' ভাঙা ভাঙা থাই ভাষায় শুরু করল রানা,

www.MurchOna.com

কাগজগুলো ধরিয়ে দিল তার হাতে। 'আমি আসলে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু কখন জানি না হারিয়ে গেছি।' হাত তুলে ঢেউ খেলানো গ্রাম্য এলাকাটা দেখাল।

জাল কাগজগুলো পড়ছে আই.বি এজেন্ট। তার মারমুখো ভাব আরও গভীর হলো চেহারায়।

'হাইওয়ে কি এখান থেকে অনেক দূরে?' জিজ্ঞেস করল রানা, আবার পাম্প শুরু করল।

'মহিলাটা কোথায়?' কাগজ থেকে মুখ তুলে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল আই.বি এজেন্ট, গাছগুলোর ওদিকে তল্লাশি চালাচ্ছে তার চোখ। কাগজগুলো তালুর উপর ভাঁজ করছে সে।

'টয়লেটে,' বলল রানা, টায়ার ঘুরিয়ে লিক খুঁজছে। 'আমার স্ত্রীকে খুব বেশি টয়লেটে যেতে হয়।' হেসে উঠল ও।

আই.বি এজেন্ট হাসল না। 'আপনার কাগজ-পত্র সব ঠিক আছে বলে মনে হলো,' বলল সে, গাছগুলোর দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না। 'আপনার স্ত্রীর কাগজ কার কাছে?'

গাছপালার আড়াল থেকে ধীর, সাবধানী পায়ে বেরিয়ে আসছে উত্তরা। পেটটা ফুলে গোল একটা ঢোল হয়ে আছে, কারণ ভারী কোটের নীচে ডাফ্‌ল্ ব্যাগটা গুঁজে রেখেছে সে। কপালে উঠে গেল একটা হাত।

লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা, দ্রুত পায়ে ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে ফেলল।

তাকিয়ে আছে আই.বি এজেন্ট, মারমুখো ভাবটা দূর হয়ে গেছে চেহারা থেকে, চোখের তারায় একটু যেন কৌতুকের ঝিলিক।

দুনিয়ার সব কালচারেই দেখা যায় অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের ইন্টারেস্টিং সব পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া থাকে। মাথাটা রানার কাঁধে রাখল উত্তরা।

'কেমন করছি আমি?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সে।

'ভান করো তুমি অসুস্থ,' শান্ত সুরে বলল রানা।

হঠাৎ কুঁজো হলো উত্তরা, পেট ফুলিয়ে রাখা ডাফ্‌ল্ ব্যাগের উপর চেপে বসল তার হাত দুটো। গোঙাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি তাকে দু'হাতের উপর তুলে নিল রানা, পোর্শ-এর দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় চেহারায় উদ্বেগের ছাপ ফুটে উঠল।

তরুণ আই.বি এজেন্ট দ্রুত ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

'গাড়ি!' গলা চড়িয়ে বলল রানা। 'দরজাটা খুলুন!'

ঘুরে গাড়ির দিকে লাফ দিল লোকটা, টান দিয়ে খুলে ফেলল পোর্শ-এর দরজা। তার ভ্রূ দুশ্চিন্তায় কুঁচকে আছে। সন্তানপ্রসব তার ট্রেনিঙের সূচিতে ছিল না।

উত্তরাকে সিটে শুইয়ে দিল রানা। মাথাটা এদিক ওদিক দোলাচ্ছে সে, চোখ দুটো বন্ধ।

'টায়ারটা তো না বদলালেই নয়,' বিড়বিড় করে নিজের কাজে ফিরে যাচ্ছে রানা।

আই.বি এজেন্ট সাহায্য করায় চ্যাপ্টা টায়ার খুলে ট্রাঙ্ক থেকে স্পেয়ারটা নিয়ে এসে দ্রুত ফিট করল রানা। যন্ত্রপাতিগুলো ট্রাঙ্কে রেখে দিচ্ছে ও, একটা ক্যানটিন আনবার জন্য মোটরসাইকেলের দিকে এগোল লোকটা।

ফিরে এসে উত্তরার দিকে পোর্শ-এর দরজা খুলল আই.বি এজেন্ট, পানি ভর্তি ক্যানটিনটা বাড়িয়ে ধরল তার দিকে।

নিজের সিটে উঠে বসল রানা, স্টার্ট দিল পোর্শ-এর মোটরে। 'ধন্যবাদ, ব্রাদার,' বলল ও, দেখল ক্যানটিনে আরেকটা চুমুক দিচ্ছে উত্তরা।

আই.বি এজেন্টের ঠিক আধ সেকেন্ড আগে ব্যাপারটা খেয়াল করল রানা। উত্তরার কোটের কিনারা ছাড়িয়ে নীচে বেরিয়ে পড়েছে ডাফ্‌ল্ ব্যাগ। ব্যাপারটার তাৎপর্য বুঝতে মাত্র এক সেকেন্ড সময় নিল বুদ্ধিমান এজেন্ট।

পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল রানা।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

এক হাতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে উত্তরার কোটের বোতাম ছিঁড়ে ফেলল আই.বি এজেন্ট, আরেক হাত দিয়ে শোলডার হোলস্টার থেকে টেনে নিল পিস্তলটা।

সময়ের ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশ, সেটাকেই মনে হলো যেন অনন্তকাল। দুর্ধর্ষ বিসিআই এজেন্ট ও থাই ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের এজেন্ট পরস্পরের চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল।

দুজনেই জানে, যে মন্থর, এরইমধ্যে মারা গেছে সে।

পরমুহূর্তে একটাই গুলির আওয়াজ হলো গাড়ির ভিতর। কটুগন্ধী ধোঁয়ায় ভরে উঠল বাতাস। বুলেটের ধাক্কায় ছিটকে গাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল থাই আই.বি এজেন্ট, রাস্তার ধারে হাত-পা মেলে চিত হয়ে পড়ল। তার বুকটা তরমুজের মত ফেটে গেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে রাস্তার পাশের মাটি, ফুটো হওয়া হৃৎপিণ্ড শেষ বারকয়েক পাম্প করছে, নিস্তেজ হয়ে আসছে রক্তের ফোয়ারা।

নিজের কবজিটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে উত্তরা।

'ওদিকের দরজা বন্ধ করো!' বলল রানা, গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছে।

নির্দেশ পালন করল উত্তরা।

রাস্তার দুদিক দেখে নিল রানা, যতদূর দৃষ্টি যায় ফাঁকা পড়ে আছে। লাশটা ভাল করে সার্চ করল ও। কাগজ-পত্র যা পেল সব ভাল করে পড়ল। উত্তরার কথাই ঠিক, লোকটা থাই ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একজন এজেন্টই ছিল। রাস্তা থেকে তার পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে কোমরে গুঁজে রাখল ও।

ফিরে এসে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। থমথম করছে চোখ-মুখ। কয়েক মিনিট পর হাইওয়েতে উঠে এল পোর্শ।

সাত

যুদ্ধে দু'একটা প্রতিপক্ষ বদলে গেছে, কাজেই রানার রণকৌশলেও পবিবর্তন আনা দরকার। ওর ধারণা, থাই থান্ডারের যে ক্ষতি হয়ে গেছে, সেটা কাটিয়ে উঠে আবার মাঠে নামতে প্রচুর সময় লাগবে ওদের।

এখন নতুন এক প্রতিপক্ষ, থাইল্যান্ডের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একটা সেকশনের সঙ্গে লড়তে হবে ওকে। তবে থাই টং-ই এখনও ওর প্রধান শত্রু, যাদের হাতে বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরা বন্দি।

রানা সিদ্ধান্ত নিল, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এবং আই.বি-র কোন্ গ্রুপ কখন কী করছে ওর জানা দরকার। আর তা জানবার সহজ উপায় হলো উত্তরাকে সঙ্গে নিয়ে মোহনার ডাকে সাড়া দেওয়া।

গাড়ির ভিতর পরিবেশটা বেশ কিছুক্ষণ নীরব আর বিষণ্ন হয়ে থাকল। হোক না ভিন্ন ডিপার্টমেন্টের, উত্তরার দেশের একজন এজেন্টকে ওরই চোখের সামনে খুন করেছে রানা। তাতে অবশ্য উত্তরার নৈতিক সমর্থনও আছে, কারণ একা শুধু রানা বিপদে পড়তে যাচ্ছিল না। তারপরেও এক ধরনের হতোদ্যম ম্লান করে রাখল ওকে।

তবে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিচ্ছে ওরা, একসময় আবার সহজ হয়ে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

উঠল পরিবেশটা।

থাই-মালয়েশিয়া সীমান্ত থেকে দীর্ঘ পনের শো কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে চিয়াং মাই শহরে পৌঁছাতে বিকেল হয়ে গেল ওদের।

ব্যাংককে পাশ কাটিয়ে এসেছে ওরা, যেখানে পেরেছে হাইওয়ে কিংবা মেইন রোড ব্যবহার করেনি। উত্তরাও তাই চেয়েছে, কারণ সে-ও ভয় পাচ্ছে আই.বি অফিসারের লাশ আবিষ্কারের পর খুনির খোঁজে শুধু আই.বি নয়, পুরো শক্তি নিয়ে গোটা পুলিশ বিভাগকেও মাঠে নামানো হবে।

শহরে ঢোকার আগে একটা থিয়েটারের লেডিস ও জেন্টস রুমে ঢুকে নিজেদের চেহারা যতটা সম্ভব বদলে নিতে ভোলেনি ওরা।

এতটা পথ পাড়ি দিয়ে আসায় দুজনের কেউই তেমন ক্লান্ত নয়। কারণ, রাত জাগলেও, সারাটা দিন পালা করে ঘুমিয়ে নিয়েছে ওরা।

হোটেল ময়ূরী ইন্টারন্যাশনালে নাম লেখাচ্ছে রানা, 'আসছি' বলে কোথাও গেছে উত্তরা, সম্ভবত মোহনার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে, কিংবা নিজেদের হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করতে।

রিসেপশনে দুজনের ব্যাগ রেখে লবির বাইরে বেরুল রানা, বড় একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকে উত্তরার জন্য কিছু কেনাকাটা করল– ম্যাচ করা ব্লাউজ-পেটিকোট ইত্যাদি সহ হালকা সবুজ রঙের সিল্ক শাড়ি; পরচুলা, পারফিউম ও একটা মেকআপ বক্স। আরও একটা জিনিস কিনেছে, তবে বাক্সটা দেখে বোঝবার কোনও উপায় নেই ভিতরে কী আছে।

নিজের জন্যও দু'একটা জিনিস কিনল রানা। আবার লবিতে ঢোকার আগে কিছু গোলাপ নিতেও ভুলল না।

রিসেপশনে ফিরে ব্যাগ দুটো নিল রানা, এলিভেটরে চড়ে উঠে এল ছয় তলায়। স্যুইটের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। জানালার সাদা সিল্ক পরদার প্রান্ত বাতাসে উড়ে চলে এসেছে ডাবল বেডের উপর।

বেডের পাশে কার্পেটে নিজের সুটকেস রাখল রানা, ওটার পাশে উত্তরার কাপড়ের তৈরি ডাফ্‌ল্ ব্যাগটা।

মুহূর্তের জন্য মোটরসাইকেল আরোহী আই.বি এজেন্টের কথা মনে পড়ে গেল রানার। তার লাশটা এতক্ষণে কারও চোখে না পড়বার কোনও কারণ নেই। অথচ যতক্ষণ হাইওয়ে আর মেইন রোডে ছিল ওরা, কিংবা শহরে ঢোকার পরেও, একবারও মনে হয়নি ওদেরকে কেউ খুঁজছে।

হয়তো ভাগ্যই সহায়তা করছে ওদেরকে, কেউ দেখেনি পোর্শ-এর পাশে মোটরসাইকেল থামিয়েছিল লোকটা। তাকে না মেরে কোনও উপায় ছিল না রানার, তবে প্রতিবারের মত কষ্টও পাচ্ছে। লোকটা খুন না হলেও পারত।

প্যাকেট খুলে উত্তরার সমস্ত কাপড়চোপড় আর আনুষঙ্গিক জিনিস বিছানায় সাজিয়ে রাখল রানা। শুধু বিশেষ বাক্সটা খুলল না, যত্ন করে রাখল নিচু টেবিলটার উপরে।

বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল ও, যত্ন নিল ক্ষতগুলোর। একটু পরেই চলে আসবে উত্তরা।

নিজেকে এতক্ষণে স্মরণ করবার অনুমতি দিল রানা– দোই ইনথানন পাহাড়ের সেই মায়াবী রাতে, ওদের কোনও এক প্রজার গোয়ালঘরে, কী প্রচণ্ড উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছিল সে; কী নরম আর পেলব তার শরীর; কী আশ্চর্য ব্যগ্র-ব্যাকুলতা নিয়ে রানার হাতে তুলে দিয়েছিল নিজেকে।

স্লিপিংগাউন পরে বেডরুমে ফিরে বিছানায় উঠে পড়ল রানা, প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথারটা রাখল বালিশের নীচে। দরজায় তালা দেওয়া, কামরার বাতাস না ঠাণ্ডা না গরম।

অপেক্ষা করছে, ক্লান্তিতে ওর চোখে ঘুম চলে এল।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

স্যুইটের তালায় চাবি ঢোকানোর আওয়াজ হতে ঘুম ভেঙে গেল রানার। বালিশের তলা থেকে পিস্তলটা হাতে চলে এল, তাকিয়ে আছে কবাটের দিকে।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল উত্তরা, গাল দুটো পাকা আপেলের মত রাঙা হয়ে আছে, ভরাট নিতম্বে সেঁটে আছে রঙচঙে স্কার্ট।

'রানা!' রানার ঘুম ঘুম চোখ দেখল, তারপর বিছানার একপাশে সাজানো পরিচ্ছদগুলোর উপর চট করে একবার নজর বুলিয়ে নিল উত্তরা। তারপর চোখ বুজল, নিঃশব্দে হাসছে।

'সেই স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল বুঝি?'

চোখ খুলল উত্তরা। 'যেন কত যুগ আগের কথা, তুমি বললে বলে মনে পড়ল,' দুষ্ট হাসি তার ঠোঁটে। 'কিন্তু এ-সব কী?' আবার বিছানায় সাজানো জিনিসগুলোর দিকে তাকাল।

'আগে স্নানটা সেরে নাও, তারপর এগুলো পরে ফেলো তো ঝটপট,' বলল রানা, হাসল।

'কিন্তু... কেন?'

'আমি চাইছি, তাই!'

'কিন্তু আমি কি পারব? সেই কবে শিখিয়েছিল লাবণী।'

মনে করিয়ে দিল রানা, 'আমি তো আছি, বাঙালি– ঠেকলে দেখিয়ে দেব।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল উত্তরা, দশ মিনিট পর যখন বেরিয়ে এল, হাঁ হয়ে গেল রানার মুখ। এ কাকে দেখছে ও! শাড়ি-ব্লাউস পরা নিখুঁত এক অপরূপা বাঙালি মেয়ে। ছোট্ট একটা টিপও পরেছে কপালে। পোশাক পরিবর্তনের সঙ্গে গোটা চরিত্রটাই যেন বদলে গেছে উত্তরার।

'কী দেখছ?'

'তোমাকে,' বলল রানা। 'আমার বাঙালি রাজকন্যেকে।'

আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল উত্তরার মুখ, চোখের দৃষ্টিতে বিজয়ের গৌরব– যেন বাঙালি কোনও প্রতিযোগী মিস ইউনিভার্স হয়েছে। তার কালো চুল কালো মিহি সিল্ক দিয়ে কাঁধ ও ঘাড়ের উপর স্তূপ করা, হাত দুটো দুদিকে মেলে দিয়ে খাটের চারপাশে নাচল ও মনের আনন্দে। যেন হঠাৎ ঘরে ঢুকে নেচে বেড়াচ্ছে রঙীন এক প্রজাপতি; এমন একটা গানের সুরে তাল মিলিয়ে, যেটা একা শুধু সেই শুনতে পাচ্ছে।

মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে রানা। একটু একটু করে কাছে এগিয়ে এল ও, তারপর ঝপাং করে বসল স্প্রিঙের খাটে। বিছানা দুলে ওঠায় স্লিপিংগাউনটা সরে গিয়ে রানার পেশিবহুল ঊরু বেরিয়ে পড়ল।

'এ, মা!' বলে একটু সরে বসল উত্তরা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'বাক্সটা কীসের? কী আছে ওটায়?'

'খুলেই দেখো না,' বলল রানা।

কৌতূহলে অধীর, কী এমন থাকতে পারে ওতে, ভাবতে ভাবতে বাক্সটা খুলল উত্তরা। পরমুহূর্তে স্থির হয়ে গেল। বাক্সের ভিতর মোমবাতি দিয়ে সাজানো একটা কেক, তাতে নানারঙের ক্রিম দিয়ে লেখা– হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।

মুখ তুলল উত্তরা। যতটা সে খুশি হয়েছে, তারচেয়ে বিস্ময়ের মাত্রা বেশি তো কম নয়। 'কে বলল তোমাকে আজ আমার জন্মদিন?'

'তুমি,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'ঘুমের মধ্যে যারা কথা বলে তাদের অনেক গোপন তথ্যই ফাঁস হয়ে যায়।' হাসল ও, উঠে এল বিছানা ছেড়ে। লাইটার জ্বেলে মোমগুলো জ্বালাবার পর ছুরিটা ধরিয়ে দিল উত্তরার হাতে। 'নাও, শুরু করো– হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউউউ...' শ্যাম্পেনের কর্ক মৃদু আওয়াজ তুলে খুশির সঙ্গে যোগ করল আরও একটু খুশি।

রানাকে এক টুকরো কেক, তার সঙ্গে একটা চুমোও দিল উত্তরা। 'ধন্যবাদ! ধন্যবাদ!' রানার কাঁধে মাথা রাখল ও, রানার

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

গালে ওর গরম নিঃশ্বাস। অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে অনেকক্ষণ বসে থাকল ওরা, উপভোগ করছে পরস্পরের সান্নিধ্য।

'মোহনার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

'উম্‌ম্‌-ম্‌ম্‌।'

'কী ঠিক হলো?'

'ওখানে তুমি আমার শিকার হিসেবে যাবে। আমি একটা বেশ্যা, তুমি আমার কাস্টোমার,' বলল উত্তরা। রানার একটা হাত ওর পিঠ ঘুরে বগলের নীচ দিয়ে সামনে চলে এল। 'উফ্‌!' কিছু একটা করেছে রানা, ব্যথার ভান করে গুঙিয়ে উঠল সে। আরও একটু হেলান দিল ওর গায়ে।

আট

চিয়াং মাই শহর। মাঝরাত।

ফুটপাথ ধরে হাঁটছে রানা ও উত্তরা। বড় আকারের সুদৃশ্য দালানগুলোকে পাশ কাটাচ্ছে ওরা। আলোকিত প্রতিটি জানালায় ভারী পরদা ঝুলছে। রাস্তা ও ফুটপাথ পাথরে বাঁধানো, ফুটপাথের পাশে সযত্নলালিত ঘাস। প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনে সবুজ লন কিংবা বাগান।

রাতের বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। জিনস, শার্ট ও জ্যাকেট পরে বেরিয়েছে ওরা। দুজনেই নিজেদের চেহারা বদলে নিয়েছে, সহজে যাতে কেউ চিনতে না পারে।

ফুটপাথে লোকজন না থাকারই মত। তবে রাস্তায় দামী গাড়ির আসা-যাওয়া আছে। এদিকটায় ধনী লোকের বসবাস। কিছু বিদেশিও থাকে।

'ওদিকে,' হাত তুলে দেখাল উত্তরা, 'চিয়াং মাই পুলিশ হেডকোয়ার্টার।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

ওর হাতে মৃদু চাপ দিল উত্তরা। তৃপ্তির উচ্ছ্বাস হাসি হয়ে বেরিয়ে এল তার বুকের ভিতর থেকে। 'রানা, কী বলব, তোমার সঙ্গ আমার এত ভাল লাগছে যে রীতিমত ভয় করছে– তুমি চলে যাবার পর কী হবে!'

'সুযোগ পেলেই টেলিফোনে কথা বলব আমরা,' বলল রানা। 'মাঝে-মধ্যে দেখাও হয়ে যাবে; হয় আমার দেশে, নয় তোমার।'

'প্রমিজ?'

'প্রমিজ।' তার কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত করল রানা।

আবার হেসে উঠল উত্তরা। 'পরের রাস্তাতেই টি.আই.বি-র একটা ব্রাঞ্চ অফিস,' হাসি থামিয়ে বলল সে।

ওদের পায়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলছে। সামনে আলো ঝলমলে ফাইভ স্টার হোটেল আবাসন ইন্টারন্যাশনাল, পাশেই বিরাট ক্যাসিনো– অ্যারাবিয়ান নাইটস্‌।

রানার কানে ফিসফিস করল উত্তরা, 'ব্যাংকক থেকেও ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা এখানে সময় কাটাতে আসে। দেশি-বিদেশি স্পাইদের মিলন-মেলা বলতে পার শহরের এই অংশটাকে।'

হোটেল ও ক্যাসিনোর দু'পাশে সারি সারি দামি গাড়ি পার্ক করা রয়েছে। গেটের কাছে ওদের মত কিছু তরুণ-তরুণীকে দেখা গেল, একটা গ্রুপ সিগারেট ধরাবার ফাঁকে কী নিয়ে যেন হাসাহাসি করছে, আরেক গ্রুপের কয়েকটা ছেলে রানা ও উত্তরাকে হেঁটে আসতে দেখে সিটি বাজাল।

কোনও ঝামেলা ছাড়াই ওদেরকে পাশ কাটিয়ে এল দুজন।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

অবশেষে এলাকাটার শেষপ্রান্তে পৌঁছে, ফাঁকা মাঠের মাঝখানে, বড়সড় একটা অন্ধকার বাড়ির সামনে থামল উত্তরা।

দেখেই ভৌতিক ও অশুভ বলে মনে হলো বাড়িটাকে রানার। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না এখানে কেউ বসবাস করে।

'পেছন দিকে যেতে হবে,' ফিসফিস করে বলল উত্তরা।

বাতাসে ধুলোর গন্ধ, গাড়িপথ ধরে এগোল ওরা। পথের মাঝখানে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, চাঁদের আলোয় মরচে ধরা বলে মনে হলো রানার– ওখানে ব্যারিকেড কিংবা ওয়ার্নিং হিসাবে রাখা হয়েছে ওটাকে।

পাঁচিল আর ট্রাকের মাঝখানে সামান্য একটু ফাঁক, সেটা গলে এগোতে হলো ওদেরকে।

বাড়িটার পিছনে, দরজার মাথায়, পঁচিশ ওয়াট-এর একটা বালব জ্বলছে। থুতু দিয়ে আঙুলের ডগা ভিজিয়ে নিয়ে বালবটা স্পর্শ করল উত্তরা।

সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা।

'এসো!' অন্ধকারে শ্রুতিমধুর, ফিসফিসে একটা নারীকণ্ঠ শুনতে পেল রানা। 'জলদি!'

উত্তরার পিছু নিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা। দরজাটা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল আবার।

বোতামে চাপ দিয়ে একটা বৈদ্যুতিক লণ্ঠন জ্বালল কেউ। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসছে লম্বা একটা মেয়ে। আশ্চর্য সুন্দরী সে; মেকআপ নেওয়ার কোনও প্রয়োজন পড়ে না, তারপরও প্রচুর রুজ-লিপস্টিক ব্যবহার করেছে। তবে, এত করেও, চেহারা থেকে শান্ত ও মার্জিত ভাবটুকু মুছতে পারেনি।

'পরিচয় করিয়ে দিই,' বলল উত্তরা। 'আমার কলিগ মোহনা কীত্তিকাচরণ, টিসিআই। কায়েস ভাইয়ের বস্, মাসুদ রানা, বিসিআই।'

পরস্পরের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল ওরা।

ওখানে কোনও কথা হলো না, মোহনা শুধু বলল, 'এসো আমার সঙ্গে!' ঘুরে প্যাসেজ ধরে হাঁটতে শুরু করল সে। সামনে একটা সিঁড়ি পড়ল, ধাপ বেয়ে সম্ভবত বেযমেন্টে নেমে যাচ্ছে ওরা।

'তোমরা দেরি করে পৌঁছালে,' পিছনদিকে একবার তাকিয়ে উত্তরাকে বলল মোহনা।

বেযমেন্টটা বেশ বড়। একধারে একটা বার। পাশে একটা টিভি, পরদায় ব্রিটনি স্পিয়ার্স গান গাইলেও, মিউট করা। বারের সামনে লম্বা একটা টেবিল ও কয়েকটা চেয়ার। টেবিলের উপর ক্লোজ-সার্কিট টিভি রয়েছে পাঁচ-ছয়টা, এই মুহূর্তে অফ করা। টিভিগুলোর সামনে পড়ে রয়েছে একাধিক হেডফোন, রেকর্ড প্লেয়ার ইত্যাদি।

এটা একটা ব্রথেল, মেয়েদের কামরায় ঢোকার পর কাস্টোমাররা কী করে আর কী বলে সব এখানে বসে দেখা ও শোনা যায়, এটুকু বুঝতে কারও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

'মাসুদ ভাই,' সরাসরি এভাবেই সম্বোধন করল মোহনা। 'কোনও ভূমিকার কি প্রয়োজন আছে?' নিচু গলায় জানতে চাইল সে। 'এত থাকতে এই নোংরা জায়গায় কী করছি আমি ইত্যাদি?'

মাথা নাড়ল রানা।

'শুধু একটা কথা বলি। কায়েস নেই, তো আমিও নেই। তা হলে বেঁচে আছি কীভাবে? আমার ভেতরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে, সেই আগুনটাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।'

এই মুহূর্তে রানা মনোযোগী শ্রোতা মাত্র।

'তোমার কথা কায়েস এত বেশি বলেছে আমাকে, দেখার পর তোমাকে অচেনা কেউ বলে ভাবতেই পারছি না।' মাথার চুল ঠিক করবার ছলে শার্টের আস্তিন দিয়ে চোখ মুছল মোহনা,

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

তার ধারণা ব্যাপারটা কেউ ধরতে পারছে না। 'আমাদের হাতে সময় খুব কম।' বার-এর সামনে এসে একটা আধ খালি গ্লাস তুলে চুমুক দিল কয়েকটা। 'কেউ যদি কিছু নিতে চাও, হাত বাড়াও,' বলে শেলফে সাজানো বোতলগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল সে।

'না, দরকার নেই,' বলল রানা।

'না,' বলল উত্তরাও। 'অন্য কোনও দিন।'

'ঠিক আছে,' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল উত্তরা।

'খুব বেশি তথ্য যোগাড় করতে পারিনি আমি,' বেযমেন্টের বন্ধ দরজার দিকে চোখ রেখে বলল মোহনা। 'যেটুকু জেনেছি তা কতটুকু কী কাজে লাগবে তা-ও আমি জানি না। প্লেনটা ওখানে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই ছিল, কতদিন আগে থেকে তা জানতে পারিনি।'

'দোই ইনথাননে?'

'হ্যাঁ। ছিল, কিন্তু আবার চলে যায়, তারপর ফিরেও আসে।'

'তারিখ জানতে পেরেছ?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কবে গেল, কবে ফিরল?'

মাথা নাড়ল মোহনা।

'শুনলাম আবারও নাকি বের করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল মোহনা। 'সিঙ্গাপুর না মালয়েশিয়া থেকে বাঙালি একজন বিজ্ঞানীকে নিয়ে এসেছে ওরা, তিনি নাকি ওটাকে লেজের ওপর দাঁড় করিয়ে নাচাতে পারবেন, মহাশূন্য থেকে ঘুরিয়ে আনতে পারবেন, এই সব কথা কানে আসছে।'

রানা ও উত্তরা দৃষ্টি বিনিময় করল।

'আবার এ-ও শুনছি যে তিনি ওদেরকে সাহায্য করতে রাজি হচ্ছেন না,' বলল মোহনা। 'নির্যাতন চালিয়ে বাধ্য করবে, সে উপায়ও নেই। কারণ বিজ্ঞানী মারা গেলে তাঁর সঙ্গে অমূল্য সব আবিষ্কারের সূত্রও চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে।'

'ডক্টর নাদিরা?' রানার দিকে ফিরে ফিসফিস করল উত্তরা।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বলল রানা। 'মোহনা, ওটা দুরন্ত ঈগল কি না তা কি তুমি জানতে পারনি?'

মাথা নাড়ল মোহনা।

'একটু তোতলায়, থাই টঙের এমন কাউকে চেনো?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'গলার আওয়াজ খুব ভারী?'

ভ্রূ কোঁচকাল মোহনা। উত্তরার সঙ্গে চট করে একবার দৃষ্টি বিনিময় করল। 'ওদের তো অনেককেই চিনি,' বলল সে। 'কার কথা বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না। তোতলায়? উঁহুঁ! কেন বলুন তো?'

'থাই টঙের ওই তোতলা লোকটাই আমাদের বিজ্ঞানীকে থাই থান্ডারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।'

রানা আর কী বলে শোনার অপেক্ষায় রয়েছে মোহনা।

'ওই তোতলা যেখানে আছে, ডক্টর নাদিরারও সেখানে থাকার কথা,' বলল রানা।

মাথা নাড়ল মোহনা, উত্তরার সঙ্গে আরেকবার দৃষ্টি বিনিময় করল। 'কোথাও ভুল হচ্ছে, মাসুদ ভাই। যে লোকটা তোতলায় সে থাই টঙের সদস্য নয়।'

'তা হলে?' এবার রানার ভ্রূ কোঁচকানোর পালা।

'চিয়াং মাই শহরে থাই ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ-এর একটা অফিস আছে, সেই অফিসের হেড একটা সুপারপাওয়ারকে সাহায্য করছে বলে শুনেছি। উত্তরাও তাকে চেনে। ওই লোকটা তোতলা। তার নাম জুতনা মংকট।'

'এখন সে কোথায়?'

'শেষ খবর জানি, শহর ছেড়ে পশ্চিম দিকে গেছে সে,' বলল মোহনা।

'দুর্গের দিকে?' জিজ্ঞেস করল উত্তরা।

'হতে পারে। ঠিক জানি না।'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

রানার দিকে তাকাল উত্তরা। 'আমি একবার আমাদের প্রজাদের কাছে যেতে চাই,' বলল সে। 'নায়েব সাহেবের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

বার-এর মাথায় মরিচ বাতি জ্বলে উঠল– বুদ্ধমূর্তির নাকের ভিতর খুদে বালব।

'সেরেছে!' বিড়বিড় করল মোহনা।

'কাস্টোমার,' বলল রানা।

'বেরুবার আর কোনও পথ নেই?' জানতে চাইল উত্তরা।

'কী যে বলো না! এসো, তাড়াতাড়ি!'

মোহনার পিছু নিয়ে বেযমেন্ট থেকে প্যাসেজে উঠে এল ওরা। খানিক দূর এগিয়ে একটা দরজা খুলল সে, ঠেলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল ওদেরকে। 'এখানে অপেক্ষা করো,' বলল সে। 'আমি ওর একটা ব্যবস্থা করছি।'

নিজের চুল ঠিকঠাক করল মোহনা, হাতব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা আয়না বের করে নিজেকে একবার দেখে নিল, তারপর কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজাটা। তার ত্রস্ত পায়ের শব্দ প্যাসেজ ধরে দূরে সরে যাচ্ছে।

রানার দিকে তাকাল উত্তরা। 'অবশেষে আমরা নির্জনতা পেলাম।'

'কী কাজে লাগবে সেটা?' নিঃশব্দে হাসল রানা, 'এখানে যা হয়?'

কিল দেখাল উত্তরা। দূর থেকে দরজা খোলার আওয়াজ ভেসে এল। দুজন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে ওরা, মোহনা আর একজন পুরুষের। হাসাহাসি করছে দুজন, বোধহয় ব্যবসা হবে। প্যাসেজ ধরে এগিয়ে আসছে ওদের পায়ের আওয়াজ।

একটা দরজায় নক হলো। কবাট খোলার আওয়াজ। আরও এক দফা কথাবার্তা। এরপর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দটা খুব নরম।

রানার হাত ধরল উত্তরা, একটু নার্ভাস।

দরজা খুলে ভিতরে পুরোপুরি ঢুকল না মোহনা, উত্তরার জ্যাকেটের আস্তিন ধরে টান দিল। 'এসো! জলদি!'

লম্বা প্যাসেজে বেরিয়ে এসে দ্রুত হাঁটছে তিনজন। দু'পাশের কামরা থেকে টিভি চলার আওয়াজ ভেসে আসছে। বাড়ির পিছনে পৌঁছে বৈদ্যুতিক লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিল মোহনা, তারপর দরজা খুলল।

তিনজনই ওরা দেখল সামনে একটা লম্বা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

নয়

দরজার মাথার বালব ছোঁয়ার জন্য হাত তুলেছে লোকটা, কবাট ফাঁক হয়ে যাওয়ায় স্থির হয়ে গেল, চোখে-মুখে বিস্ময়। চেহারায় নিরীহ ভাব, যেন ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না; পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে ফুর্তি করতে এসেছে।

'মোহনা,' বলল লোকটা, রানা ও উত্তরাকে এমন খুঁটিয়ে দেখে রাখছে যেন ভবিষ্যতে ব্ল্যাকমেইল করতে কোনও অসুবিধে না হয়।

টলে ওঠার অভিনয় করল রানা, ওর কাঁধটা দরজার ফ্রেমে ঘষা খেল। 'চলে এসো, ডার্লিং!' জড়ানো সুরে থাই ভাষায় বলল উত্তরাকে।

হেসে উঠল উত্তরা, রানার হাত ধরে চাপ দিল মৃদু। রানার

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

কানে অত্যন্ত বেসুরো লাগল তার হাসি। চাপটুকুর অর্থও ধরতে পারল না।

'তোমরা দুজন দয়া করে বিদায় হও!' ধমকের সুরে বলল মোহনা, পিঠে ধাক্কা দিয়ে দরজার বাইরে বের করে দিল ওদের দুজনকে।

'চলো, পার্কে গিয়ে বসি আমরা, ডার্লিং,' বলল রানা, নিজের শরীর দিয়ে উত্তরাকে আড়াল করে রাখছে। এলোমেলো পা ফেলে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে দুজন।

'আমার পেছনে মেলা খরচ হবে তোমার,' বলল উত্তরা। 'তবে কথা দিতে পারি যে পস্তাবে না।'

'ভেতরে আসুন, সার!' ওদের পিছন থেকে মোহনার গলা ভেসে এল। তারপর কাস্টোমারের কী একটা কথার জবাবে হাসল সে। হাসিটার সুরে এমন কিছু আছে, রানার মনে হলো লোকটাকে মোহনা হয় ভয় করে, না হয় শ্রদ্ধা।

'তুমি তখন আমার হাতে চাপ দিলে কেন?' উত্তরাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'শুনে আবার আকাশ থেকে পোড়ো না,' সাবধান করে দিয়ে বলল উত্তরা, এখনও কিছুটা নার্ভাস সে। 'কে জানে চিনে ফেললেন কি না!'

'মানে?' জানতে চাইল রানা। 'কে লোকটা?'

'আমাদের অপারেশন্স চিফ, সত্যশুভ চুনাভান,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল উত্তরা।

'এখানে কী করছেন ভদ্রলোক?'

'নিশ্চয়ই মোহনার কাছ থেকে রিপোর্ট নিতে এসেছেন,' বলল উত্তরা।

'ঠিক আছে, বুঝলাম, কিন্তু তাতে তোমার নার্ভাস হবার কী আছে?'

'আমি নার্ভাস এই জন্যে যে নিজের ডিউটি সম্পর্কে এখনও রিপোর্ট করিনি,' বলল উত্তরা। 'যদি চিনতে পেরে থাকেন, জেরা করবেন আমাকে।'

'জানতে পারি, তোমার ডিউটিটা কি?' অন্ধকার মাঠ পিছনে ফেলে আলোকিত মেইন রোডে উঠে এল ওরা।

জবাব দিতে এক মুহূর্ত দেরি করল উত্তরা। 'আমার ডিউটি, বাংলাদেশ থেকে যদি কেউ আসে, তার গতিবিধির ওপর নজর রাখা, সে কী করছে না করছে রিপোর্ট করা।'

'ঠিক তা-ই করছ তুমি, আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখছ,' বলল রানা। 'তা হলে রিপোর্ট করছ না কেন?'

হেসে ফেলল উত্তরা। 'যার ওপর নজর রাখছি তার সঙ্গেই যদি প্রেম করতে হয়, রিপোর্ট করার সময় পাব কীভাবে?' কাঁধ ঝাঁকাল। 'এবার অবশ্য করতেই হবে।'

ক্যাসিনো অ্যারাবিয়ান নাইটস্‌কে পিছনে ফেলে নিজেদের হোটেল ময়ূরীর কাছে চলে এল ওরা।

'আসলে কী ঘটছে জানতে হলে দোই ইনথাননে ফিরতে হবে আমাকে,' বলল উত্তরা। 'জেটটা বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। আমি ভয় পাচ্ছি নতুন ঘর-বাড়িতে আবার না আগুন লাগে, প্রজারা না মারা যায়! অস্ত্র হিসেবে লেযার অত্যন্ত ভয়ংকর!'

এত রাতেও ট্যুরিস্টের ভিড়ে গম গম করছে হোটেল ময়ূরী। তিনতলার একটা রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড বার-এ ঢুকল ওরা, এখানেও প্রচুর লোকজন খাওয়াদাওয়া কিংবা পান করবার ফাঁকে গল্পগুজব করছে।

হেড ওয়েটার আইল ধরে বেশ কিছুটা হাঁটিয়ে এনে একটা টেবিলের ব্যবস্থা করে দিল ওদেরকে।

দুটো বিয়ার নিয়ে চুমুক দিল ওরা, তারপর বিল মিটিয়ে ছয় তলায় ওঠার জন্য পরস্পরের হাত ধরে সিঁড়ি ভাঙছে।

'আমি আমার প্রজাদের কাছে ফিরছি,' মৃদু কণ্ঠে বলল

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

উত্তরা। 'তুমি ভেবেচিন্তে বের করো কীভাবে ওই জেটটাকে ধ্বংস করা যায়। ওটাকে ধ্বংস করাই উচিত, কি বলো?'

'হয়তো,' বলল রানা। 'তবে প্রথমে আমি আমার হেড-কোয়ার্টারকে দিয়ে আমার একটা ধারণা চেক করিয়ে নিতে চাই। আমরা যতটুকু বুঝতে পারছি, হয়তো তারচেয়ে অনেক বড় ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো হয়েছে এখানে।' উত্তরার নিরাপত্তার কথা ভেবেই জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে দুরন্ত ঈগলকে পুড়িয়ে ফেলার ঘটনাটা চেপে রেখেছে ও। 'তারপর তোমাকে আমি দোই ইনথাননে নিয়ে যাব।'

'তুমি আমার সঙ্গে স্যুইট থেকে যোগাযোগ করতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল উত্তরা।

'হ্যাঁ, আমার সুটকেসের কাছে পৌঁছেই।'

'বেশ। নীচে নেমে বিল মেটাই আমি,' বলল উত্তরা, সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'তা হলে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হতে পারব আমরা। আমাদের হাতে নষ্ট করার মত সময় নেই।'

তাকে একটা চুমো খেল রানা। চারতলা থেকে নামতে শুরু করল উত্তরা। রানা উঠে যাচ্ছে ছয়তলায়।

ছয়তলায় উঠে এসে করিডরে কাউকে দেখল না রানা। একপাশে দাঁড়িয়ে দরজার মাথায় হাত বুলাচ্ছে ও। কাগজের একটা টুকরোকে গোল পাকিয়ে যেখানে রেখে গিয়েছিল এখন সেটা সেখানে নেই। হয় পরিষ্কার করবার জন্য কোনও মেইড ঢুকেছে স্যুইটের ভিতরে, নয়তো কোনও ক্রিমিনাল বা শত্রুপক্ষ।

এত রাতে মেইড ঢোকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

শোল্ডার হোলস্টার থেকে হাতে চলে এল পিস্তলটা। পকেট থেকে স্যুইটের চাবিও বেরিয়ে এল অপর হাতে। নিঃশব্দে দরজার তালা খুলল ও।

বিরাট করিডরের নীরবতা কানে প্রতিধ্বনি তুলছে। দেয়ালের গায়ে সেঁটে আছে শরীরটা, ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল দরজার কবাট।

অন্ধকার কামরা। নীরব।

দরজার চৌকাঠে পিঠ সাঁটিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা, হাত বাড়িয়ে আলোর সুইচ অন করল।

কবাটের পিছন থেকে ওর পিস্তল লক্ষ্য করে থাবা মারল একটা হাত। তৈরি ছিল রানা; থাবাটা এড়িয়ে সরু একজোড়া চোখের মাঝখানে, হলুদ রঙের চ্যাপ্টা নাকে, প্রায় গেঁথে দিল ওয়ালথারের ব্যারেল।

লোকটার নাক-মুখ থেকে ঝরঝর করে রক্ত বেরুচ্ছে, ক্ষতটা চেপে ধরে মেঝেতে বসে পড়ল সে।

'ধ-ধরো ওকে!' ভারী কণ্ঠস্বর তোতলাচ্ছে। 'ধ-ধরো!'

সব মিলিয়ে চারজন ওরা। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল একজন। আরেকজন রানার পা লক্ষ্য করে ডাইভ দিল। বোঝা গেল, ওরা জ্যান্ত ধরতে চায় রানাকে।

রানার ভাঁজ করা হাঁটু মস্ত হাতুড়ির মত আঘাত করল ডাইভ দেওয়া লোকটার নাকে-মুখে। লোকটার মাথা ঝাঁকি খেল পিছনদিকে। ঘাড় ভাঙার আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলল সিটিং রুমে। মুহূর্তের জন্য তীক্ষ্ণ, রোমহর্ষক আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। তারপর স্থির হয়ে গেল শরীরটা।

'স্ট-স্টপ, এমআরনাইন!' হুমকির সুরে বলল তোতলা, .৪৫-এর ঠাণ্ডা মাজল চেপে ধরেছে রানার গলার পাশে।

অকস্মাৎ একটা ঘূর্ণির মত ঝাপসা দেখাল রানাকে, বাহুর নার্ভসেন্টারে কারাতের কোপ মেরে বিস্মিত তোতলার হাত অবশ করে দিয়েছে; ছিটকে মেঝেতে পড়েছে ওর হাতের .৪৫।

লোকটা লম্বা, চেহারায় থাই বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট, মুখে কালো তিল গিজগিজ করছে।

এই লোক থাই ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ-এর এজেন্ট, জুতনা

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

মংকট, মুরুব্বির নির্দেশে থাই টঙের দলে ভিড়ে গেছে।

তোতলার চোয়ালটাকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রচণ্ড একটা ঘুসি চালাল রানা। ঝপ করে নিচু হয়ে আঘাতটা অনায়াসে এড়াল মংকট, তারপর লাফ দিয়ে সরে গেল ওর নাগালের বাইরে। আনআর্মড কমব্যাটে ভালই ট্রেনিং নেওয়া আছে তার।

মংকট আর তার অক্ষত সঙ্গী দৃষ্টি বিনিময় করল, তারপর দুজন দু'পাশ থেকে রানার দিকে এগোল। ওদের চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে ঘৃণা আর একগুঁয়েমির অদৃশ্য আগুন।

আবার ঝাপসা ঘূর্ণি হলো রানার কাঠামো, ওর ডান পায়ের লাথি লাগল তোতলা মংকটের চোয়ালে, প্রায় একই সঙ্গে দ্বিতীয় লোকটা ঘুসি খেল পেটে। চোয়ালের শক্ত হাড়ের সঙ্গে বুটের সংঘর্ষে ফাঁপা আওয়াজ হলো, শব্দটা কানে ঢুকতে সন্তুষ্টি বোধ করল রানা। সেই সঙ্গে অনুভব করল দ্বিতীয় লোকটার নাড়িভূঁড়ি মেরুদণ্ডের সঙ্গে পিষে দিয়েছে ও।

পিছু হটল রানা।

তিন টং সদস্য আর একজন থাই আই.বি এজেন্ট মেঝেতে পড়ে আছে। তিনজনই অজ্ঞান, শুধু ভাঙা নাক নিয়ে মৃদুকণ্ঠে কাতরাচ্ছে একজন।

দ্রুত হাতে নিজের ও উত্তরার লাগেজ গুছিয়ে নিল রানা। জেরা করবার জন্যে ওদের জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে ও, কিন্তু তাতে ঝুঁকি আছে– ওদের ব্যাকআপ টিম চলে আসতে পারে।

ছদ্মবেশে থাকা সত্ত্বেও হোটেলের কেউ নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছে ওকে, থাই ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ-এর লোকাল অফিসকে খবরটা দিতেও দেরি করেনি সে। তা না হলে তোতলা ওকে এমআরনাইন বলে সম্বোধন করত না।

জেট প্লেনটার কাছে ফেরার তাগাদা অনুভব করছে রানা। বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে ওখানেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মোহনার রিপোর্ট ছিল, তোতলা মংকট পশ্চিমে গেছে। সেটা যদি সত্যি হয়, পশ্চিমে গিয়েও আবার চিয়াং মাই শহরে ফিরে এসেছে সে।

তার ফিরে আসবার সম্ভাব্য একটা কারণই থাকতে পারে, বিজ্ঞানীর মুখ খোলাবার উপায় বের করা। দোই ইনথানন থেকে অন্য কোনও কাজে চিয়াং মাইয়ে এসে থাকলে রানার জন্য ফাঁদ পাতত না সে। এই কাজটা দিয়েই শহরে ফেরত পাঠানো হয়েছে তাকে– রানাকে বন্দি করে ডক্টর নাদিরার কাছে নিয়ে যেতে হবে।

চারজনকেই বাঁধল রানা, তারপর স্যুইটে তালা দিয়ে নীচে নেমে এল উত্তরার খোঁজে।

রিসেপশন কাউন্টারের পিছনে বসা তরুণী বলল, উত্তরাকে দেখেনি সে। খাতা খুলল সে, ব্যাগ ও সুটকেসটা দেখল, তারপর রানাকে জিজ্ঞেস করল বিল মেটাবে কি না। মাথা ঝাঁকিয়ে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল রানা, লবির সচল ভিড়ে বারবার চোখ বুলাচ্ছে।

কোথাও উত্তরার ছায়া মাত্র দেখা যাচ্ছে না। রানার হাতে এত সময় নেই যে ওকে খুঁজে বের করবে। থাই টঙের শ্বেতাঙ্গ মিত্ররা সিদ্ধান্ত নিতে পারে, একেবারে কোনও তথ্য না পাওয়ার চেয়ে ড্রাগস ব্যবহার করে কিংবা নির্যাতন চালিয়ে যতটুকু পারা যায় আদায় করে নেওয়া ভাল, তাতে যদি বাঙালি বিজ্ঞানী মারা যায় তো গেল।

কিন্তু উত্তরা! মেয়েটি কি পালিয়ে গেল? নাকি ধরা পড়েছে? খুন হয়ে যায়নি তো?

এলিভেটরে চড়ে বেযমেন্ট গ্যারেজে নেমে এল রানা। চিয়াং মাই শহরে উত্তরার পরিচিত লোকজন আছে, এমনকী ইমিডিয়েট বস্‌কেও কাছাকাছি পাবে সে। কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় তার সঙ্গে দোই ইনথাননের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে?

যাওয়ার আগে অন্তত ওকে একটা ফোন করতে পারত।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

চোখে-মুখে রাগ, এলিভেটর থেকে নেমে পোর্শ-এর দিকে এগোল রানা। মানসের কথা মনে পড়ল, ভাবল– আরেক জোকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুযোগ পেলেই গায়েব হয়ে যাবে!

গাড়ির টায়ারে একটা লাথি মারল রানা। এই মুহূর্তে ওদের দুজনেরই হয়তো ওর সাহায্য দরকার।

ওকে আরও খেপিয়ে দিয়ে পোর্শ-এর পাশে পার্ক করা মার্সিডিজ থেকে বেরিয়ে এল দুই চিনা পাহাড়। কেউ কারও চেয়ে কম যায় না– নির্ঘাত ছয় ফুট লম্বা, আড়াই মণ ওজন। প্রায় এক রকমই চেহারা, যমজ না হয়ে যায় না, একজনের মাথার চুল কামানো।

চোখ-মুখই বলে দিচ্ছে, খুঁজলে খুলির ভিতর হলুদ পদার্থ পাওয়া যাবে না। গায়ে সস্তাদরের প্যান্ট-শার্ট, দাড়ি কামায়নি কয়েকদিন। মার্সিডিজের দরজা দুটো সশব্দে বন্ধ করল ওরা।

ঝট করে পুরোপুরি ওদের দিকে ঘুরে গেল রানা। 'উত্তরা কোথায়?' খেঁকিয়ে উঠল ও।

এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল ওরা, রানার রাগের বহর দেখে হকচকিয়ে গেছে। সন্দেহ নেই, তোতলা মংকটই এই দুই গবেটকে পোর্শ-এর পাহারায় রেখে গেছে।

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, ভ্রূতে যেন গিঁট পড়েছে। বুদ্ধি কম থাকতে পারে, হয়তো শক্তি দিয়ে সেটা পুষিয়ে নেয় ওরা। হয়তো নির্দেশ পালনে নিষ্ঠার পরিচয় দেয়।

'শালা বেজন্মারা, কোথায় উত্তরা?'

এই মুহূর্তে সম্ভবত মনে পড়ে গেল কী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওদেরকে। মাথা নিচু করল ওরা, বেল্টে গোঁজা খাটো হাতলসহ একটা করে হাতুড়ি বের করল, যে যার হাতের তালুতে ঠুকছে। ভীতিকর একটা ভঙ্গি নিয়ে রানার দিকে এগিয়ে আসছে দুজন, প্রয়োজনে ব্যবহার করবে ওগুলো।

'কথা বলতে জানে না,' বিড়বিড় করল রানা। 'বোধহয় পড়তেও জানে না। মগজে কিছু থাকলে তো!'

অকস্মাৎ মার্সিডিজের ট্রাঙ্ক চাপড়াতে শুরু করল কেউ। নীরব গ্যারেজের ভিতর ভোঁতা একটা আওয়াজ।

'উত্তরা!' গলা চড়াল রানা।

'সেলাম! নমস্তে! দাদা নাকি?' অস্পষ্ট একটা কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল মার্সিডিজের ট্রাঙ্ক থেকে।

'মানস!' বলল রানা, তারপর নাগালের মধ্যে চলে আসায় বিদ্যুদ্বেগে এক-পা সামনে বেড়ে প্রথম দানবের পেটে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল। পরমুহূর্তে লাফিয়ে সরে এল।

হুউস্‌স্‌ করে প্রচুর বাতাস ছাড়ল লোকটা, মাথা ঝাঁকাচ্ছে। হাতুড়িটা সবেগে নামিয়ে আনল সে, এক মুহূর্ত আগে ঠিক যেখানে রানার মাথাটা ছিল।

দ্বিতীয় দানবের হাঁটুতে প্রচণ্ড এক সাইড কিক মারল রানা, তারপর একপাক ঘুরে আবার প্রথম লোকটার পেটে স্টিলের পাত বসানো জুতোর আগাটা সেঁধিয়ে দিল। পাথরের মত শক্ত লাগল পেটটা।

যতই মার খাক, রানা বুঝল, দুই যমজের তেমন কিছুই হচ্ছে না, শুধু একটু বোধহয় দিশেহারা হয়ে পড়েছে, ব্যস।

রানাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে দুই যমজ। ওদেরকে এক মুহূর্ত দেখে নিয়ে খানিকটা পিছাল ও, পিস্তলটা বের করল, তারপর পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে লক্ষ্য স্থির করল গাড়ির পিছনের বুটের তালার উপর।

'সাবধান, মানস!'

ট্রিগার টিপল রানা।

মার্সিডিজ ট্রাঙ্কের ঢাকনি খুলে গেল। ওটার ভিতর সিধে হয়ে বসল মানস, নিঃশব্দে হাসছে।

'এর চেয়ে মজার ব্যাপার হয়?' বলল সে। 'কোটা বাহারু থেকে চিয়াং মাই, বুঝলেন না! পনেরোশো কিলোমিটার ফ্রি ট্রিপ,

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

অথচ ওদের কাছে আমি বেড়ানোর আবদারও করিনি! মাইরি, কী কপাল নিয়ে যে জন্মেছি!'

গুলির আওয়াজে প্রথমে একটু থমকালেও সামলে নিয়ে থাই টঙের দুই যমজ দু'দিক থেকে এগোল ওর দিকে।

দ্বিতীয়, অর্থাৎ টেকো দানবটার পেটে কষে একটা ঘুসি মেরে উল্টোদিকে সরে যাচ্ছে রানা। 'উত্তরা কোথায়?' প্রশ্ন করবার সময় প্রথম দানবটার ঊরুসন্ধিতে ভাঁজ করা হাঁটুর গুঁতো দিল।

হাঁটুটা শক্ত প্যাডে লাগল, লোকটার কিছুই হলো না। মারামারি করবার জন্য তৈরি হয়েই এসেছে ওরা।

মার্সিডিজকে ঘুরে পোর্শের দিকে এগোল রানা, রিমোট কন্ট্রোলের সুইচে চাপ দিতেই, খেউ-খেউ করে দুটো ডাক ছেড়ে খুলে গেল সবকটা দরজার লক। 'ভেতরে ঢুকুন!' তাগাদা দিল মানসকে।

'তা আর বলতে!' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মার্সিডিজের ট্রাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এল মানস। 'আমার যেন মনে হলো এই দুই জানোয়ারের সঙ্গীরা আপনার বান্ধবীকে একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেল।'

মার্সিডিজকে পাশ কাটিয়ে রানাকে ধাওয়া করল দুই যমজ, রানাও ওদের নাগালের বাইরে থাকার জন্য ঘুরছে, সেদিকে একটা চোখ রেখে গাড়ির জ্যাক উঁচু করার স্টিলের রডটা তুলে নিল মানস এক হাতে। ব্যাগ আর সুটকেস পোর্শ-এর ব্যাকসিটে ছুঁড়ে দিল। ঠিক তখনই ওর পাশ দিয়ে ন্যাড়া যমজটা রানার দিকে এগোচ্ছে দেখে ধাঁই করে রড চালাল ওর মাথা লক্ষ্য করে। সেই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাপরে! গেছে আমার হাতটা!'

মাথায় বেমক্কা বাড়ি খেয়ে থমকে দাঁড়াল আরব্যোপন্যাসের দৈত্য। রানাকে ছেড়ে ওর দিকে ফিরছে দেখেই একলাফে সরে গেল মানস, তারপর আরেক বাড়ি লাগিয়ে দিল লোকটার কনুই বরাবর। এবং লাফিয়ে উঠে পড়ল গাড়িতে।

'ভাল করেছেন,' বলল রানা। 'এবার স্টার্ট দিন!'

'মারতে গিয়ে হাতে ব্যথা পেয়েছি, মাইরি!' গলা চড়িয়ে বলল মানস। 'গাড়িটা আপনি চালালে ভাল হয়, বুঝলেন না, সার!'

'তা হলে ড্রাইভারের দরজাটায় ঠেলা দিন!'

গাড়িতে উঠে প্রথমে নিজের দিকের দরজাটা বন্ধ করল মানস, তারপর হাত লম্বা করে ড্রাইভারের দরজা খুলে ফেলল। 'আমাদের আর দেরি করা উচিত হবে না, হুজুর, মানে, সার,' বলল সে, জানালার কাঁচ মাত্র ইঞ্চি দুয়েক নামিয়েছে। 'নাকি এখনও ভাবছেন আপনার পক্ষে ওদেরকে কাবু করা সম্ভব?'

'চেষ্টা তো করছি!'

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। দুই মাংসের পাহাড় হামলা করতে আসছে ওর উপর। নিঃশব্দে হাসছে ওরা, জানে মেরে ছাতু বানিয়ে ফেলবে শত্রুকে। দু-পাশ থেকে ঝাঁপ দিল ওরা একযোগে।

সম্ভাব্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর ঝট করে একপাশে সরে গেল। এই মুহূর্তে বিদ্যুৎ-গতিই ওর একমাত্র সম্বল।

দুই যমজ পাহাড় বুঝতে পারল কী হতে যাচ্ছে। হতাশা ফুটল ওদের বোকা বোকা চেহারায়। অনেক দেরি করে ফেলেছে বুঝতে। সিকি টন করে ওজন ওদের একেকজনের, এবং এই মুহূর্তে নিজেদের গতি নিয়ন্ত্রণ করার সাধ্য নেই কারও।

পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেল দুটো শরীর, তারপর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ধড়াস করে পড়ল সান বাঁধানো মেঝেতে। চেহারায় আচ্ছন্ন একটা ভাব। ব্যথাটা কয়েক সেকেন্ড পর অনুভব করবে ওরা। কেউ যদি এরকম প্রকাণ্ড হয়, তার সবকিছুতেই একটু বেশি সময় লাগে।

ওদের শরীর টপকে লাফ দিয়ে গাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল রানা। লক করল দরজা, ইগনিশনে চাবি ঘোরাল, তারপর

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

সগর্জনে বেরিয়ে গেল গ্যারেজ থেকে।

দশ

চিয়াং মাই থেকে দোই ইনথানন ষাট কিলোমিটার। ভাল রাস্তার অভাবে পশ্চিমে যাওয়ার জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পোর্শ ছোটাচ্ছে রানা, ফলে অনেক বেশি পথ পার হতে হচ্ছে ওদেরকে।

চাঁদ ঢলে পড়লেও, তারার মেলা বসেছে আকাশে। আট কিলোমিটার এগোবার পর মেইন রোড ছেড়ে বনভূমির ভিতর ঢুকল রানা। সম্ভাব্য অনুসরণকারীর কথা ভেবেই এই সাবধানতা।

জঙ্গলের পথটা কিছুদূর পর্যন্ত পাকা, তারপর ইঁট বিছানো, সবশেষে মেটো। তবে খানা-খন্দ কমই। নির্জন পথ, পোর্শই একমাত্র গাড়ি। জানালা দিয়ে অন্ধকার জঙ্গলের ভিতর দেখবার কিছু নেই।

হঠাৎ রাস্তার ধারে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে মানসের দিকে তাকাল রানা। 'কে শুরু করবে?' কোনও ভূমিকা না করেই জিজ্ঞেস করল ও। 'আমি, না আপনি?'

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল মানস। তারপর নিজের বুকে একটা আঙুল ঠেকাল। 'আমি।'

'বেশ।' রানা গম্ভীর। 'শুরু করুন।'

'দুটো কথা জানতে চাইছেন আপনি,' বলল মানস। 'এক, আমি আপনার সঙ্গে আঠার মত সেঁটে আছি কেন। দুই, আমাদের অফিস থেকে আমাকে ঠিক কী নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আপনার বদলে অন্য কোনও এসপিওনাজ এজেন্ট হলেও এই একই প্রশ্ন করত। প্রথমে আমি দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর দিই।'

'আমি অপেক্ষা করছি,' বলল রানা।

'ভারতমাতার সেবা করার নামে অনেক কাজই করতে বলা হয়েছে আমাকে,' শুরু করল মানস। 'তার মধ্যে একটা হলো উপযুক্ত সময়ে মাসুদ রানাকে খুন করা। আমার বসের এটাই পরিষ্কার নির্দেশ।'

'এই নির্দেশ আপনি কখন পেলেন?' জানতে চাইল রানা।

'কখন আবার, আপনি আমাকে ক্লজিট থেকে বের করার পর যখন ডোবার ধারে বসলাম,' বলল মানস। 'আরে মশাই, ওই তাড়াহুড়োর সময় প্রকৃতি সত্যি কাউকে ডাকে নাকি!' হাসছে ও। 'আমার কাছে ছোট্ট, অথচ অত্যন্ত শক্তিশালী রেডিও আছে।'

'আর কী নির্দেশ পেয়েছেন?' জানতে চাইল রানা।

'বিজ্ঞানী ও প্লেনটাকে ভারতে নিয়ে যেতে আমাদের দুটো টিমকে সাহায্য করতে হবে,' জানাল মানস।

'বস্‌কে নিশ্চয় কথা দিয়েছেন তাঁর সব নির্দেশই আপনি পালন করবেন?' ঠাণ্ডা সুরে জানতে চাইল রানা, মানসের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'বোঝেনই তো, কথা না দিয়ে উপায় আছে?' নার্ভাস একটু হাসি দেখা গেল মানসের ঠোঁটে। 'বিদ্রোহ করলে ঝাড়ে-বংশে শেষ করে ফেলবে না!'

'ঠিক আছে,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'এবার নেমে যান গাড়ি থেকে।'

কথাটা শুনে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল মানস। তারপর

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

রানাকে বিব্রত করে দিয়ে নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল। চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় পানি গড়াচ্ছে।

রানা ভাবল, এটা যদি ওর অভিনয় হয়, আগামী অস্কারের জন্য মনোনয়ন পাওয়া উচিত ওর।

'আপনি আমাকে অবিশ্বাস করলেন?' বলল মানস। 'আমি তো কেবল একজন স্পাই নই, মানুষও!'

একটা কথাও বলছে না রানা।

'মানস ঘোষ হিন্দু হতে পারে, আপনারা যাদেরকে মালাউন বলেন, কাফের বলেন,' আবার বলল মানস, এখনও তার গাল বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। 'কিন্তু সে বেঈমান নয়। একবার কাউকে বুক দেখালে মরে গেলেও কখনও তাকে পিঠ দেখাবে না।' গাড়ির দরজা খুলে নেমে যাচ্ছে সে।

'আপনি শান্ত হন,' বলল রানা, তার হাতে একটা রুমাল গুঁজে দিল। 'পুরুষমানুষ এভাবে কাঁদে না,' ওর কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার।

কান্না থামাতে চেষ্টা করেও পারছে না মানস, স্বাভাবিক হতে আরও একটু সময় দিতে হবে ওকে।

'এখনও আপনি একটা প্রশ্নের উত্তর দেননি,' বলল রানা, নিজেকে সাবধান করতে ভুলল না যে এই লোকটা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে ওকে– কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই।

'জী, বলুন।' রানার দিকে তাকাচ্ছে না মানস।

'আপনি আমার সঙ্গে এভাবে আঠার মত সেঁটে আছেন কেন?' বলল রানা।

'আমার আসলে রথ দেখা আর কলা বেচা, দুটোই হচ্ছে,' চোখ মুছতে মুছতে বলল মানস। 'কপালগুণে আমি আমার মহানায়ককে পেয়ে গেছি, একটু নির্লজ্জের মত শোনালেও তাঁকে ছেড়ে যেতে আমার মন চাইছে না। আমি আসলে আপনার বন্ধু অনিল চ্যাটার্জীর সাকরেদ।'

'অনিল?'

'হ্যাঁ, মাসিমা ও তাঁর মুখে আপনার কথা শুনতে শুনতে কবে যে ভক্ত হয়ে গেছি নিজেও জানি না।'

'আর কলা বেচার ব্যাপারটা? কীভাবে সারবেন সেটা?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল রানা। 'পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে আমার খুলিতে একটা বুলেট ঢুকিয়ে?'

'কার মাথায় বুলেট ঢোকাব সেটা সময়ই বলে দেবে,' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল মানস।

'কিন্তু আমার তো জানা দরকার যাকে সঙ্গে নিয়ে চলছি, তার কাজটা কী, কী কারণে এতবড় একটা বিপদে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে সে,' বলল রানা।

'আপনাকে শুধু এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে বাংলাদেশ আর চিনের বিরুদ্ধে আমি কিছু করতে যাচ্ছি না। এর বেশি এখন যা-ই বলি না কেন, হয় অযৌক্তিক আর অবিশ্বাস্য শোনাবে, নয়তো আন্দাজে বলা হবে। আর যদি জিজ্ঞেস করেন কেন এত বড় ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি, এর কোনও জবাব আমার আসলে জানা নেই– হতে পারে এটাই আমার নিয়তি।'

আরও কিছু শোনার অপেক্ষায় রয়েছে রানা।

একটু থেমে আবার বলল মানস, 'জানি, আমার এই উত্তর আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না, কাজেই আপনার নির্দেশ মেনে নিয়ে আমার চলে যাওয়াই উচিত। ওকে, থ্যাঙ্কিউ অ্যান্ড অল দ্যাট। গুডবাই, মিস্টার রানা। আই উইশ উই গুড লাক।'

গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে মানস।

'ঠিক আছে, কী বলেছি ভুলে যান,' তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল রানা, যদিও নিজের এই আচরণের প্রতি পুরোপুরি সমর্থন নেই ওর।

রুমালটা নিয়ে চোখ-মুখ মুছল মানস, ফোত্ ফোত্ আওয়াজ করে নাক ঝাড়ল তাতে। অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে আবার

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

স্বাভাবিক হয়ে গেল সে। বলল, 'এহ্‌হে, এটা তো আপনাকে আর ফিরিয়ে দেয়া যাবে না। ভালই হলো, বুঝলেন না, গ্রেট মাসুদ রানার ব্যবহার করা একটা জিনিস পেলাম! ভোলাকে আপনার গন্ধ শোঁকাবার কাজেও লাগাতে পারব।'

আবার গাড়ি ছাড়ল রানা। খুব চিন্তায় আছে ও, কারণ মানসকে নিয়ে ওর দ্বিধা এখনও কাটেনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মানস। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। 'রাত বলি আর দিন, খুব ধকল যাচ্ছে,' বলল সে। 'বুঝলেন না।'

'তা যাচ্ছে,' বলল রানা, তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'থাই থান্ডারের সেফ হাউস থেকে পালাবার সময় আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বোধহয় ভুল করেনি,' বলল রানা। 'ঠিকই এক-আধজন টং গুণ্ডাকে পেয়ে গিয়েছিলেন।'

'সত্যিই তা-ই,' বলল মানস। 'আসলে আমি একা তাকে পাইনি, সে-ও আমাকে পায়। দাদা তো জানেনই যে আমি আপনার মত অতটা যুদ্ধবাজ নই। কাজেই বাধ্য হয়ে আমাকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভর করতে হয়।'

'কী হয়েছিল তা-ই বলুন।'

'আমি তো জানিই ওকে কাবু করতে পারব না, বুঝলেন না। সুযোগ পেলাম যখন বুঝতে পারলাম ওই ব্যাটা আমাকে জ্যান্ত ধরতে চায়। সে আসলে আমাকে দাদা ভেবেছিল! দি গ্রেট মাসুদ রানা! দি গ্রেটেস্ট এসপিওনাজ এজেন্ট অভ দ্য সেঞ্চুরি।' হাসল মানস। 'আমি তার ভুলটা শোধরাবার চেষ্টা করিনি, সে-ও অত বড় একজন স্পাইকে ধরতে পেরে খুব গর্ব অনুভব করল।'

'ডক্টর নাদিরাকে কথা বলাবার জন্যে আমার সাহায্য দরকার ওদের।'

'ঠিক তাই,' বলল মানস। 'ওদের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছেন ভদ্রমহিলা। একেবারে স্পিকটি নট, মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। শুনলাম যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করছে ওরা ওঁকে, উনিও ইংরেজি-বাংলা-চাইনিজ মিশিয়ে সমানে ওদের গুষ্টি উদ্ধার করছেন। মুশকিল হয়েছে কি জানেন, যদি মরে যান এই ভয়ে তাঁর উপর টরচার করতেও সাহস পাচ্ছে না। সেজন্যেই ওরা আপনার সাহায্যে ওঁর মুখ খোলাবার প্ল্যান করেছে।'

'তাই বুঝি?'

'বিজ্ঞানীকে নয়, টরচার করা হবে আপনাকে, আপনি যাতে কেঁদেকেটে তাঁর মুখ খোলাতে পারেন।' চেহারাটা কোঁচকাল মানস। 'সেরা হবার ল্যাঠাও কিন্তু কম নয়, বুঝলেন না!'

'ওদের ভুলটা নিশ্চয় ভাঙল একসময়?'

'ভাঙল বইকি। তবু আমাকে ছাড়ল না, আপনাকে ধরতে যদি সাহায্য হয়, তা-ই ভেবে।'

'চিয়াং মাইতে সেজন্যেই আমাকে ওরা ধরতে চেষ্টা করেছে।'

'কিন্তু, দাদা, আমাদের কথা ওরা জানল কীভাবে?' উদ্বিগ্ন হলো মানস, ছাগলদাড়ি মোচড়াচ্ছে।

'ওরা আপনার কথা জানে না। শুধু আমার কথা জানে।'

ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল। 'কোথাও একটা লিক আছে,' বলল সে। 'শুধু তাই নয়, আপনি জানেন কে সে।'

'জানি না, সন্দেহ করি,' বলল রানা। 'এমন একজন, যে থাই টংকে খবর দেয় কোটা বাহারুর কোথায় পাওয়া যাবে রানা এজেন্সির লাবণীকে। তারপর কোটা বাহারু আর চিয়াং মাইয়ের পথে ঠিক কোথায় আছি আমি।'

'আচ্ছা!' উত্তেজিত হয়ে উঠল মানস। 'তা হলে সেই বেঈমান লোকটা কে হতে পারে, হুজুর– থুক্কু– মিস্টার রানা?'

'আরও নিশ্চিত না হয়ে বলতে চাইছি না,' শান্ত গলায় বলল রানা।

উঁচু-নিচু পথ। জঙ্গল কোথাও খুব ঘন, আবার কোথাও

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

একেবারে হালকা। মাঝে মধ্যেই পাথুরে উঁচু টিলাকে পাশ কাটাচ্ছে রানার পোর্শ। ক্রমশ পাহাড়ী এলাকায় ঢুকছে ওরা।

এক সময় জঙ্গলটার শেষ প্রান্তে পৌঁছাল গাড়ি। সামনে হাইওয়ে। নির্জন রাস্তা।

কয়েকটা মিনিট নির্বিঘ্নে পার হলো।

শুনতে পাওয়ার আগে ওটাকে দেখতে পেল রানা। পিছনের হাইওয়ে ধরে ওদেরকে ধাওয়া করে আসছে আলোর তির্যক একটা টানেল। তারপর আচমকা গুরুতর বিপদসংকেত হয়ে উঠল হেলিকপ্টারের রোটর আর ইঞ্জিনের গর্জন।

'থাই আইবি?' জিজ্ঞেস করল মানস, কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে আছে।

'কী করে বলি!' দ্রুত রাস্তা ছাড়ল রানা, ঘাসের উপর দিয়ে চালিয়ে গাড়িটাকে দাঁড় করাল পাঁচ-সাতটা প্রাচীন বটগাছের ভিতর।

'আমার ধারণা, ওরাই!' বলল মানস।

'আমার খোঁজে আরও আগেই বেরোনোর কথা ওদের,' বলল রানা। মনে মনে একটা হিসাব করল– লাশটা পেতে দেরি হয়েছে, তল্লাশির আয়োজন করতে সময় লেগেছে।

'তবে এতক্ষণে খুব ভালভাবে আপনার এই গাড়ি চিনে ফেলেছে ওরা,' বলল মানস।

দ্রুতবেগে গাছগুলোর উপরে চলে এল হেলিকপ্টার। ওটার গর্জন ওদের খুলি যেন ভরাট করে তুলল। দু'এক মুহূর্তের জন্য একজোড়া গরুর গাড়ির উপর স্থির হলো আলোর বৃত্তটা, তারপর হাইওয়ের উপর দিয়ে ছুটে চলল, ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল যান্ত্রিক শব্দদূষণ।

অনেকটা সামনে মাথায় গাছপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা পাহাড়, বাঁক ঘুরে সেটার আড়ালে চলে গেল কপ্টার।

'আবার ফিরে আসবে ওরা,' বলল মানস।

'চেষ্টা করব ওদের চোখে ধরা না পড়তে, তবে যদি সম্ভব না হয়...' কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, তাকিয়ে আছে ড্যাশ বোর্ডের উপর আটকানো ছোট্ট রেডিওটার দিকে। ওটার গায়ে বসানো খুদে একটা লাল আলো এই মাত্র জ্বলল।

'আমরা ফাইট করব, মিস্টার রানা, সার?' শিরদাঁড়া খাড়া করল মানস।

'তা ছাড়া উপায় কী,' বলে রেডিওটা হাতে নিল রানা। দরজা খুলছে। 'জান বাঁচানো ফরজ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মৃদু হাসল মানস। 'একজন এক্সপার্টের সঙ্গে থাকায় ভারি স্বস্তি বোধ করছি, বুঝলেন না!'

গাড়ি থেকে বেরুবার সময় হেসে উঠল রানা। 'আপনি নিজেও কারও চেয়ে কম নন, মিস্টার মানস। তার ওপর প্রকৃতির তরফ থেকে আছে স্পেশাল একটা গিফট– ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। আমার ধারণা, ওটা আপনাকে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বহুবার ফিরে আসতে সাহায্য করেছে।'

'সবই তাঁর কৃপা,' বলে অদৃশ্য কাউকে নমস্কার করল মানস। 'কথাটা সত্যি।'

হাতে রেডিও নিয়ে গাছগুলোর মাঝখানে চলে গেল রানা। বোতামে চাপ দিয়ে সেটটা অন করল ও। জানে বিসিআই থেকে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তবে জানে না অপরপ্রান্তে কে। দুই দেশের মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাত্র এক ঘণ্টা, তার মানে ঢাকাতেও এখন সকাল হয়নি।

'মাসুদ রানা।'

'রাহাত খান,' রানাকে চমকে দিয়ে বিসিআই চিফের ভারী গলা ভেসে এল। 'ডক্টর নাদিরাকে পেয়েছ?'

'দুঃখিত, সার,' বলল রানা, ওর কাছ থেকে একটা ভাল খবরের আশায় বৃদ্ধ বস্ সারারাত জেগে অফিস করছেন বুঝতে পেরে মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল, কারণ জানে ইদানীং তাঁর

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

শরীর তেমন একটা ভাল যাচ্ছে না। 'তবে জানতে পেরেছি কোথায় আছেন তিনি।'

'সব কথা খুলে বলো আমাকে,' নির্দেশ দিলেন বস্।

শুরু করল রানা। কী কী ঘটছে জানাবার পর পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষেপে একটা ধারণা দিল।

'জেটটা তা হলে শুধু রহস্য নয়, বিপজ্জনকও,' রানাকে থামতে বললেন বিসিআই চিফ। 'তিনদিন আগে দোই ইনথাননে আমরা একজন ইনফরমারকে পাঠিয়েছি। সে কোনও রিপোর্ট করছে না।'

'সার, টিসিআই এজেন্ট উত্তরা বলছিল, ওদের প্রজারা অচেনা লোকজনকে ওদিকে যেতে দেখেছে, কিন্তু কাউকে ফিরতে দেখেনি।'

'তোমাকেও আবার ওখানে যেতে হচ্ছে, কাজেই সাবধান।'

'জী, সার।'

'পাহাড়ের ওপর গাছপালায় আগুন লেগে যাচ্ছে,' বিসিআই চিফ যেন স্বগতোক্তি করছেন। 'মনে হচ্ছে মেশিন-পত্র ব্যবহার করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলছে ওরা, সেজন্যেই ডক্টর নাদিরাকে ওদের দরকার।'

'জী, সার,' বলল রানা। 'কিন্তু কী মেশিন-পত্র, সার? আমাদের দুরন্ত ঈগলে যেগুলো ফিট করা ছিল, সেগুলো নয়তো? এমন কি হতে পারে যে জিয়া এয়ারপোর্টে দুরন্তকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছে ঠিকই, কিন্তু আগুন দেয়ার আগে ওটা থেকে বিশেষ কিছু মেশিন-পত্র সরিয়ে ফেলা হয়? এখন নিজেদের তৈরি একটা প্লেনে সেগুলোই ফিট করার চেষ্টা হচ্ছে, ডক্টর নাদিরার সাহায্য নিয়ে?'

রানার প্রশ্নের উত্তর যা-ই হোক, এ থেকে আরও প্রশ্ন তৈরি হবে– যেমন, কেন এমন একটা প্লেন তৈরি করা হলো যেটার গায়ে লেখা হয়েছে: **দুরন্ত ঈগল, বাংলাদেশ এয়ারফোর্স?**

'না, তা কী করে হয়,' ঢাকা থেকে বললেন বিসিআই চিফ। 'দুরন্তে যে-সব মেশিন-পত্র ফিট করা ছিল, সবই বিল্ট-ইন। ওগুলো এমন ভাবে তৈরি করা হয় যাতে কেউ খুলে নিয়ে যেতে না পারে।'

রানা জানতে চাইল, 'সেগুলো ঠিক কী ধরনের মেশিন-পত্র, সার?'

'স্পেশাল কিছু ইকুইপমেন্ট, রানা,' বললেন রাহাত খান। 'দুরন্তে এমন ট্র্যাকিং কেপেবিলিটিজ ছিল, পাইলট এক হাজার মাইল রেঞ্জের মধ্যে সব কিছু দেখতে পাবে– অন্যেরা যেখানে চারশো মাইলের বেশি রেঞ্জ হলে দেখতে পায় না।'

'অপারেটিং সিস্টেম, সার?'

'সব কিছু ন্যানো টেকনলজির সাহায্যে তৈরি কমপিউটার অপারেট করে– আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। ডিফেন্সের জন্যে নেটওঅর্কড্ লেযার উইপন, যেটা কোথায় আঘাত হানবে নিজে থেকেই তার ছক তৈরি করতে পারে। স্পাইং ও অ্যান্টি-ওঅর টেকনলজিতে বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে যাচ্ছে ডক্টর নাদিরার এ-সব আবিষ্কার। অন্য কেউ তাঁর কাছাকাছিও পৌঁছাতে পারেনি।'

'সার,' বস্ থামতে বলল রানা, 'আমার ধারণা, দোই ইনথানন পাহাড়ে বারবার আগুন লাগার জন্যে লেযারই দায়ী।'

'তা হলে ওটা ওদের নিজেদের লেযার যন্ত্র,' বললেন বিসিআই চিফ। 'নিজেরা ফিট করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলছিল, তাই ডক্টর নাদিরাকে ধরে নিয়ে গেছে ফিট করাবে বলে।'

মনে মনে রহস্যটা মেলাবার চেষ্টা করছে রানা। ধরা যাক, ওদের প্রতিপক্ষ জানত ডক্টর নাদিরা দুরন্ত ঈগলকে ডেভেলাপ করেছেন কোনও রকম ডিজাইন ছাড়াই– ডিজাইন যদি কোথাও থেকে থাকে তো সে-সব শুধু তাঁর মাথাতে আছে। তারা প্ল্যান করল, ডক্টর নাদিরাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে, তারপর

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

তাঁকে দিয়ে নিজেদের জন্য একটা দুরন্ত ঈগল তৈরি করাবে।

ঠিক তাই করাচ্ছে ওরা।

ঢাকায় দুরন্ত ঈগলকে পোড়ানো হলো কেন? কারণ, চিন বা আর কেউ যাতে এই নতুন টেকনলজি ব্যবহার করতে না পারে।

রানা চিন্তিত। কোথায় যেন একটা অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে, মনটা খুঁতখুঁত করবার সেটাই কি কারণ? কী যেন ঠিক মিলছে না।

'রানা?'

চমকে উঠে রানা বলল, 'ইয়েস, সার!'

'তুমি জানো তিনি এখন কোথায়,' ভারি গলায় বললেন রাহাত খান। 'কাজেই কাজটা এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। তাঁকে আমাদের দরকার।'

'জী, সার।'

'তা হলে এত চিন্তা করছ কেন?' ক্ষীণ হলেও বসের কণ্ঠে তিরস্কারের সুরটা স্পষ্ট। 'যেভাবেই হোক তাঁকে ওখান থেকে বের করে আনো। সুস্থ অবস্থায়। এখানে তাঁর অনেক কাজ। নতুন একটা দুরন্ত বানাব আমরা।'

'জী, সার,' বলল রানা। বস্ রাত জেগে অফিসে বসে আছেন, এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টটাকে কী রকম গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন তিনি।

'আমরা কতটুকু কী করতে পারব, তুমি জানো,' বললেন চিফ। 'তোমাকে সাহায্য করার জন্যে থাইল্যান্ডে সৈন্য পাঠাবার সাধ বা সাধ্য, কিছুই নেই আমাদের।'

'জী।'

'তবে যেখান থেকেই সাহায্য পাওয়া যায়, নেবে,' বললেন রাহাত খান।

অপেক্ষা করছে রানা।

'চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিস সম্পর্কে নতুন করে আমার কিছু বলার নেই তোমাকে। ওদেরকে আমি উপযাচক হয়ে কিছু করতে নিষেধ করে দিয়েছি। লিউ ফুচুংকে বলেছি, সাহায্যের প্রয়োজন হলে তুমিই ওকে জানাবে। আমি চাই তোমার কাজের স্বাধীনতা যেন বিঘ্নিত না হয়।'

'জী, সার।'

'গুড লাক, মাই বয়।' যোগাযোগ কেটে দিলেন বিসিআই চিফ।

গাড়ির কাছে ফিরে আসছে রানা।

হাতঘড়ির খুদে একটা বোতামে চাপ দিল মানস। মুখ তুলল, রানার প্রতিটি নড়াচড়া দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করছে সে।

ড্রাইভিং সিটে বসে স্টার্ট দিল রানা, আড়চোখে তাকিয়ে দেখে নিল মানসের হাতঘড়িটা। হাইওয়েতে উঠে এল গাড়ি।

'মহাশয় কিন্তু প্রচুর সময় নিলেন,' এক সময় নীরবতা ভেঙে মন্তব্য করল মানস। 'রিপোর্ট করলেন বুঝি?' তার মুখে সবজান্তার হাসি।

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

'নিশ্চয়ই নতুন কোনও নির্দেশ পেয়েছেন,' বিড়বিড় করল মানস। 'প্লেনটা ধ্বংস করে ফেলতে হবে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'নির্দেশ সেই একটাই, বিজ্ঞানীকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবে ধ্বংস করার আগে জেটটাকে একবার দেখতে চাই আমি। চেষ্টা করব ইন্টিরিয়ার-এর ফটো তোলার। জানা দরকার কী টেকনলজি ডেভেলাপ করল ওরা।'

'আচ্ছা। হ্যাঁ।' চিন্তিত হলো মানস। 'আসলে একই সঙ্গে দুটো অ্যাসাইনমেন্ট। সফল হওয়া অত্যন্ত কঠিন।'

হাসল রানা। 'সফল হতে চাইলে কোনও বাধাই কঠিন নয়, শুধু দেখতে হবে চাওয়াটা কতখানি প্রবল।'

মাথা ঝাঁকাল মানস। বুঝতে পারছে সে। কায়মনোবাক্যে সফল হতে চাওয়াটাই যে-কোনও ভাল এজেন্টের সবচেয়ে বড়

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

গুণ।

দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে মানস। এই মাত্র নিয়মিত রুটিন রিপোর্ট পাঠাবার সময় নতুন দিল্লি থেকে তাকে জানানো হয়েছে– রানা আর তার জন্য দোই ইনথানন পাহাড়ের কাছাকাছি কোথাও ফাঁদ পাতার প্রস্তুতি নিচ্ছে পিসিআই এজেন্টরা। ওদের কাজ, এই পথ দিয়ে কেউ যাতে থাই টং-এর আস্তানার দিকে যেতে না পারে সেটা নিশ্চিত করা। যেভাবেই হোক এখন ওরা জানে রানার সঙ্গে মানস ঘোষ নামে ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের একজন এজেন্ট আছে।

এই তথ্যের সঙ্গে ব্যাক-আপ প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে– উদয় চ্যাটার্জি দোই ইনথানন দুর্গ এলাকা পেনিট্রেট করতে না পারলে মাসুদ রানার সঙ্গে আঠার মত সেঁটে থাকতে হবে মানসকে। তখন ওর উপরই বর্তাবে অ্যাসাইনমেন্ট সফল করবার সমস্ত দায়িত্ব, যে-কোনও মূল্যে ডক্টর নাদিরা আর দুরন্ত ঈগলকে রানা ও চিনাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে।

দিল্লি আরও জানিয়েছে, ভোলার খাবার রাখা আছে সামনের একটা মন্দিরে।

হেডঅফিস থেকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই কাজে চেষ্টার কোনও ত্রুটি বরদাশত করা হবে না।

মানস ভাবছে, রানাকে ওর খুন করতে হবে কি হবে না সেটা স্থির করবার সময় এখনও আসেনি। উদয় আগে দুর্গ পেনিট্রেট করতে ব্যর্থ হোক, সমস্যাটা তখন সমাধান করবার প্রশ্ন উঠবে।

ওর মাথায় এখন একটাই চিন্তা, একার চেষ্টায় কীভাবে পাকিস্তানীদের হামলা ঠেকাবে ও! নিজেকে বোঝাল, হাতে এখনও প্রচুর সময় আছে, আশা করা যায় কিছু একটা বুদ্ধি ঠিকই পেয়ে যাবে।

রাতটা নিঃশব্দে পার হয়ে যাচ্ছে। চাঁদ ডুবে গেলেও, আকাশ জুড়ে মিটমিট করছে অসংখ্য তারা। বাতাস আছে, ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু মেঘকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে।

আবার দেখা গেল আলোর টানেল। এবার ওদের সামনে থেকে এল। বোধহয় সেই আগের কপ্টারটাই, হাইওয়ের উপর দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে আসছে পোর্শের দিকে। মানসের হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে ওঠাটা অনুভব করল রানা।

'ওরা ফিরে এসেছে,' হিন্দিতে বলল সে, প্রায় অস্ফুটে।

শুধু হাইওয়ে নয়, পোর্শের খোঁজে দু'পাশের ঘাসজমির উপরও স্পটলাইটের আলো ফেলা হচ্ছে। এবার লুকাবার কোনও জায়গা নেই ওদের– কাছাকাছি কোনও গাছপালা দেখা যাচ্ছে না। হাইওয়ের একদিকে পাহাড়-প্রাচীর, আরেকদিকে গভীর, কালো খাদ।

চাপ দিয়ে একসেলারেটর মেঝেতে দাবাল রানা। 'শক্ত হয়ে বসুন,' বলল ও।

'জো হুকুম, জাঁহাপনা!' নড়েচড়ে বসল মানস, উত্তেজনায় অধীর।

ড্যাশবোর্ডে সবুজ পান্নার মত জ্বলজ্বল করছে একটা বোতাম, সেটা স্পর্শ করল রানা। টার্বোজেট-এর জি-ফোর্স পোর্শকে সামনের দিকে হ্যাঁচকা টান দিতে সিটের পিছনে বাড়ি খেল ওদের পিঠ। চোখের পলকে স্পটলাইটের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এল পোর্শ, সেই সঙ্গে পিছনে ফেলে এল মাথার উপর বনবন করে ঘোরা রোটরকে।

'এত দ্রুত, মিস্টার রানা? ওরা বোধহয় আমাদেরকে দেখতেও পেল না!'

দীর্ঘ একটা বাঁক ঘুরছে পোর্শ, তীক্ষ্ণ শব্দে প্রতিবাদ জানাচ্ছে টায়ার। রিয়ারভিউ মিররে চোখ রাখল রানা। হেলিকপ্টার স্থির হলো, স্পটলাইটের আলো ফেলে জায়গাটা দেখে নিল, ঠিক যেখানে ছিল পোর্শ।

গাড়ির মেঝেতে পা, আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে পোর্শকে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

ছোটাচ্ছে রানা। পাশ কাটাবার সময় পাথরের স্তূপ, বোল্ডার ও কাঁটাঝোপকে ঝাপসা লাগছে।

উল্টোদিক থেকে মাঝে-মধ্যে একটা-দুটো গাড়ি আসছে, আরোহীরা বেশিরভাগই প্রতিবেশী দেশের পর্যটক, উন্মত্ত পোর্শকে তীরবেগে পাশ কাটতে দেখে ড্রাইভাররা একটানা হর্ন বাজাচ্ছে আর জানালার সামনে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করছে।

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?' হঠাৎ জানতে চাইল মানস। সুন্দরী ও ক্লান্ত এক ড্রাইভারকে দেখবার জন্য ঘাড় ফেরাল সে, পোর্শের পাগলামি দেখে রাগে জ্বলজ্বল করছে চোখ-মুখ।

'হাইওয়ে থেকে বেশি দূরে নয় গ্রামটা,' বলল রানা। 'আর দশ-বারো মিনিট লাগবে। তারপর গাড়িটা কোথাও লুকিয়ে রেখে পাহাড়ে উঠে যাব, যেখান থেকে জেটটা প্রথমে দেখা গেছে।'

'তা হলে আমি এত চিন্তা না করলেও পারি, বুঝলেন না,' বলল মানস। 'থাই টং বেশ কিছুক্ষণ বিভ্রান্তিতে ভুগবে। কী একখানা অটোমোবাইল! আর ড্রাইভারটাও ওস্তাদোঁ কা ওস্তাদ!'

'আর দুর্দান্ত প্যাসেঞ্জারটার কথা বলছেন না যে, যার চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপছে না এসব দেখে? ইউ নো হোয়াট টু এক্সপেক্ট; নো ডাউট ইউ মাস্ট বি আ গুড স্পাই।'

'কিছু যদি মনে না করেন, ওই পাহাড় থেকে কে দেখেছিল প্লেনটা?' জানতে চাইল মানস। 'আপনি?'

'না,' বলল রানা। 'দেখেছিল ইমরুল কায়েস, আমাদের ব্যাংকক শাখার প্রধান–যাকে খুন করেছে টং।' দুটো নয়, এক অর্থে তিনটে অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করছি আমি, ভাবল রানা। কায়েস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যারা সরাসরি জড়িত তাদের সবার উপর প্রতিশোধ নিতে হবে আমাকে।

'দুঃখিত।'

সামনের রাস্তা ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে। ছোট একটা পাহাড়ের চূড়ায় হেডলাইটের আলো পড়ল। আকাশে শিং ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্থির ছবির মত একটা হরিণ, নাকটা এমনভাবে উঁচু করা যেন নক্ষত্রের ঘ্রাণ নিচ্ছে।

'ভারি সুন্দর দেশ,' মন্তব্য করল মানস। 'সেজন্যেই ট্যুরিস্টদের এত ভিড় এখানে।'

রাস্তাটা আবার ঢালু হয়ে নীচের উপত্যকায় নেমে গেছে। লম্বা একটা লেকের চারপাশে নারকেল আর সুপারি গাছের সারি দেখতে পেল ওরা, মাঝখানে নীলচে বেগুনি পানি। আরও দূরে সাদা চুনকাম করা কয়েকটা কুঁড়ে দেখা যাচ্ছে।

সামনে একজোড়া উজ্জ্বল হেডলাইট। দুটোই কাছে চলে আসছে দ্রুত। মাঝখানের ফাঁক সামান্য কম-বেশি হচ্ছে। দুটো মোটরসাইকেল। সরাসরি পোর্শকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে।

'মহাশয় কিছু বলছেন না কেন? সামনে ওগুলো কী?' জানতে চাইল মানস।

'বিপদ,' রানার গলায় কঠিন সুর।

রিয়ারভিউ মিররে আবার থাই আইবি-র হেলিকপ্টারের স্পটলাইট দেখতে পেল রানা। এই মুহূর্তে ঢাল বেয়ে উপরে উঠছে পোর্শ। সামনে, জোড়া মোটরসাইকেলের পিছনে, একই স্পিডে ছুটে আসছে একটা গাড়িও।

'ওস্তাদ যদি দয়া করে অনুমতি দেন,' বলে ড্যাশবোর্ডের বোতাম লক্ষ্য করে আঙুল তাক করল মানস।

'প্লিজ।'

পোর্শের ড্যাশবোর্ডে চৌকো স্ক্রিন বেরিয়ে এল, লম্বা-চওড়ায় পাঁচ ইঞ্চি, অন্ধকার গাড়ির ভিতরটা ভরিয়ে তুলল উজ্জ্বল আভায়। মাসুদ রানার ব্যবহারের জন্য লিউ ফুচুঙের উপহার দেয়া পোর্শ অ্যাকশনে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি এখন।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

এগারো

সামনের জোড়া মোটরসাইকেল থেকে শুরু হলো বিপজ্জনক গানফায়ার, অন্ধকারে রাতের গায়ে লাল ও সোনালি আলোর রেখা তৈরি করে ছুটে আসছে বুলেটগুলো। কিছু বুলেট পোর্শকে পাশ কাটিয়ে গেল, কিছু বুলেটপ্রুফ আবরণে লেগে ভোঁতা আওয়াজ তুলল, অথবা পিছলে চলে গেল আরেক দিকে।

'কী করতে হবে বলে দিন,' তাগাদা দিল মানস, ড্যাশে বেরিয়ে আসা কমপিউটার অপশনগুলোর উপর চোখ বুলাচ্ছে।

'অপেক্ষা,' বলল রানা।

'তথাস্তু,' বলে হাত দুটো বুকে ভাঁজ করে সিটে হেলান দিল মানস।

ওদের পিছন থেকে দ্রুত কাছে চলে আসছে হেলিকপ্টার, যদিও এখন পর্যন্ত ওটার স্পটলাইট পোর্শকে খুঁজে পায়নি। প্রকাণ্ড যান্ত্রিক ফড়িংও হঠাৎ গুলি চালাতে শুরু করল। তবে বিরতি নিয়ে, আন্দাজে গুলি করছে গানার।

সামনে ও পিছন, দু'দিক থেকে আক্রান্ত হলো ওরা। কপ্টারের গানার টার্গেট দেখতে পাচ্ছে না, বেশিরভাগ বুলেটই পোর্শের আশপাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। যা-ও বা দু'চারটে লাগছে, গাড়ির তাতে কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। রানার জানামতে গাড়িটাকে বুলেটপ্রুফ করতে চিন সরকারের খরচ পড়েছে দশ লক্ষ মার্কিন ডলার।

অবশেষে কপ্টারের স্পটলাইট পেয়ে গেল পোর্শকে। দূরত্ব কমিয়ে আনার ফাঁকে বিরতিহীন গুলি ছুঁড়তে শুরু করল গানার।

'পোর্ট এবং স্টারবোর্ড,' মানসকে নির্দেশ দিল রানা। 'শিল্ড।'

কমপিউটার কমান্ড-এর পাশে রুপালি রঙের চৌকো ঘরে চাপ দিল ভারতীয় এজেন্ট। পোর্শের কন্ট্রোল সামান্য কেঁপে উঠল, কারণ হুইলগুলোর উপর ফেনডার উঁচু হওয়ায় আর সাবমেশিন গান লম্বা হওয়ায় বাতাসের তীব্র ধাক্কা লেগেছে ওগুলোয়। ড্যাশে উদয় হলো চারটে ক্রস-হেয়ার।

সামনের মোটরসাইকেল দুটো কাছে চলে আসছে, সরাসরি নাক বরাবর পোর্শের দিকে তাক করা।

'ওস্তাদ!' একটা ঢোক গিলে তাগাদা দিল মানস, তারপর অদৃশ্য কারও উদ্দেশে বুকের কাছে হাতজোড় করল।

'ক্রস-হেয়ারে চোখ রাখুন,' নির্দেশ দিল রানা। 'ওখানে কিছু পেলে চাপ দিন ফায়ার-এ।'

'জেমস বন্ড,' বিড়বিড় করল মানস আপন মনে, ড্যাশ-এ আটকে রাখল দৃষ্টি। 'এটাই বোধহয় সবদিক থেকে ভাল, কী ঘটতে যাচ্ছে আমি তা দেখলামই না।'

জোড়া মোটরসাইকেল পরস্পরের কাছাকাছি রয়েছে, ছুটে আসছে একই গতিতে। ফায়ারিং বন্ধ করেছে ড্রাইভাররা, যে যার মেশিনের উপর প্রায় বুক ঠেকিয়ে ঝুঁকে আছে। তারার আলোয় ওদের মাথার সাদা হেলমেট চকচক করতে দেখল রানা।

ড্রাইভাররা চাইছে ভয় পেয়ে রাস্তা ছেড়ে সরে যাবে রানা– হয় খাদের নীচে লেকে পড়ে ডুবে যাবে গাড়ি, নয়তো পাহাড়-প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে বিস্ফোরিত হবে ফুয়েল ট্যাংক।

www.MurchOna.com

মুখোমুখি সংঘর্ষের এই পরিস্থিতিতে প্রথমে যে পক্ষ ইতস্তত করে, সাধারণত তারই পরাজয় ঘটে। এক মুহূর্তের সিদ্ধান্ত-হীনতাই এখানে সূত্র, প্রতিপক্ষ ওটার জন্যই অপেক্ষা করে। সে যদি একটু আভাস পায় যে প্রতিপক্ষ পজিশন ধরে রাখতে পারছে না, সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নেয় তার নিজের নার্ভ বেশি শক্ত। এরপর কেউ তাকে নড়াতে পারবে না, কারণ সে জানে, সে-ই জিতবে।

পোর্শকে এক লাইনে স্থির রাখল রানা। গাড়িটাকে ইতিমধ্যে চেনা হয়ে গেছে তার, ওটার শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখে।

সরু হাইওয়ের একশো গজ সামনে জোড়া মোটরসাইকেল।

ষাট গজ।

ডানদিকের মোটরসাইকেল নড়ে গেল, পরক্ষণেই আবার ফিরে এল আগের পজিশনে।

চল্লিশ গজ।

হাইওয়ের ঠিক মাঝখানে থাকছে রানা, পোর্শের উপর আস্থা রাখছে।

আর বিশ গজ।

চোখ তুলে তাকাল মানস। 'ওস্তাদ! আপ নে তো মার ডালা!' দ্রুত চোখ নামিয়ে আবার ড্যাশবোর্ডে তাকাল সে।

বামদিকের মোটরসাইকেল দৃঢ়ভঙ্গিতে নিজের পথে এখনও স্থির।

স্টিয়ারিং হুইল আঁকড়ে ধরল রানা।

ডানদিকের মোটরসাইকেলটা লাইন থেকে সরতে গিয়েও আবার ফিরে এল আগের জায়গায়। চিনতে পারল রানা– হোটেল ময়ূরীর পার্কিং গ্যারেজে যে দুই প্রকাণ্ডদেহী যমজকে ফাঁকি দিয়েছে ও, ওরাই চালাচ্ছে মোটরসাইকেল দুটো।

'ফায়ার!' শান্ত রানার কণ্ঠস্বর।

পোর্শের সাবমেশিন গান খেঁকিয়ে উঠল।

বামদিকের মোটরসাইকেল কাত হয়ে শুয়ে পড়ল রাস্তার উপর। গুলি খেয়েছে দ্বিতীয়জনও। পোর্শের ফ্রন্ট শিল্ডে আছড়ে পড়ল ওর দ্বিচক্রযান, চোখের পলকে লাফ দিয়ে উঠে গেল শূন্যে, রানা ও মানসের মাথার উপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে হারিয়ে গেল পিছনদিকে। কেঁপে উঠল পোর্শ, তারপর কাত হয়ে পড়ে থাকা মোটরসাইকেলটাকে অনায়াসে ডিঙিয়ে ছুটল নিজের পথে।

পোর্শের পিছনে, হাইওয়ের উপর, লাল ও কমলা আগুনের দুটো প্রকাণ্ড বল বিস্ফোরিত হলো। মোটরসাইকেল দুটো পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। ড্রাইভাররা মারা গেছে আগেই।

সামনের দৃশ্য দেখার পরও গতি কমাল না টিআইবি কার। একই গতিতে ছুটে আসছে। হেলিকপ্টার থেকে আবারও গুলি শুরু করল গানার।

গাড়ির মেঝেতে পা চেপে ধরল রানা। উপত্যকার শেষপ্রান্তে চলে আসছে ওরা। সামনের রাস্তা বাঁক নিয়ে পাহাড়ের কাঁধের আড়ালে হারিয়ে গেছে।

অকস্মাৎ থাই আইবি-র কারের চাকা পিছলাতে শুরু করল, রাস্তার উপর আড়াআড়ি হলো ওটা, পোর্শের সামনের পথে দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

পোর্শের উপর দিয়ে উড়ে গেল হেলিকপ্টার, গতি কমিয়ে এনে আইবি-র কারের উপর স্থির হলো, ওটাকে যেন পাহারা দিচ্ছে।

হুড়মুড় করে চারজন লোক নামল গাড়িটা থেকে, প্রত্যেকের হাতে একে-ফোরটিসেভেন, রাস্তার দু'পাশে পজিশন নিচ্ছে।

অস্ফুট কণ্ঠে আপন মনে প্রশ্ন করল রানা, 'ফাঁকে কি যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যাবে?'

'জানি না।'

'দু'পাশে রাস্তা মোটেও চওড়া নয়।'

ছুটে চলেছে পোর্শ। রাস্তা বরাবর পজিশন নিয়ে হাতের অস্ত্র

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

তাক করল চার থাই আইবি-র এজেন্ট।

'ওদের টার্গেট,' জিজ্ঞেস করল রানা, 'আমাদের টায়ার?'

'সম্ভবত।'

উপত্যকার মাথা থেকে উড়ে এল আরেকটা হেলিকপ্টার, ওটার স্পটলাইট দ্বিতীয় স্পটলাইটের সঙ্গে যোগ দিয়ে চোখ ধাঁধানো আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিচ্ছে পোর্শকে।

'একটা অসম যুদ্ধ হতে যাচ্ছে,' মন্তব্য করল মানস, তারপর বলল, 'আপনি বললে আমি হাল ছেড়ে দিতে রাজি আছি।'

'টায়ারগুলোকে বাঁচানোর জন্যে বিশেষ কিছু করার নেই,' বলল রানা, পোর্শের স্পিড কমিয়ে আনছে। মানসের কথা বোধহয় শুনতে পায়নি। 'তবে আমি চাই না ওদের একটা কপ্টার আমাদের মাথার ওপর ল্যান্ড করুক। ভাল করে দেখুন তো, আর কারও আহত হবার ভয় আছে কি না।'

দুজনেই ওরা উপত্যকার চারদিকটা চোখ বুলিয়ে দেখে নিল। না, আশপাশে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। রানার সামনে কোনও বিকল্প নেই, মিশন কমপ্লিট করতে হলে থাই এজেন্টদেরকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোতে হবে ওকে। অর্থাৎ ওদেরকে নিশ্চিহ্ন না করে উপায় নেই ওর।

'এস্কেপ?' ফিসফিস করল মানস।

'এস্কেপ,' বলল রানা।

চৌকো ঘরে চাপ দিল ভারতীয় এজেন্ট। ড্যাশ থেকে নতুন আলো বিচ্ছুরিত হলো। রাস্তা কতটুকু ঢালু, রাস্তার পাশে ঘাসজমির পরিমাণ, বাতাসের তাপমাত্রা ও গতিবেগ, আশপাশের এলাকার বিভিন্ন জিনিস থেকে বেরিয়ে আসা উত্তাপ ইত্যাদির রিডিং দেখা যাচ্ছে আলোকিত নতুন ডায়ালগুলোয়। আরও কিছু রিডিং চলে এল স্ক্রিনে।

– হেলিকপ্টার একঃ দুজন আরোহী।

– হেলিকপ্টার দুইঃ একজন আরোহী।

– অটোমোবাইলঃ খালি।

– পুবদিকে দুজন লোকঃ একে-ফোরটিসেভেন।

– পশ্চিমদিকে দুজন লোকঃ একে-ফোরটিসেভেন।

– নিশ্চিত করোঃ হিসাব মেলে?

মিটমিট করা চৌকো দাগে চাপ দিল মানস।

স্ক্রিনে প্রশ্ন ফুটলঃ **চাও ধ্বংস করি?**

রানার দিকে তাকাল মানস। চোখ-মুখ থমথম করছে, মাথা ঝাঁকাল রানা।

চৌকো দাগে চাপ দিল মানস।

স্ক্রিনে ফুটলঃ **গাড়ির স্পিড হওয়া চাই ঘণ্টায় একশো পনের কিলোমিটার।**

'কাজ হবে, ওস্তাদ?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল মানস।

'আমিও দেখার অপেক্ষায় আছি,' হিসহিস করে বলল রানা। গাড়ির স্পিড আবার বাড়াল ও, ঘণ্টায় একশো পনেরো কিলোমিটারে তুলে আনল।

ঝাপসা উপত্যকা পিছিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার ধারে হাঁটু গেড়ে থাকা থাই আইবি-র এজেন্টরা লক্ষ্যস্থির করে গুলি চালাচ্ছে।

স্পটলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত পোর্শের গায়ে আঘাত করছে বুলেটগুলো। হঠাৎ সরলরেখা ত্যাগ করল ওটা।

রাস্তার মাঝখানটা ব্লক করে রেখেছে থাই আইবি-র কার। ওটার একপাশে নীলচে বেগুনি লেকের বিস্তার। আরেকপাশে নিচু, সমতল জলাভূমি। পোর্শকে ওই জলার দিকে তাক করল রানা।

দুজন থাই আইবি-র এজেন্ট লাফ দিয়ে সরে গেল।

কমপিউটারের নির্দেশে পোর্শ থেকে শুরু হলো গুলিবর্ষণ। যেন বুলেট নয়, হোসপাইপ থেকে বেরুনো পানির অবিচ্ছিন্ন ধারা অপর দুই থাই আইবি-র এজেন্টকে ধাক্কা দিয়ে তুলে ফেলল শূন্যে, পরিণত করল উড়ন্ত মিসাইলে।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

যে দুজন পালাচ্ছিল, পিঠে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট লাগায় অকস্মাৎ বেড়ে গেল তাদের গতি, রাস্তার কিনারা থেকে নীচের জলাভূমিতে ছিটকে পড়ল তারা।

হঠাৎ আবার গর্জে উঠল দুই হেলিকপ্টারের সাবমেশিন গান। দুটোর একটা আইবি কারের মাথার পাশে শূন্যে স্থির হয়ে ছিল, পোর্শের পথ আটকাবার জন্য ধীরে ধীরে নীচে নামতে শুরু করল সেটা।

গাড়ি আরেকটু ঘোরাল রানা, নামতে শুরু করা কপ্টারের ল্যান্ডিং প্রপ দুটোর মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে চায়। কপ্টারের স্কিডগুলো আঁচড় কাটল পোর্শের ছাতে, যেন কালো ব্ল্যাকবোর্ডে নখ ঘষছে কেউ।

'মাইরি বলছি, কী ড্রাইভিং!' মানস বিস্ময়ে অভিভূত।

পোর্শের কমপিউটার পিছন দিকে এক ঝাঁক বুলেট ছুঁড়ল, আইবি কারের গ্যাস ট্যাঙ্ককে টার্গেট করে। কমলা শিখা বিস্ফোরিত হলো, বেশ কিছুদূর আলোকিত হয়ে উঠল উপত্যকা, নগ্ন ও কংকালসার লাগল দূরের গাছগুলোকে।

সামনে আর কোনও বাধা নেই, বাড়তি গতি নিয়ে ছুটে চলল পোর্শ। উপত্যকার শেষ মাথা কাছে চলে আসছে, শুরু হতে যাচ্ছে দোই ইনথানন পাহাড়শ্রেণী।

রানার দিকে তাকাল মানস। তার ভ্রূতে ঘাম জমে আছে। সারা মুখে স্বস্তির হাসি।

'এখনও আমরা নিরাপদ নই,' তাকে সাবধান করল রানা।

ওদের পিছু নিয়ে ছুটে আসছে হেলিকপ্টারের ঘুরন্ত ব্লেড।

– শেষ?

বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাইল কমপিউটার।

রুপালি ঘরে আঙুলের চাপ দিল মানস, ওটায় লেখা রয়েছে– **না**।

'ঠিক আছে তো, ওস্তাদ?' জিজ্ঞেস করল মানস।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' গম্ভীর সুরে বলল রানা।

একটা কপ্টার দ্রুতগতি পোর্শের পাশে চলে এসেছে, ওটার সঙ্গে একই স্পিডে ছুটছে, ওদের মাথা থেকে ষাট কি সত্তর ফুট উঁচুতে। দ্বিতীয় কপ্টারটা পজিশন নিয়েছে সরাসরি পোর্শের মাথার উপর। কমপিউটার তার স্ক্রিনে দুটোরই পজিশন জানাল, জানাল পোর্শকে লক্ষ্য করে মিনিটে কটা করে বুলেট ছুঁড়ছে ওগুলোর সাবমেশিন গান।

'এ ভারি অন্যায়,' হঠাৎ গম্ভীর সুরে বলল মানস। 'একেবারে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছে ওরা!'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওদের বুলেট কি শেষ হতে নেই!' প্রতিবাদ জানাল মানস। 'বুলেটপ্রুফ না হলে গাড়িসহ আমরা তো এতক্ষণে ছাতু হয়ে যেতাম, মিস্টার রানা!'

'হ্যাঁ, একটু বেশি সময় লাগছে। সঙ্গে করে প্রচুর অ্যামুনিশন এনেছে ওরা।'

'সে কথাই তো বলছি, সার।'

হঠাৎ করে একসেলেরেটর থেকে পা তুলে নিল রানা।

'কী ব্যাপার?' সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল মানস।

'একটা আইডিয়া,' সংক্ষেপে বলল রানা।

নিজের সিটে নড়েচড়ে বসল ভারতীয় এজেন্ট, উত্তেজনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ-মুখ।

গাড়ির ব্রেকে চাপ দিল রানা।

– নতুন নির্দেশনা?

অপেক্ষা লেখা চৌকো দাগটা স্পর্শ করল রানা, হাইওয়ের উপর দাঁড় করিয়ে ফেলল পোর্শকে।

'আপনি আমাকে নার্ভাস করে তুলছেন,' বলল মানস, জানালা দিয়ে দেখতে পেল কপ্টার দুটো ল্যান্ড করছে–একটা ওদের সামনে, আরেকটা ওদের পিছনে।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

'আমাদের সমস্যা হলো,' ব্যাখ্যা করছে রানা, 'শূন্যে থাকা কোনও জিনিসকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে পারে না পোর্শ। তা ছাড়া, স্পিডও কপ্টারের চেয়ে বেশি নয়। আমি ওটার কাজ সহজ করে দিতে চাইছি।'

'আপনার চিনা বন্ধুকে জানালে তিনি হয়তো এই ত্রুটি ভবিষ্যতে মেরামত করে দেবেন,' মন্তব্য করল মানস।

'কী জানি, তবে এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেলে পোর্শটা তাকে আমরা ফিরিয়ে দেব,' জানাল রানা।

ব্রাউন সুট পরা তিনজন আই.বি এজেন্ট কপ্টার দুটো থেকে বেরিয়ে এল। ঘুরন্ত রোটর ব্লেডের ভয়ে মাথা নিচু করে আছে ওরা, ছুটে আসছে পোর্শের দিকে, হাতে একে-ফোরটিসেভেন।

লাউড হেইলারের সামনে মুখ নিয়ে থাই ভাষায় নির্দেশ দিল রানা, 'আমাদের পথ ছাড়ো!'

ওর গলার আওয়াজ কপ্টারের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল।

বৃথা চেষ্টা। লোকগুলো কাঁধে অস্ত্র তুলে লক্ষ্যস্থির করছে দেখে আবার **এস্কেপ** লেখা চৌকো দাগটা স্পর্শ করল রানা। ক্লিক করে আওয়াজ বেরুল কমপিউটার থেকে, তারপর মুহূর্তের জন্য মৃদু গুঞ্জন ছড়াল।

অবিরাম গুলি করছে ওরা। সামনের কাঁচে লেগে ছিটকে দিক পালটাচ্ছে বুলেটগুলো।

পোর্শ স্থির হয়ে থাকায় কমপিউটারচালিত মেশিনগানের নড়ে ওঠাটা অনুভব করল রানা ও মানস। ওটার বিস্ফোরণ ভারী গাড়িটাকে খুব সামান্যই দোলা দিল।

মেশিনগানের ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছিন্নভিন্ন করে দিল থাই আইবি-র এজেন্টদের। শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল একজনের মাথা। রক্তাক্ত মাংস ছড়িয়ে পড়ল হাইওয়ের উপর। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে কাজ শেষ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, সামনের কপ্টারের পাশ দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোচ্ছে। রোটরের ব্লেডগুলো এখনও দ্রুতবেগে ঘুরছে, যেন টেকঅফ করবার জন্য তৈরি।

আবার নড়ে উঠল পোর্শের অস্ত্র, এবার টার্গেট করেছে যান্ত্রিক ফড়িং দুটোর গ্যাস ট্যাঙ্ক। ওদের পিছনে বিস্ফোরিত হলো কপ্টার দুটো।

আবার পাহাড়শ্রেণীর দিকে গাড়ি ছোটাল রানা, পিছনের নির্জন উপত্যকায় রেখে যাচ্ছে পাঁচটা ছোট-বড় অগ্নিকুণ্ড।

'এই যে আমি বেঁচে আছি, সেজন্যে প্রথমেই আমি আমার জননীর তরফ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি, মিস্টার রানা। বিশ্বাস করুন, মহাশয়, সব কথা শোনার পর আমার জন্মদাত্রী আপনাকে আপন সন্তানের মত আশীর্বাদ করবেন।'

মানসের দিকে তাকাতে হকচকিয়ে গেল রানা। কোনও কারণ ছাড়াই তার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠেছে।

বারো

দোই ইনথাননকে পাশ কাটিয়ে আরও পশ্চিমে চলে এল ওরা। ইতিমধ্যে ফরসা হয়ে গেছে আকাশ।

হাট খোয়াই শহরে ঢুকল না পোর্শ, ওটাকে বাম পাশে রেখে ছুটে চলল সরকারী বেস ক্যাম্পের দিকে। কাছাকাছি লেক ও নদীতে সারা রাত মাছ ধরেছে জেলেরা, এখন মাথায় ঝাঁকা নিয়ে শহরের বাজারে চলেছে তারা।

মন্দিরটা পড়ল রাস্তা যেখানে বাঁক নিতে শুরু করেছে, ছোট একটা পাহাড়ের কাঁধের উপর। রাস্তার এই অংশ থেকে প্রাচীন

www.MurchOna.com

বটগাছের আড়ালে মন্দিরের শুধু পিছনদিকটাই দেখা যাচ্ছে, সেখানে না আছে কোনও দরজা-জানালা, না আছে উপরে ওঠার কোনও পথ।

'এখানে কালিমন্দির?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল মানস। কীভাবে বুঝল ওটা কালিমন্দির সে-ই জানে। হাত দুটো এক করে কপালে ঠেকাল। 'মাফ করবেন, মিস্টার রানা,' আবেদনের সুরে বলল সে, 'একটু থামবেন, প্লিজ? আমি ধর্মভীরু মানুষ। পথে মন্দির পড়লে দেবীদর্শন না করা আর নিজের পায়ে কুড়ুল মারা, একই কথা। অন্তত আমি তাই বিশ্বাস করি। কিছু একটা অমঙ্গল হবেই হবে।'

'অত যদি অমঙ্গলের ভয়,' মৃদু হেসে বলল রানা, পোর্শকে রাস্তার ধারে দাঁড় করাল। 'যান, দেবীদর্শন করে আসুন। কিন্তু এখানে যে থামতে বললেন, মন্দিরে উঠবেন কীভাবে? তারচেয়ে বাঁকটা ঘুরি, মন্দিরের সামনের দিকে নিশ্চয় সিঁড়ি আছে...'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার রানা।' ড্যাশবোর্ড থেকে নিজের বিনকিউলারটা তুলে গলায় ঝোলাল মানস, দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছে। 'ঢালটা তেমন খাড়া নয়, উঠতে আমার কোনও অসুবিধে হবে না। এই যাব আর আসব।'

আর কিছু না বলে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

ঢাল বেয়ে পাথুরে টিলার উপর ওঠার সময় চিন্তা করছে মানস। নতুন দিল্লির দেওয়া তথ্য যদি নির্ভুল হয়, এখন থেকে যে-কোনও মুহূর্তে ওদের উপর হামলা চালাবে পাকিস্তানীরা, অথচ এখনও সেটা ঠেকাবার কোনও বুদ্ধি বের করতে পারেনি সে।

দেবীদর্শনের ছুতোয় পাহাড়টার উঁচু কাঁধের উপর চড়ে চারদিকে একবার চোখ বুলাতে চাইছে, আশা: পাকিস্তানী অ্যাটাক টিমকে দেখতে পাবে।

তবে এমনিতেও একবার ওকে উপরে উঠতে হত, ভোলার খাবারের কৌটাগুলো রাখা আছে ওখানেই কোথাও।

যতই উপরে উঠছে মানস, ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে ততই সতর্ক হওয়ার তাগিদ দিচ্ছে। চূড়ার কাছাকাছি, দেড়শো ফুটের মত উঠে এসে ঘাড় ফিরিয়ে নীচে একবার তাকাল ও। গাড়ির পিছনটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে শুধু। একটু পর তাও আর দেখা গেল না।

খুবই প্রাচীন একটা মন্দির, অস্বাভাবিক উঁচুও, কালের আঁচড়ে শ্যাওলা ধরা দেয়াল আঁকাবাঁকা ফাটলের সমষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মন্দিরকে ঘিরে সরু একটা পথ গাছপালার ভিতর দিয়ে সামনের দিকে চলে গেছে। অত্যন্ত সন্তর্পণে এগোচ্ছে মানস।

মানসের কাছে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র নেই। শুধু ছোট একটা ছুরি আছে, তবে ওর থ্রো খুব ভাল। আনআর্মড কমব্যাট শুরু হলে জুজিৎসুর প্যাঁচ কষে, জানে শুধু গায়ের জোরে পেরে উঠবে না। ওর কাছে আরও একটা জিনিস আছে, বদ্ধ কোনও জায়গায় ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। খোলা জায়গায় ভাল ফল পেতে হলে দেখে নিতে হবে, বাতাসটা শত্রুর দিকে বইছে কি না; নইলে মরতে হবে নিজেকেই।

ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে বাঁকা হয়ে এগিয়েছে সরু পথটা। মন্দিরের ডান পাশে একটা ভাঙা জানালা দেখল মানস। নিঃশব্দ পায়ে সেটার নীচে পৌঁছাল, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করছে।

দৃশ্যটা দেখামাত্র বুকটা ধক করে উঠল মানসের। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল বুড়ো এক থাইয়ের। ভাঙাচোরা একটা ঘর, হাত-পা বেঁধে মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছে লোকটাকে, মুখের ভিতর কাপড় গোঁজা।

চোখাচোখি হতে শরীরটাকে মোচড়াল সে, কিছু বলতেও চেষ্টা করল, তবে কোনও শব্দ বেরুল না।

নাক বরাবর সামনে কবাটবিহীন আরেকটা জানালা দেখল মানস, সেটা দিয়ে খোলা বারান্দা দেখা যাচ্ছে। চোখ ফিরিয়ে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

নেবে, এই সময় বারান্দা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখল নীল সুট পরা এক লোককে, হাতের কারবাইনটা বুকের কাছে তির্যক ভঙ্গিতে ধরা।

লোকটাকে দেখে পাকিস্তানী বলে মনে হলো মানসের, অন্ত ত চিনা কিংবা থাই নয়।

ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে জানালার কাছ থেকে সরে এল মানস। দ্রুত কাজ করছে ওর মাথা। পাকিস্তানীরা মন্দির দখল করেছে কীজন্যে? শুধু দখল করেনি, পাহারাও বসিয়েছে। কেন?

এই রাস্তা ধরে দোই ইনথানন পাহাড়ে পৌঁছানো যায়। পিসিআই এজেন্টরা জানে ওকে নিয়ে ওখানেই যাচ্ছে মাসুদ রানা। মন্দিরটা রাস্তার ধারে, অ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করতে হলে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না।

সংখ্যায় ওরা কজন, একা কতটুকু কী করতে পারবে, ভাবতে ভাবতে বাঁকা পথটা ধরে সাবধানে এগোল মানস। সামনে মন্দিরের আরেকটা কোণ, খুব সাবধানে উঁকি দিয়ে তাকাল ও।

মানসের নাক সমান উঁচুতে বারান্দার মেঝে। মেঝে ধরে ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে একজোড়া জুতো পরা পা। পা বেয়ে উপরে উঠল ওর দৃষ্টি। নীল সুট পরা সে-ই প্রহরী লোকটা টহল দিচ্ছে।

বারান্দার শেষ মাথায় সরু সিঁড়ি। সিঁড়ির কাছাকাছি পৌঁছে ঘুরতে যাচ্ছে লোকটা, কোণ থেকে দ্রুত মাথাটা টেনে নিল মানস। তারপর বসে পড়ল।

বারান্দার মেঝে ধরে এগিয়ে আসছে জুতোর আওয়াজ। মানসের হাতে বেরিয়ে এল ছুরিটা। কীভাবে কী করা যায় ভাবছে ও। বিদেশি লোকেরা বিনা কারণে দখল করেনি মন্দিরটা। মেঝের শেষপ্রান্তে পৌঁছে আবার ঘুরল লোকটা, সিঁড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছে।

এবার না দাঁড়িয়ে ক্রল করে সামনে এগোল মানস। দেখা দরকার মন্দিরের ঠিক সামনে কী আছে।

উঁচু বারান্দা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান পৌঁছে নাক বরাবর সামনে ও নীচে তাকাতে রীতিমত চমকে উঠল মানস। কয়েকটা কাঁটাঝোপের ফাঁকে, মাত্র বিশ হাত দূরে দেখা যাচ্ছে রাস্তাটা, ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে এসেছে পাহাড়ের কাঁধে, তারপর আবার ঢাল বেয়ে নেমে গেছে।

দ্রুত কাজ করছে মানসের মাথা। হিসাব মেলাবার চেষ্টা করছে ও। দোতলায় অ্যামবুশ পাতা হয়েছে!

সিধে হলো মানস। কাঁটাঝোপের আড়াল নিয়ে বারান্দায় ওঠার ধাপগুলোর দিকে এগোল, দেখতে পাচ্ছে সিঁড়ির কাছে পৌঁছে যাচ্ছে গার্ড।

কাঁটাঝোপের আড়াল থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল মানস, ধাপ কটা বেয়ে বারান্দায় উঠছে। গার্ডও ঘোরা শেষ করে ওর দিকে তাকাল।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল লোকটা। দেখল অচেনা এক লোক তাকে লক্ষ্য করে কী যেন ছুঁড়ছে। মৃদু একটা ঝাঁকি খেল সে। আরও বড় হলো তার হাঁ। চোখ নামিয়ে দেখল রুপালি হাতলটা কেবল বেরিয়ে আছে বুকের বাম দিকে, ফলার সবটুকু ভিতরে গাঁথা।

হৃৎপিণ্ড চিরে যাওয়ায় ঢলে পড়ার আগে টুঁ-শব্দ করতে পারল না লোকটা। ছুটে এসে এক হাতে তার পতন ঠেকাল মানস, আরেক হাতে ধরে ফেলল কারবাইনটা।

লাশ মেঝেতে নামিয়ে রেখে নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে মানস। রক্ত মুছে ছুরিটা রেখে দিয়েছে আগের জায়গায়, ওর হাতে এখন কারবাইন।

সিঁড়ির মাথায় একটা দরজা, তবে তাতে কোনও কবাট নেই। দরজার কাছাকাছি পৌঁছে ফিসফাস আওয়াজ শুনতে পেল মানস, চাপা গলায় কারা যেন কথা বলছে। ভাষাটা যে পাঞ্জাবী,

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

একজন বলল, 'মেসেজে বলা হয়েছে আর পনেরো মিনিট পর মন্দিরকে পাশ কাটাবে পোর্শ। তার জায়গায় বিশ মিনিট পার হতে চলেছে–কোথায় মাসুদ রানা আর তার মালাউন বাঁদরটা?'

মানসের গা জ্বালা করছে। তবে সেটাকে পাত্তা দিল না। কথা শুনে বোঝা গেল, এরা পিসিআই এজেন্ট।

সিঁড়ির ধাপের উপর শুয়ে পড়ল মানস, মাথাটা পৌঁছাল চৌকাঠের ঠিক নীচে। তারপর ধীরে ধীরে উঁচু করল একটা চোখ।

কামরার ভিতর আধ হাত জিভ বের করে চারজন নীল সুট পরা বিধর্মীর দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে রয়েছে দেবী ভয়ঙ্করী–হিন্দুদের মা কালীর মূর্তি।

দরজার দিকে পিছন ফিরে লম্বা-চওড়া লোকগুলো দুটো জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দুজনের হাতে দুটো গ্রেনেড লঞ্চার, বাকি দুজনের কাঁধে দুটো বাজুকা। জানালাগুলোর পাশে দেয়ালে ঠেস দেওয়া রয়েছে চারটে কারবাইন।

'মালাউন মেরে সওয়াব হাসিল করব, তা বুঝি আর হলো না,' তাদের একজন বলল। 'অ্যামবুশ টের পেয়ে শালারা বোধহয় ভেগেছে!'

চুইংগামের একটা প্যাকেট বের করল মানস, তবে প্যাকেট থেকে যেটা বেরুল সেটা চুইংগাম নয়। জিনিসটা দেখতে খুদে ক্যাপসুলের মত, ভিতরে নার্ভ গ্যাস ভরা। আঙুলের টোকা দিয়ে সেটাকে কামরার মাঝখানে ফেলল ও।

ত্রিশ সেকেন্ড পর পুট্ করে মৃদু একটা শব্দ হলো। ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল চারজনই। অদৃশ্য গ্যাস দেখতে পায়নি তারা, শুধু দেখল দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে এক লোক অমায়িক হাসি হাসছে। 'সেলাম, হুজুর! নমস্তে! কই, আমরা তো পালাইনি!' বলল সে।

অস্ত্র ঘুরিয়ে মানসের দিকে তাক করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু হঠাৎ সারা শরীর অবশ হয়ে যাওয়ায় ঢলে পড়ল যে যার জায়গায়। আঙুলের ছাপ মুছে কারবাইনটা ওখানেই ফেলে রাখল মানস।

গোটা মন্দির তন্নতন্ন করে খুঁজেও খাবারের কোনও কৌটা কোথাও খুঁজে পেল না ও। কিন্তু দিল্লি তাকে ভুল তথ্য দেবে, এ-ও তো হতে পারে না। মাথা ঠাণ্ডা করে এক মুহূর্ত চিন্তা করল ও। তারপর একটা মই দেখতে পেয়ে উঠে পড়ল ফল্স্ সিলিঙে।

একটা চামড়ার ব্যাগ দেখে হাসি ফুটল ওর মুখে। ব্যাগ খুলে টিনের কৌটাগুলো ভরে নিল পকেটে।

'মা কালীর আশীর্বাদ নিয়ে এলাম,' গাড়িতে ফিরে এসে বলল মানস, অমায়িক হাসিটা এখনও লেগে রয়েছে ওর মুখে।

'সন্দেহ হচ্ছে আরও কিছু করে এসেছেন কি না,' গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বলল রানা, মানসের চোখের চকচকে ভাবটাকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছে না ও। একজন খুনির চোখেই যেন মানায় ওটা।

'আপানি গুণী ব্যক্তি, জানি আন্দাজ করে অনেক কিছুই ধরে ফেলবেন,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল মানস। 'তবে আশা করি এ-ও বুঝবেন যে আমি আসলে পুতুল, যেমনি নাচায় তেমনি নাচি। একটা রাখুন, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।'

রানার হাতে চুইংগামের একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিল মানস, মন্দিরে যেটা ব্যবহার করেছে সেটার চেয়ে আকারে একটু বড়।

'কী এটা?'

'লেথাল নার্ভ গ্যাস। দেখা যায় না,' বলল মানস। 'বাতাস কোন্‌দিকে বইছে খেয়াল করে ফাটালে নিজে মারা পড়বেন না। আরও একটা জিনিস দিই,' বলে পকেটে হাত ভরল ও। 'এই নিন।' টিনের কয়েকটা কৌটা বের করে রানার কোলের উপর রাখল।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

'আর এগুলো?'

'আমার ভোলার খাবার,' বলল মানস। 'আপনার হাত দিয়ে খাওয়াতে চাই, তা হলে আমার মত সে-ও আপনার ভক্ত হয়ে উঠবে।'

খানিক পর রানা খেয়াল করল, চকচকে ভাবটা মানসের চোখ থেকে মুছে গেছে। এইবার ভোলার খাবার আনতে গিয়ে মন্দিরে কী ঘটেছে খুলে বলল মানস রানাকে।

পোর্শটা লুকিয়ে রাখার জন্য পরিত্যক্ত একটা গোলাঘর পছন্দ হলো রানার, সরু একটা গিরিখাদের মুখেই সেটা। গ্রামের চারদিকে আরও কিছু খালি বাড়ি-ঘর দেখতে পেল ওরা, আগুনে পুড়ে গেছে।

প্রতিবেশী দেশের দুই এজেন্ট ঝোপ-ঝাড় ভেঙে এনে যতটা পারা যায় পোর্শকে ঢেকে ফেলল। এখানে কাপড়চোপড় পাল্টাল ওরা, সাপ্লাই ছাড়াও যে যার প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ভরল নিজেদের ব্যাকপ্যাকে। তারপর দুর্গম ট্রেইল ধরে গিরিপথের ভিতর দিয়ে এগোল।

সরকারী বেস ক্যাম্প থেকে জায়গাটা বেশি দূরে নয়। এলাকাটা রানার পরিচিত, তাই সামনে থাকল ও।

'এদিকটা ভারি নির্জন,' মন্তব্য করল মানস। 'কী শান্তি!'

'হ্যাঁ, বিরাট রিলিফ,' একমত হলো রানা, মানসের মত সে-ও ভাগ্যগুণে বেঁচে যাওয়ার ব্যাপারটা ভুলতে পারছে না।

'কিছু মানুষ কত বোকা হয়, তাই না?' তিক্ত হাসি ফুটল মানসের ঠোঁটে। 'কী রকম অবলীলায় অন্যায়-অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, তারপর মশা-মাছির মত মারা যায়।'

'ওরা কিন্তু আমাকে এখন আর জ্যান্ত ধরার চেষ্টা করবে না,' বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল মানস। 'তার মানে কি ডক্টর নাদিরা গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য দিয়ে ফেলেছেন ওদেরকে?'

'তা দেবেন বলে বিশ্বাস করি না। অত্যন্ত শক্ত মানুষ উনি।' একটা আশঙ্কার কথা ভেবে শিউরে উঠল রানা। সায়ানাইড ক্যাপসুল আছে ডক্টর নাদিরার মাড়ীতে। পরিস্থিতি সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হলে সেটা না তিনি খেয়ে ফেলেন!

বারো শো ফুট ওঠার পর প্রথম বসতিটা দেখতে পেল ওরা। রহস্যময় আগুন লেগে যে-সব ঘর-বাড়ি পুড়ে গিয়েছিল তার কোনও চিহ্ন নেই কোথাও, নতুন করে আবার সব বানিয়ে নিয়েছে আদিবাসীরা।

দ্বিতীয় বসতিটা আঠারোশো ফুট উপরে, আকারে বেশ বড়, তবে এটায় আগুন লাগেনি।

আরও পাঁচশো ফুট উঠল ওরা। এটা আদিবাসীদের তিন নম্বর বসতি। বাড়ি-ঘরের সংখ্যা দুশোর কম নয়, সবই আবার নতুন করে তৈরি করা।

বড়সড় গোলাঘরটা দেখে উত্তরার কথা মনে পড়ে গেল রানার। এখানেই তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল মেয়েটির। ওই গোলাঘরেই একটা রাত কাটিয়েছে তারা।

এত সকালে পাখিদের ডাকাডাকি আর ছুটোছুটি খুব স্বাভাবিক, অথচ গাছের সব ডাল একেবারে খালি, একটা পাখিও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। তারপর মনে পড়ল রানার–উত্তরা ওকে বলেছে, আবারও আগুন লেগেছে পাহাড়ের কোথাও কোথাও।

দোই ইনথাননের পাঁচ হাজার ফুটে উঠতে আরও দু'ঘণ্টা লেগে গেল ওদের।

একসময় দেখা গেল ওদের সামনে ট্রেইলের আর কোনও অস্তিত্বই নেই। জায়গাটা চিনতে পারল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার আগেই জানে ডানদিকে পাহাড়প্রাচীরের গায়ে একটা ফাঁক আছে। কাঁটা-ঝোপ টপকে সেদিকে এগোল ও, পিছু নিয়ে মানসও।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

পঁচিশ গজ এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। সামনে ফাঁকা জায়গা, ঝপ্ করে নেমে গেছে পাহাড়ের গা।

বিনকিউলার অ্যাডজাস্ট করল রানা। পাহাড় ঘেরা বনভূমির মাঝখানে প্রাচীন সেই বিশাল দুর্গে চোখ আটকে গেল। থাই টং-এর চিফ জিকো তানাই-এর আস্তানা ওটা। নদীর দিকে মুখ করা প্রাচীন দুর্গটা এখান থেকে অনেক দূরে।

কী কারণে বলা মুশকিল দুর্গটাকে আজ সেভাবে পাহারা দেওয়া হচ্ছে না। বিরাট ওই ফটকের সামনে দশ-বারোজন চিনাকে কারবাইন হাতে পাহারা দিতে দেখেছে রানা। আজ সেখানে মাত্র দুজন লোককে অলসভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে।

বহুদূরে পিং নদী দেখতে পেল রানা। পাঁচশো মাইল দূরে, রাজধানী ব্যাংকক হয়ে সাগরে গিয়ে মিশেছে ওই নদী।

বিনকিউলারটা মানসের হাতে ধরিয়ে দিল ও।

'কোথায় রানওয়ে?' একটু পরেই জানতে চাইল মানস। 'রানওয়ে না থাকলে প্লেন আসবে কোত্থেকে?'

উত্তরা বলেছে বটে প্লেনটা দুর্গ থেকে আবার বের করা হয়েছে, কিন্তু রানাও সেটাকে দেখতে পাচ্ছে না। তবে কিছু গাছপালার উপর চোখ পড়েছে ওর। সেদিকে মানসের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'ওদিকটা ভাল করে দেখে বলুন কী মনে হচ্ছে।'

'সাজানো গোছানো কয়েক সারি গাছ, যেন খুব যত্ন নেয়া হয়, বুঝলেন না,' বলল মানস।

'হ্যাঁ। পরিচ্ছন্ন, নিখুঁত কয়েকটা সারি। চারদিকের বাকি গাছপালার মধ্যে এই শৃংখলা দেখা যাচ্ছে না।'

'কেন? ও, আচ্ছা, বুঝেছি!' হেসে উঠল মানস। 'ওগুলোর ভেতরে আড়াল করা আছে রানওয়েটা, বুঝলেন না! ওগুলো হয় কৃত্রিম গাছ, না হয় কোথাও থেকে কেটে এনে বসানো হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, তারপর বলল, 'রানওয়েই যেখানে দেখা যাচ্ছে না, প্লেনটাকে সেখানে দেখতে না পাওয়ারই তো কথা।'

'বুঝেছি, দেখতে হলে আমাদেরকে ঢাল বেয়ে ওই উপত্যকায় নামতে হবে।'

'হ্যাঁ।'

ঠিক এই জায়গায় পাহাড়ের গা এত বেশি খাড়া যে দক্ষ পর্বতারোহীর অভিজ্ঞতা আর প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ছাড়া নীচে নামা কারও পক্ষে সম্ভব নয়, তাই ট্রেইল ধরে প্রথমে এক হাজার ফুট পিছিয়ে এল ওরা, তারপর ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল।

ঘুরপথ ধরেছে রানা, তির্যক একটা রেখা ধরে নামছে, ফলে এখন আর পিং নদী বা দুর্গ দেখতে পাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে চারশো ফুট নীচে নেমে এসেছে ওরা। ঢাল ধরে আরও আড়াই হাজার ফুট নামবার পর নীচের দৃশ্য দেখে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে হলো ওদেরকে।

আবার নদী ও দুর্গ দেখতে পাচ্ছে রানা। ওদের কাছ থেকে এখনও দু'হাজার ফুট নীচে ওগুলো। শুধু নদী ও দুর্গই নয়, এখন শুকিয়ে বাদামী হয়ে ওঠা চার সারি গাছের মাঝখানে হ্যাঙ্গার সহ রানওয়েটাও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে চাকে ঢিল খাওয়া মৌমাছির মত বহু লোকের ব্যস্ততা।

রানা যেটাকে পুড়িয়ে দিয়েছিল ঠিক সেই জায়গাতেই নতুন আরেকটা হ্যাঙ্গার তৈরি করা হয়েছে। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রহস্যময় সেই জেট প্লেন।

প্লেনটাকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে সৈন্যরা।

প্লেনটার রঙ ধূসর সবুজ। গায়ে বড় বড় হরফে লেখা : **দুরন্ত ঈগল, বাংলাদেশ এয়ারফোর্স।** এয়ারফোর্সের লোগোটাও চেনা যাচ্ছে পরিষ্কার।

জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে দুরন্ত ঈগল যদি না-ই খোয়া গিয়ে থাকে, ওটা তা হলে কী?

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

তবে প্রশ্নটা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই, কারণ এখনই আড়ালে সরে যেতে হবে, নইলে কারও চোখে পড়ে যেতে পারে যে-কোনও সময়। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা হ্যাঙ্গারের এক ধারে ইউনিফর্ম পরা থাই সৈন্যদেরকে টহল দিতে দেখতে পাচ্ছে রানা। তাদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ কিছু সৈনিকও রয়েছে। গাছপালার ফাঁকে অস্থায়ী সেনাছাউনিও চোখে পড়ল–সারি সারি তাঁবু ফেলা হয়েছে, তাঁবুর বাইরে আগুন জ্বেলে রান্নার আয়োজন চলছে।

কাঁটাতারের বাইরে, রানওয়ের পাশে কিছু প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড হাট দেখতে পেল রানা, সবুজ ও খয়েরি ক্যামুফ্লাজ রঙে রাঙানো। ওগুলো সম্ভবত থাই টং সদস্য, টিআইবি এজেন্ট আর শ্বেতাঙ্গ টেকনিশিয়ানরা ব্যবহার করছে।

রানওয়ের আরেক মাথায় তিনটে হেলিকপ্টার আর দুটো জেট প্লেন দেখতে পেল রানা। ওগুলোর গায়ে মার্কিন এয়ারফোর্স-এর মার্কা মারা।

ঈগলটা হ্যাঙ্গারের সামনে থাকলেও, রানওয়ের উপর থেকে এরইমধ্যে গাছের কাটা গুঁড়ি, কাণ্ড আর বোল্ডার একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

'যে-কোনও মুহূর্তে উড়ে যাবে পাখি,' পাশ থেকে বলল মানস।

গম্ভীর রানা মাথা ঝাঁকাল।

প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড হাট থেকে বেরিয়ে এল দুজন শ্বেতাঙ্গ। সাদা পোশাক পরা বয়স্ক লোক, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা পাইলট হতে পারে। দুজনের হাতেই হেলমেট দেখা যাচ্ছে, দ্রুত পায়ে কাঁটাতারের বেড়ার দিকে হাঁটছে ওরা।

নড়াচড়া লক্ষ করে আবার একটা হাট-এর দিকে তাকাল রানা। এবার সেটা থেকে বেরুল দুজন তরুণী। উত্তরা আর মোহনা– টিসিআই, অর্থাৎ, থাই কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট। দুজনের হাতই পিছমোড়া করে বাঁধা। তাদের দু'পাশে আই.বি-র দুজন পুরুষ এজেন্টকে দেখা যাচ্ছে, ওদেরকে নিয়ে বেরিয়ে আসছে রানওয়ে থেকে।

কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে মেটাল ওয়াল দিয়ে ঘেরা এক সারি ল্যাট্রিন রয়েছে, রানা ও মানসের সরাসরি নীচে। ওখানেই নিয়ে আসা হচ্ছে ওদের দুজনকে।

'একটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল,' বলল রানা।

'উত্তরা ম্যাডামকে এখানে ধরে এনেছে ওরা,' বলল মানস। 'তবে এখনও তাকে টরচার করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।'

এই সময় দূর থেকে একটা কুকুর ডেকে উঠল। ডাক শুনেই বোঝা গেল: ডোবারম্যান পিনশার।

'আমার ভোলা!' এক গাল হেসে বলল মানস। 'নিশ্চয়ই আমার গায়ের গন্ধ পেয়েছে!'

'কোত্থেকে এল ভোলা? আশপাশে...'

'ঠিক ধরেছেন, দাদা। আমরা টের না পেলে কী হবে, কাছাকাছিই কোথাও রয়েছে ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের অপারেটররা, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে আমাদের। যাকগে, আমরা তো সেটা জানতামই। ...কিন্তু দ্বিতীয় মেয়েটা কে, হুজুর, মানে, সার?'

'মোহনা, ও-ও একজন টিসিআই এজেন্ট,' বলল রানা।

'ইমরুল কায়েসের সন্তান ধারণ করছেন যিনি?' ভ্রূ কোঁচকাল মানস। 'ওঁদেরকে বন্দি করার কারণ কী হতে পারে?'

'সম্ভবত আমাকে সাহায্য করার অপরাধে,' বলল রানা।

ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল মানস। 'এবার বলুন, বস্, কীভাবে এগোব আমরা?'

নিজের প্ল্যান সম্পর্কে মানসকে একটা আভাস দিল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে নীচের উপত্যকাটা দেখে নিল একবার।

ওর প্ল্যান সবটুকু না শুনেই মুগ্ধ মানস, অপলক চোখে রানার দিকে তাকিয়ে আছে। 'এত কিছু? তাও এরকম দিনে-

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

দুপুরে?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল, ঘাড় ফিরিয়ে টহলরত গার্ডদের দিকে তাকাল আরেকবার।

মানসের পিঠ চাপড়ে দিল রানা। ওর হাতে স্ট্রাইয়েটেড টেপ-এর রোল আর একটা পিস্তল ধরিয়ে দিয়ে হাসল ও, বলল, 'আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগান দেখি এবার।'

'জে-আজ্ঞে,' বলে এক গাল হাসল মানস। নিজের ব্যাকপ্যাক থেকে বের করে কুকুরের রেশন ভর্তি টিনের দুটো কৌটা ধরিয়ে দিল রানার হাতে। 'আরও দুটো রাখুন। টিনে ভরা বলে আবার ভাববেন না বাজার থেকে কেনা। নিজের হাতে তৈরি করা, মশাই। গন্ধ শুঁকেই বুঝতে পারবে ভোলা। অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না যে, আমার হাতের তৈরি খাবার ছাড়া অন্য কিছু খায় না ভোলা। কী করে করবে? আসলে তো খায়!' বলে লাজুক হাসি হাসল মানস ঘোষ।

তেরো

পাথুরে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে উপত্যকায় নেমে যাচ্ছে রানা। বিপদসঙ্কুল পথ থেকে মুখ তুলে মাঝে-মধ্যেই দেখে নিচ্ছে কারও চোখে ধরা পড়ে গেল কি না, তারপর আবার তাকাল নিজের পায়ের দিকে। এক বোল্ডার থেকে আরেক বোল্ডারে গা ঢাকা দিয়ে নামছে, যেখানে সম্ভব গাছ ও ঝোপের আড়াল নিচ্ছে।

রানার কাছ থেকে ত্রিশ ফুট ডানে রয়েছে মানস, অন্য একটা পথ ধরে সে-ও নামছে উপত্যকায়।

ল্যাট্রিন থেকে উঠে আসা প্রস্রাবের ঝাঁঝ রয়েছে বাতাসে। মেয়েরা পাশাপাশি দুটো ল্যাট্রিনে ঢুকেছে। ওগুলোর বাইরে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছে আই.বি-র লোকাল দুই এজেন্ট, একজন আরেকজনের সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছে।

নিঃশব্দ পায়ে নেমে এসে এক জোড়া ল্যাট্রিনের পিছনে দাঁড়াল রানা। ওগুলোর ভিতরে নিচু গলায় কথা বলছে উত্তরা আর মোহনা। মেটাল ওয়ালে মৃদু টোকা দিল ও। চুপ হয়ে গেল ওরা।

'উত্তরা, আমি রানা।'

আবার কথা বলে উঠল ওরা দুজন, উত্তেজিত ও চাপা কণ্ঠে নিজেদের মধ্যে তর্ক করছে। তারপর উত্তরার প্রশ্ন ভেসে এল, গলায় রাজ্যের উদ্বেগ। 'কোথায় তুমি? এখানে এলে কীভাবে?'

'বাইরে বেরিয়ো না,' বলল রানা। 'দেয়ালের কাছ থেকে সরে থাকো। দেখি ওখান থেকে বের করা যায় কি না।'

'আমরা এখানে দুজন,' বলল উত্তরা।

'জানি। একটু ধৈর্য ধরো।'

সেই কুকুরটা ঘেউ করে উঠল। বেশি দূরে নয়। এক গাছ থেকে আরেক গাছের আড়াল পাওয়ার জন্য দ্রুত জায়গা বদল করছে মানস, পৌঁছে যাচ্ছে ল্যাট্রিনগুলোর পিছনে। ওর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল রানা।

পকেট থেকে টেপ-এর রোলটা বের করল মানস।

ঘুরে ল্যাট্রিনগুলোর একপাশে চলে এল রানা, একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল পাহারায়। ব্রাউন সাফারি সুট পরা আই.বি-এর লোকাল এজেন্টরা এখনও মেয়ে দুটোকে নিয়ে হাসাহাসি করছে।

কুকুরটা আরও জোরে ডাকছে, নামছে রানার বামদিকের পাহাড় বেয়ে। ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে একবার তাকাল মানস, ঠোঁটের কোণে স্নেহমাখা এক চিলতে হাসি। তারপর ব্যস্ত হাতে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

দুই ল্যাট্রিনের মেটাল ওয়াল-এ টেপ সাঁটতে শুরু করল– জানালার আকৃতিতে।

মানসের দেওয়া গ্যাস বোমাটা বের করল রানা, তারপর হাত ভরল ওর ব্যাকপ্যাকের সাইড পকেটে।

গলায় বাঁধা রশি পিছনে উড়ছে, দাঁত দিয়ে চিবানোয় থেঁতলে গেছে শেষপ্রান্ত, গাছপালার ভিতর দিয়ে তীরবেগে ছুটে আসছে ডোবারম্যান পিনশারটা সোজা রানার দিকে।

ঘাড় ফেরাল আই.বি গার্ডরা, হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠেছে তারা, কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে নিল রাইফেল। কাঁটাতারের ভিতর ও বাইরে থেকে আরও লোকজন ল্যাট্রিনগুলোর দিকে তাকাল, বোঝার চেষ্টা করছে কী কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কুকুরটা।

কাছাকাছি প্রি-ফেব্রিকেটেড হাট-এর একটা দরজায় এসে দাঁড়াল ফুটবল আকৃতির এক চিনা। এরকম চওড়া মানুষ খুব কমই দেখা যায়। চল্লিশের মত বয়স, মাথা কামানো। দেখামাত্র চিনতে পারল রানা– থাই টং-এর লিডার জিকো তানাই।

ঢাল বেয়ে ছুটে আসছে ডোবারম্যান পিনশার, তবে সেটাকে জিকো তানাই দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হলো না।

পাহাড়ের আরও অনেকটা উপরে, প্রায় চারশো ফুট উঁচুতে, কয়েকজন লোকের আভাস পেল রানা। তারা গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে থাকলেও, তাদের কমব্যাট ড্রেস ঠিকই চিনতে পারল রানা। তা হলে, একটা ভারতীয় টিম এখানে– এখনই নীচে নামবার সুযোগ কিংবা সাহস পাচ্ছে না।

ওদের কাছ থেকেই ছুটে এসেছে ডোবারম্যান পিনশারটা।

কিছু একটা সন্দেহ করে ঘুরে গেল আই.বি গার্ড দুজন, ল্যাট্রিনের পিছন দিকটা দেখতে আসছে তারা।

পিছু হটছে রানা।

ওযন-এর তীব্র ঝাঁঝে ভরে উঠল বাতাস। ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো। বিসিআই-এর টেকনিকাল ডিপার্টমেন্টের বানানো স্পেশাল টেপ শক্ত মেটাল গলিয়ে ফেলেছে, ফলে চৌকো আকৃতি দুটো খসে পড়েছে মাটিতে।

প্ল্যান অনুযায়ী মেয়ে দুটোকে নিয়ে পাহাড়ে উঠে যাবে মানস। কিন্তু ওর কুকুর এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়ায় এখন আর তা বোধহয় সম্ভব নয়। কুকুরটা যে দৌড়াদৌড়ি আর হাঁক-ডাক শুরু করেছে তার সমাপ্তি ঘটা দরকার, উপত্যকার পরিবেশ আবার স্বাভাবিক হয়ে আসাটা জরুরি।

ব্যাকপ্যাক থেকে বের করা রেশন ভর্তি ক্যানটা খুলে কুকুর আর গার্ডদের জন্য অপেক্ষা করছে রানা।

আগে পৌঁছল গার্ড দুজন।

ল্যাট্রিনের আড়ালে ওকে দাঁড়ানো দেখে একযোগে রাইফেল তুলল ওর বুক লক্ষ্য করে। পিছু হটছে রানা।

'হল্ট!' আদেশ করল একজন।

আরেকজন বলল, 'কে তুমি?'

এমনি সময়ে পৌঁছে গেল ডোবারম্যান পিনশার। পরিচিত খাবারের গন্ধ পাচ্ছে, অথচ লোকটা একদম অচেনা। ব্যাপারটা ভয়ানক সন্দেহজনক বলে মনে হলো ভোলার। গায়ের লোম সঙ্গে সঙ্গে খাড়া হয়ে গেল, ঠোঁট ভাঁজ হয়ে বেরিয়ে পড়ল চকচকে ধারাল দু'সারি দাঁত।

'ভোলা!' বলল রানা, ঠিক মানস যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছে– নরম, আদুরে সুরে। তারপর হাতের কৌটার খাবারটা ছুঁড়ে দিল কুকুরটার পায়ের সামনে।

এক পা এক পা করে আবার পিছু হটছে রানা।

খাবারটা শুঁকল ভোলা, চোখ তুলে কাকে যেন খুঁজল।

রানা পিছাচ্ছে, গার্ড দুজন একই গতিতে এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছে। এভাবে ল্যাট্রিনগুলোর পিছন দিকে চলে আসছে ওরা।

ক্যাপসুল ধরা হাতটা রানার পিছনে। পিন খুলে মাটিতে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

ফেলে দিল সেটা। ভাল করে দেখে নিয়েছে বাতাস যেদিকে বইছে সেদিকেই গার্ডরা রয়েছে কি না। ত্রিশ সেকেন্ড পর ফাটবে ওটা।

'হল্ট!' আবার গর্জে উঠল গার্ডদের একজন, ভাব দেখে মনে হলো রানা না থামলে গুলি করতে প্রস্তুত সে।

রানার আচরণে ক্ষতিকর কোনও ভাব নেই, তাই দ্বিতীয় গার্ড গুলি করবার কথা ভাবছে না।

ল্যাট্রিনের দেয়ালে তৈরি চৌকো ফাঁক দুটো দেখে হাঁ হয়ে গেল গার্ডরা। ভিতরে কেউ নেই দেখে চমকে গেল পিলেও।

'সে লম্বা এক কাহিনি,' ওদেরকে বলল রানা, হাসছে। প্রথম গার্ড গুলি করতে যাচ্ছে, বুঝতে পেরে তার রাইফেলের নলে থাবা চালাল ও। হ্যাঁচকা টানে ওটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল মাটিতে।

পরমুহূর্তে আধ পাক ঘুরে গেল শরীরটা, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড এক কিক মারল দ্বিতীয় লোকটার চোয়ালে। এর রাইফেলটাও খসে পড়ল মাটিতে।

মাটিতে পড়া রাইফেল তোলার জন্য ডাইভ দিল গার্ডরা, একই সময় রানা শুনতে পেল পুট্ করে শব্দ তুলে বিস্ফোরিত হলো গ্যাস বোমা। সঙ্গে সঙ্গে আটকে ফেলল দম।

শ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে নার্ভ গ্যাস পৌঁছানো মাত্র চোখ উল্টে গেল গার্ডদের। ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে তারা।

ভাল বাতাস বইছে, কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষার পর লাশ দুটোর পাশে এসে দাঁড়াল রানা। ওদের বেল্ট থেকে পিস্তল দুটো বের করে নিল।

'চলে এসো, ভোলা!' ডাকল ও, ঠিক যে সুরে শিখিয়ে দিয়েছে মানস। আবার পিছু হটে ল্যাট্রিনের পিছনে চলে এল রানা, রানওয়ে থেকে যেদিকটা দেখা যায় না।

লেজটা ঘনঘন নেড়ে, মাথাটা নত করে, যেন মালিকের অনুকরণে বিনয়ের অবতার সেজে রানার পায়ের দিকে হেঁটে আসছে ভোলা।

একটু ঝুঁকে কুকুরটার কান চুলকে দিল রানা, মাথা কাত করে কোথায় কী শব্দ হয় শুনছে। কাজকর্ম শুরু হওয়ার আওয়াজ হচ্ছে। গলা চড়িয়ে নির্দেশ দেওয়ার শব্দও ভেসে এল।

উপত্যকায় জমায়েত হওয়া লোকজন বিরক্তিকর কুকুরটা সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। হাট-এর দোরগোড়া থেকে ভিতরে চলে গেছে জিকো তানাইও।

গুলির শব্দ না হওয়ায় আই.বি ও থাই টং-এর সদস্যরাও ধরে নিয়েছে, কোথাও কোনও গোলমাল দেখা দেয়নি, মেয়ে দুটোকে ঠিকমতই পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র গার্ডরা। ইতিমধ্যেই যার যার কাজে মন দিয়েছে ওরা।

রানার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কুকুরটা, বার বার মাথাটা কাত করছে একদিকে। ওটার বিভ্রান্তি দূর হচ্ছে না– এই খাবার চেনে, সুরও পরিচিত, কিন্তু এ লোক তো তার মনিব নয়!

আরেকটা কৌটা খুলল রানা। সেটা ভোলাকে খেতে দিয়ে বলল, 'আশপাশেই থেকো, ভোলা। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার।'

ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল ও। মানস আর মোহনাকে নিয়ে প্রজাদের সেই গোলাঘরে ওর জন্যে অপেক্ষা করবার কথা উত্তরার। ওটার ভিতরেই নায়েবের একটা শাখা অফিস খোলা হয়েছে।

আঠারোশো ফুট উপরে আদিবাসীদের বসতি। নায়েবের অফিসে রানাকে ঢুকতে দেখে ছুটে এসে রানাকে জড়িয়ে ধরল উত্তরা।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

'ওরা বলাবলি করছিল তোমাকে নাকি মেরে ফেলা হয়েছে!'

'দেখতেই পাচ্ছ কথাটা সত্যি নয়,' বলল রানা, ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। 'ওরা তোমাদেরকে বন্দি করেছিল কেন?'

'ওরা টের পেয়ে গেছে আমরা তোমাকে সাহায্য করছি,' বলল উত্তরা।

'এখান থেকে সরে যেতে হবে, উত্তরা,' রানার গলায় তাগাদার সুর। 'ওরা আমাদেরকে খুঁজতে বেরুবে।'

'নিশ্চয়ই একটা প্ল্যান আছে তোমার?' জানতে চাইল উত্তরা।

'সেটা অত্যন্ত ভাল প্ল্যান হতে হবে, মাসুদ ভাই,' গম্ভীর সুরে বলল মোহনা। 'বিদেশি স্পাই স্যাবটাজ চালাবার হুমকি দিয়েছে, এ-ধরনের অজুহাত তৈরি করে দুর্গের চারপাশে ওরা কয়েকশো মিলিটারি পুলিশ মোতায়েন করেছে, তাদের সঙ্গে আছে মার্কিন ঘাঁটি থেকে আসা বেশ কিছু মেরিন, স্পাই, টেকনিশিয়ান ও নাসার বিজ্ঞানী। সত্যি কথা বলতে কী, এখানে কিছু করতে হলে পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু করতে হবে। সেই যুদ্ধটা পাঁচ-সাতজন লোককে দিয়ে হবে না।' হতাশ ও ম্লান দেখাচ্ছে তাকে।

'প্রথমে আমার ইনফরমেশন দরকার,' বলল রানা। 'উত্তরা, আমি তোমাদের নায়েব ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'নায়েব কাকা তো আজ এদিকে আসবেন না,' বলল উত্তরা। 'ঠিক আছে, চলো, আমরা তাঁর বাড়িতে যাই।'

লেযার পোড়া গাছপালাকে পাশ কাটিয়ে, তামাক খেতের উপর দিয়ে, উতরাই পেরিয়ে ওদেরকে পথ দেখাল উত্তরা। এদিকে কিছু পাখির কিচিরমিচির শোনা গেল। ঘাসজমিতে ছাগল চরাচ্ছে রাখালরা। অবশেষে প্রায় আটশো ফুট নীচে নেমে সাদা চুনকাম করা একটা বাড়ির সামনে থামল ওরা। দরজার মাথায় গৌতম বুদ্ধ-র একটা মূর্তি।

কাছেই এক প্রৌঢ়া মহিলা হাতের ভাঁজে চেরা কাঠ নিয়ে দরজার দিকে ফিরছে। তার পিছু নিয়ে বাড়িটার উঠানে ঢুকল ওরা। উত্তরা তার নায়েব কাকাকে দেখল, চুলোর সামনে মোড়ায় বসে আছেন। চুলোয় গরম করা হচ্ছে আলকাতরা, তাতে নারকেল তেল ঢেলে নাড়ছেন তিনি। ওদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে তাকালেন ভদ্রলোক।

উত্তরাকে দেখে মোড়া ছেড়ে দাঁড়ালেন নায়েব। 'তুমি, মা জননী? আমাকে খবর দিলেই তো পারতে...'

'আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই,' বলল উত্তরা।

পরিচয় পর্ব ও কুশলাদি বিনিময় শেষ হতে নায়েব ভদ্রলোককে সরাসরি বলল রানা, 'আমি জেটটা সম্পর্কে জানতে চাই।'

রানার দিকে নয়, উত্তরার দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন নায়েব। 'ওঁদেরকে এখানে নিয়ে আসা উচিত হয়নি তোমার।'

অপ্রস্তুত দেখাল উত্তরাকে। রানা আগেই জেনেছে যে বাবার বন্ধু হওয়ায় নায়েবের কথার উপর কথা বলে না সে।

'আপনি ভয় পেয়েছেন,' ভদ্রলোককে বলল রানা। 'জেটটা এখানে আসায় প্রজাদের শান্তি ও নিরাপত্তা নষ্ট হয়ে গেছে।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন প্রৌঢ়, চেহারায় উদ্বেগের রেখা ফুটে আছে। 'আমি চাই প্রশ্নের জবাব পাবার পর আপনারা চলে যাবেন, আর কখনও ফিরে আসবেন না।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'ঠিক কবে প্রথম জেটের আওয়াজ পান?'

'ও, আচ্ছা, আপনি তা হলে ওটার কথা জানেন!' বিস্মিত দেখাল নায়েবকে। 'আজ থেকে ঠিক ষোলো দিন আগে গভীর রাতে ল্যান্ড করে জেটপ্লেনটা।'

'আচ্ছা! তারপর উপত্যকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল প্লেনটা।

www.MurchOna.com

ঠিক কবে বলুন তো?'

'পাঁচদিন আগে উড়ে যায়, শুক্রবারে, এই সন্ধের খানিকক্ষণ আগে।'

'তারপর ফিরে আসে কখন? সেই একই রাতে?' জানতে চাইল রানা।

মাথা ঝাঁকালেন নায়েব। 'সাত ঘণ্টা পর।'

'ধন্যবাদ। আর কিছু জানার নেই আমার,' বলেই ঘুরল রানা। ওর পিছু নিয়ে ফিরতি পথ ধরল সবাই।

মাথা নিচু করে হাঁটছে রানা, মাথার ভিতর চলছে চিন্তার জাল। এতদিনে পরিষ্কার একটা চিত্র ফুটতে শুরু করেছে।

কোনও সন্দেহ নেই যে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে হাইজ্যাক করা হয়েছে আমাদের ফাইটার-বম্বার দুরন্ত ঈগলকেই। প্ল্যানটা করা হয়েছিল– প্লেনটা হাইজ্যাক করে সেটাকে নিয়ে এসে রাখবে থাই টং-এর আস্তানায়, দুর্গের পাশে, লুকানো একটা রানাওয়েতে।

থাই থান্ডারের তিনটে টিম রওনা হলো ঢাকার উদ্দেশে। প্রথম টিম ডক্টর নাদিরাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল সিঙ্গাপুরে।

দ্বিতীয় টিমের কাজটা ছিল জটিল। হ্যাঙ্গারের ভেতর যে দুটো ঈগল ছিল সেগুলোর স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে ওদেরকে, অর্থাৎ একটার জায়গায় আরেকটাকে রাখতে হয়েছে, আগুন ধরাতে হয়েছে ডেভেলাপ না করা ঈগলে, সবশেষে আকাশে উড়তে হয়েছে ডেভেলাপ করা ঈগল দুরন্তকে নিয়ে। তবে চুপিসারে জায়গা বদল করায় সবাই ধারণা করল ডেভেলাপ করা ঈগলটাই পুড়ে গেছে। আকাশে যেটা চক্কর দিচ্ছিল সেটা ডেভেলাপ করা নয়।

এখানেই তিন নম্বর টিমের প্রসঙ্গ চলে আসে। ফুচুং জানিয়েছে, একটা প্লেন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সন্দেহ নেই, ওই প্লেনটাই সংগ্রহ করে এখানে এনে রাখা হয়েছিল ষোলো দিন আগে গভীর রাতে।

ঘটনার দিন, গত শুক্রবার সন্ধ্যার একটু আগে, সেই প্লেনটা এখান থেকে রওনা হয়। ঠিক সময়মত ঢাকার আকাশে পৌঁছে ওটার ক্রুরা দেখল, ডেভেলাপ করা ঈগলটা চক্কর দিচ্ছে আকাশে। সেটার বদলে, সেটার জায়গায়, চক্কর দিতে শুরু করে এখান থেকে পাঠানো জেটটি। আর ডেভেলাপ করা দুরন্ত ঈগলকে ঢাকা থেকে নিয়ে আসা হয় এখানে, থাই টং-এর লুকানো রানওয়েতে। সেটাই চোখে পড়ে যায় ইমরুল কায়েসের।

এখানে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষী-প্রমাণ মুছে ফেলার জন্য চিনা তিনজন পাইলটকে খুন করে থাই টং। ওরা ভেবেছিল, আমেরিকা থেকে আসা পাইলট ও টেকনিশিয়ানরা খুব সহজেই এটাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে যেখানে খুশি।

কিন্তু তা পারেনি ওরা। ডক্টর নাদিরার ডেভেলাপ করা ইকুইপমেন্টের সফিসটিকেশন লেভেল সম্পর্কে ওদের কোনও ধারণাই ছিল না। তাঁর ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করতে গিয়ে একের পর এক দুর্ঘটনায় পড়তে থাকে ওরা। এমন কী আদিবাসীদের কয়েকটা বসতি পুড়িয়ে ফেলে দুনিয়ার মানুষকে কৌতূহলী করে তোলে। তা ছাড়া অনেকেই জানে পাঁচদিন আগে একটা জেট প্লেন এই উপত্যকা থেকে আকাশে উঠে সাতঘণ্টা পর ফিরে আসে আবার। তাই ডক্টর নাদিরাকে থাই থান্ডারের কবল থেকে যত দ্রুত সম্ভব উদ্ধার করে এখানে নিয়ে আসার প্রয়োজন পড়ল।

কিছুদূর হেঁটে এসে পাহাড়ের কিনারায় থামল রানা, এখান থেকে বেশ খানিকটা নীচে অন্য একটা উপত্যকা দেখা যাচ্ছে, সেটার উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলেছে পাহাড়ি একটা ঝর্না, রোদ লেগে ঝলমল করছে পানি।

কাজ হবে কি না জানে না, কিন্তু একটা প্ল্যান তৈরি হয়ে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

গেছে রানার মাথায়। ধরা দিতে হবে এবার।

থাই টং-এর জেটি ও ডক থেকে যে রাস্তাটা দুর্গের দিকে চলে গেছে, সেখানে নেমে এসে উত্তরার হাতে দখল করা পিস্তলগুলোর একটা ধরিয়ে দিল রানা। এখানে ওরা শুধু দুজনই। বিশেষ কাজ দিয়ে মোহনা আর মানসকে পাহাড়ের উপর রেখে এসেছে রানা।

'কী করতে হবে ভাল করে বুঝেছ তো?' জানতে চাইল রানা।

শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল উত্তরা। প্রত্যাশায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে তার চেহারা। 'আমাকে দু-মুখো সাপের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে, এই তো?' মৃদু শব্দে হেসে উঠল সে।

'হ্যাঁ।'

'আমার গল্প বিশ্বাস করবে তো ওরা?'

'করবে,' নিশ্চয়তার সঙ্গে বলল রানা। 'তুমি অবাক হয়ে যাবে কত সহজে বিশ্বাস করে তা-ই দেখে।'

রাস্তা ধরে দুর্গের দিকে হাঁটল ওরা, তারপর একটু ঘুরে গিয়ে খোলা মাঠের উপর দিয়ে এগোল, পাশেই কাঁটাতারের বেড়া। রানা সামনে রয়েছে, উত্তরা পিছনে; উত্তরার হাতের পিস্তল রানার শিরদাঁড়া লক্ষ্য করে ধরা।

দূর থেকেই দেখা গেল হ্যাঙ্গারের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেট প্লেনটা। কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে, রানওয়ের পাশে, প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড হাটগুলোও ক্রমশ কাছে চলে আসছে। টহল রত থাই টং-এর সদস্যরা থমকে দাঁড়াল ওদের দেখে। একজন ছুটে ঢুকে পড়ল হাট-এ– নিশ্চয়ই জিকো তানাইকে খবর দিতে গেল।

'আমার বলতে হবে, মোহনার প্রেমিক ইমরুল কায়েস খুন হয়ে যাওয়ায় ওর মতিগতির ঠিক নেই,' বিড় বিড় করে রিহার্সেল দিয়ে নিচ্ছে উত্তরা। 'ওকে আর বিশ্বাস করা যায় না। তাই ওর কাজটা আমার ওপর বর্তেছে। আমি চাই, বিদেশি গুপ্তচর এই ধূর্ত মাসুদ রানাকে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে অযথা হয়রানি থেকে আমার প্রজাদের রক্ষা করতে। তাই প্রথম সুযোগেই এই দুর্বৃত্তকে ধরে নিয়ে এসেছি টং চিফের কাছে।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বলল রানা। 'নিজের আনুগত্যের প্রমাণ দিতে এসেছ তুমি। কেউ এটা অস্বীকার করতে পারবে না।'

কথা না বলে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে রানার পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকল উত্তরা।

চোদ্দো

বিশাল বপু নিয়ে হাট থেকে বেরিয়ে এল থাই টং-এর লিডার জিকো তানাই। সরু চোখে শীতল, একাগ্র, স্থির দৃষ্টি। ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করছে। চকলেট রঙের সিগারেটে টান দিয়ে এমন ভঙ্গিতে কয়েকটা রিঙ তৈরি করল, সে-ই যেন গোটা দুনিয়ার মালিক।

জিকো তানাইয়ের পাশে এসে দাঁড়াল জুতনা মংকট, হাতে একটা একে-ফোরটিসেভেন। থাই ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ-এর লোকাল অফিসের হেড সে। লম্বা, চেহারায় থাই বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট, মুখে কালো তিল গিজগিজ করছে। মুখে কথা আটকে যায়– তোতলা।

রানা জানে, দুনিয়ার একনম্বর সুপারপাওয়ারকে সাহায্য

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

করছে মংকট। ওকে দেখে ঘৃণায় জ্বলে উঠল মংকটের চোখ, হাতের অস্ত্রটা ধীরে ধীরে তুলল, তাক করল রানার বুকে, কর্কশ শব্দে হেসে উঠে নামিয়ে নিল আবার।

রানা ও উত্তরাকে ঘিরে রেখেছে লোকাল আই.বি আর থাই টং-এর কয়েকজন সদস্য। সবার অস্ত্রই যে রানার দিকে তাক করা, তা নয়; কেউ কেউ কাভার করছে উত্তরাকেও। ধীর পায়ে ওদেরকে নিয়ে জিকো তানাই আর জুতনা মংকটের সামনে এসে দাঁড়াল তারা।

'আগে ওকে সার্চ করো,' নির্দেশ দিল জিকো তানাই।

দ্রুত, দক্ষতার সঙ্গে রানাকে সার্চ করল একজন থাই টং সদস্য। ওয়ালথার, ছোট্ট একটা রেডিও, ছুরি ও ব্যাকপ্যাক– সব হাতছাড়া হয়ে গেল।

'মাসুদ রানা,' বলল জিকো তানাই। 'অনেক বড় স্বপ্ন নিয়ে দেশ থেকে এসেছিলে, কিন্তু ভেঙে গেল সেটা! শেষ পর্যন্ত একটা মেয়ের কাছে ধরা খেয়ে সোজা এসে ঢুকলে যমের বাড়ি। ...ধন্যবাদ, উত্তরা। যে-সাহায্য করলে, তার জন্যে নিশ্চয়ই বিরাট পুরস্কার পাবে তুমি তোমার অফিস থেকে।'

'এর মধ্যে উত্তরার কৃ-কৃতিত্ব কতটুকু সেটা বি-বিবেচনা করে দেখতে হবে,' বলল মংকট। 'আরও অনেক আ-আগেই রানা আর মোহনার হদিস ওর কাছ থেকে পাব বলে আশা করেছিলাম আমরা।'

কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল উত্তরা।

'*আমরা* মানে আসলে থাই কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অপারেশন্স চিফ সত্যশুভ চুনাভান, তা-ই না?' বলল রানা।

রানার কথা শুনে ছানাবড়া হয়ে উঠল উত্তরার চোখ।

'ও, তুমি তা-তা হলে জা-জানো?' মংকটের কথায় শ্লেষ।

রানার জানা আছে, মোহনা আর উত্তরা সরল বিশ্বাসে চুনাভানকে রিপোর্ট করছিল ওর গতিবিধি ও প্ল্যান সম্পর্কে, কারণ ওদেরকে ধারণা দেয়া হয়, মাফিয়াদের সাহায্য নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে অপারেশন চালাচ্ছে, তাতে চুনাভানের বিন্দুমাত্র সমর্থন নেই, সাধ্যমত বাধা দেবে সে।

'এতক্ষণে বুঝলাম!' কঠোর দৃষ্টিতে উত্তরাকে আপাদমস্তক দেখল রানা, তারপর বলল, 'রানা এজেন্সির ব্যাংকক শাখার প্রধান লাবণী কোটা বাহারুর কোন্ হোটেলে উঠবে, উত্তরা তা জানত। তার কাছ থেকে জেনেছিল মোহনা, সঙ্গে সঙ্গে রুটিন রিপোর্ট হিসেবে তার ইমিডিয়েট বস্ চুনাভানকে জানায়। চুনাভান খবর পৌঁছে দেয় থাই থান্ডার লিডার চক্রি চুয়ানের কাছে। চুয়ান তার বান্ধবীকে পাঠিয়ে খুন করায় লাবণীকে।'

'বাহ্, অঙ্কে দেখা যাচ্ছে তো-তোমার মাথা ভাল,' বলল মংকট। 'হিসেব মেলাতে ও-ওস্তাদ।'

'শুধু নিজের হিসেবটা মেলাতে পারেনি, গুবলেট করে ফেলেছে,' বলল জিকো তানাই, হাওয়ায় আরও কয়েকটা রিঙ তৈরি করল। 'তুমি শেষ, রানা। ধরে নাও মারাই গেছ।'

'সরে দাঁড়াও সবাই, পি-প্লিজ,' বলে হাতের অস্ত্রটা আবার রানার বুকে তাক করল মংকট। 'বিপজ্জনক ঝামেলা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মি-মিটিয়ে ফেলাই ভাল। প্লেনটার সঙ্গে ওর লাশটাও নিয়ে যেতে পারলে ভারি খুশি হবেন আমেরিকান এয়ারফোর্সের অপারেশন্স চিফ কমান্ডার ডুগার্ড ম্যাকমোহান।'

'না, এখনই নয়,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল জিকো তানাই। উত্তরার দিকে তাকাল সে, পরিস্থিতি থেকে কী ধরনের সুবিধে পাওয়া যায় চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে চায়। 'রানা নিশ্চয়ই একা আসেনি? কজন ওরা?'

'চুনাভান সারকে আগেই তো সব জানিয়েছি আমি,' বলল উত্তরা। সামলে নিয়েছে নিজেকে। 'রানার সঙ্গে শুধু আর একজন ছিল, ইন্ডিয়ান। আর ছিল মোহনা। চুনাভান সার নির্দেশ দেন আমি যেন ইন্ডিয়ানটাকেও ধরে আনি এখানে। কিন্তু তা

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

সম্ভব হয়নি। শুধু রানাকেই আনতে পেরেছি।'

'ইন্ডিয়ানটা কোথায়?' জানতে চাইল জিকো তানাই। 'আর মোহনা?'

'পাহাড়ে,' বলল উত্তরা। 'ইন্ডিয়ান লোকটার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।'

'কেন?'

'বাহ, আপনারা জানেন না, ও তো রানা এজেন্সির শাখা-প্রধান ইমরুল কায়েসের বান্ধবী ছিল– যাকে আপনারা খুন করেছেন। কায়েসের সন্তান রয়েছে ওর গর্ভে।'

মাথা ঝাঁকাল মংকট। 'ক-কথা কিন্তু ঠিক, বস্।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গোটা ব্যাপারটা নতুন করে সাজাল তানাই। মিল পেয়ে মাথা ঝাঁকাল, তারপর বলল, 'ঠিক আছে। এবার শোনা যাক, ওদের প্ল্যানটা কী।'

'আমি শুধু জানি ওরা একটা প্ল্যান করেছে, কিন্তু সেটা কী তা জানি না,' বলল উত্তরা। 'কী কারণে যেন আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে ওরা। হয়তো ভেবেছে আমি জানলে ফাঁস করে দেব। তবে সন্দেহ করছি, কোনও একটা দেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করবে ওরা। এটুকুই বলতে শুনেছি রানাকে।'

হেসে উঠল তানাই। হাসবারই কথা, কারণ সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ বিশ্বাস করবে না, একটা প্লেনের জন্য থাইল্যান্ড আক্রমণ করবে কোনও রাষ্ট্র।

মংকট হাসল না, গম্ভীর হয়ে উঠল তার চোখ-মুখ। 'এটা তো খু-খুব খারাপ কথা যে তুমি জা-জানো না ওদের প্ল্যানটা কী,' গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে না পারায় উত্তরাকে তিরস্কার করল সে।

সব মিলিয়ে উত্তরার জন্য পরিবেশটা তেমন অনুকূল থাকছে না। এখন যদি তাকে অ্যারেস্ট করা হয়, রানার কোনও সাহায্যেই আসতে পারবে না সে।

'ও... রানা, আমার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে প্ল্যানটা করে, আমি যাতে কিছু শুনতে না পাই,' বলল উত্তরা, এবার সরাসরি মংকটের দিকে তাকাল। 'কিন্তু আমি ওকে ধরেছি! ধরে এখানে নিয়ে এসেছি!'

'কেন? তুমি ঝুঁকি নিতে গেলে কেন? তোমার কী স্বার্থ?'

'আমার প্রজারা,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল উত্তরা। 'আমি চাই এই এলাকায় এসব চোর-পুলিশ খেলা শেষ হোক, শান্তি ফিরে আসুক ওদের জীবনে।'

আবার মাথা ঝাঁকাল থাই টং চিফ তানাই। মংকটের দিকে ফিরে বলল, 'ঠিক আছে, রানার পেট থেকে সব বের করছি।' হিপ-হোলস্টারে গোঁজা পিস্তলের বাঁটে হাত বুলাচ্ছে।

'যেভাবে ডক্টর নাদিরার কাছ থেকে বের করেছ সব?' মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল রানা। 'হুমকি দিয়ে, নির্যাতন চালিয়ে কোনও সুবিধে করতে পারেনি থাই টং। ওগুলো ছাড়া আর তো কিছু জানোও না তোমরা।'

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে রানার দিকে ধোঁয়ার রিঙ ছুঁড়ল জিকো তানাই। 'আমার বিশ্বাস, উত্তরাও জানে না যে তুমি আসলে স্বেচ্ছায় এখানে এসেছ,' বলল সে, মংকট কিংবা উত্তরা সম্পর্কে এখন তার আর কোনও আগ্রহ নেই। 'এই আসাটা তোমার প্ল্যানের একটা অংশ, ঠিক কি না?' রানাকে প্রশ্ন করল সে।

'ঠিক ধরেছ,' বলল রানা। 'এবার আমরা নিরিবিলিতে কথা বলতে পারি?'

জিকো তানাইয়ের অস্থায়ী অফিসে একটা মাত্র জানালা। সেটার দিকে পিছন ফিরে মস্ত রিভলভিং চেয়ারটায় বসল সে। হাত তুলে খালি চেয়ারটা রানাকে দেখাল। সামনে একটা ডেস্ক, তাতে বেশ কিছু ফাইল ও ফোল্ডার স্তূপ করা। পিছু নিয়ে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

কয়েকজন গার্ড ঢুকেছে, হাত-ইশারায় অফিস থেকে তাদেরকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল।

'আপনি থাকুন, মিস্টার মংকট,' বলল তানাই। 'বাকি সবাই যাও, খুঁজে বের করো মানস আর মোহনাকে। উত্তরাকে জেরা করো। তার মাথায় কিছুই নেই, এ আমি বিশ্বাস করি না।' সুইভেল-চেয়ার ঘুরিয়ে বাইরে তাকাল থাই টং চিফ।

বাইরে কাঁটাতারের বেড়া, হ্যাঙ্গার, হ্যাঙ্গারের সামনে জেট প্লেন ইত্যাদি সবই দেখা যাচ্ছে।

অফিসে একটাই দরজা, সেটার পাশে পজিশন নিল মংকট।

'ঠিক আছে, মাসুদ রানা,' চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে বলল তানাই। 'তোমার অফারটা কী?'

এতক্ষণে তানাইয়ের দেখানো কাঠের চেয়ারটায় বসল রানা। 'তোমার ভাল করেই জানা আছে, ডক্টর নাদিরাকে কিডন্যাপ, তাঁর ডেভেলাপ করা চিনা জেট দুরন্ত ঈগল হাইজ্যাক, এ-সবই দুনিয়ার সেরা পরাশক্তি আমেরিকার নির্দেশে ঘটেছে,' বলল রানা। 'প্লেনটা যেহেতু আরেক পরাশক্তি পিপ্‌ল্‌স্ চায়নার তৈরি, তাই কাজটা নিজে করতে সাহস পায়নি আমেরিকা। কাজটা চাপানো হয় তাইওয়ানিজ সরকারের ঘাড়ে। অনুরোধে ঢেঁকি গিললেও, তারাও চিনকে ঘাঁটাতে সাহস পেল না– বোঝাটা চাপাল তাইওয়ানিজ টঙের কাঁধে, ওরা চাপাল থাই টং, অর্থাৎ তোমার মাথায়।'

'এত কথা তুমি জানলে কীভাবে?'

'এটা-সেটা দেখে। ডক্টর নাদিরার কাছ থেকে ফাইটার-বম্বার দুরন্ত ঈগল সম্পর্কে ইনফরমেশন চাইছে আমেরিকানরা,' বলল রানা, ডেস্কের উপর সামান্য ঝুঁকল। 'ওটার বিস্তারিত ডিজাইন পেলে সবচেয়ে খুশি হয় তারা। আমার ওপর নির্দেশ আছে, যে-কোনও মূল্যে ডক্টর নাদিরা আর ওই প্লেনটাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

প্রস্তাবটায় নাটকীয়তা আনার জন্য থামল রানা। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে জিকো তানাই আর জুতনা মংকট।

'আমি তাঁকে রাজি করাব,' ঝাড়া দশ সেকেন্ড পর বলল রানা। 'দুরন্ত ঈগলের একটা ডিজাইন এঁকে দেবেন ডক্টর নাদিরা, দুজন পাইলটকে শেখাবেন দুরন্ত ঈগলের যন্ত্রপাতি কীভাবে অপারেট করতে হয়। বিনিময়ে আমাদের সবাইকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। দুরন্ত ঈগলে চড়ে চলে যাব আমরা।

'শুধু তা-ই নয়, আমাদের সঙ্গে ওই প্লেনে আমেরিকান এয়ারফোর্সের অপারেশন্স চিফ কমান্ডার ডুগার্ড ম্যাকমোহানও থাকবেন, আকাশে ওঠার পর ওটাকে যাতে কেউ গুলি করে ফেলে না দেয়।' একটু থেমে আরেকটা কথা যোগ করল রানা, 'আমি সংকেত না দিলে চিন নাক গলাবে না।'

চিন্তিত দেখাল জিকো তানাইকে। তারপর মাথা নাড়ল সে। 'আমাকে যারা ভাড়া করেছে সেই পরাশক্তি এমন কিছু করবে না যাতে দুনিয়ার লোক জেনে ফেলে এই ব্যাপারটার সঙ্গে তারা জড়িত। তোমার এই প্রস্তাবে তারা যদি রাজি হয়ও, তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে সাজানো নাটকের মাধ্যমে– সবাই জানবে তোমরা পালিয়েছ, পালাবার সময় জিম্মি করেছ ডুগার্ড ম্যাকমোহনকে। তবে এর মধ্যে আরও অনেক জটিলতা আছে।'

'যেমন: তোমার স্বার্থ কী?'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল জিকো তানাই। 'একা শুধু আমি নই, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স আর ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের যে অংশটা জড়িত, তারাই বা কী পাবে।' ইঙ্গিতে দরজার পাশে দাঁড়ানো মংকটকে দেখাল সে।

'তোমাকে ঠকিয়েছে থাই থান্ডার: এই ছুতো দেখিয়ে প্রভুর কাছ থেকে অতিরিক্ত আরও দশ কি বিশ মিলিয়ন ডলার চাও তুমি,' বুদ্ধি দিল রানা। 'তা থেকে থাই সরকারের সঙ্গে যে-সব টিসিআই আর আই.বি সদস্য বেঈমানী করেছে তাদেরকে কিছু

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

খয়রাত কোরো। ওদের তো শাস্তি পাবার কথা, তার বদলে তোমার কাছ থেকে কিছু পেয়ে সব যেন ভুলে যায়।'

রানার দিকে রাইফেল তাক করতে যাচ্ছে মংকট, দেখতে পেয়ে ধমক দিল টং চিফ। 'স্টপ ইট!'

'ইচ্ছে করলে আমার প্রস্তাবটাই নিজের প্রস্তাব হিসেবে চালাতে পারো তুমি,' জিকো তানাইকে আবার বলল রানা। 'এতক্ষণে ওদের বোঝা হয়ে গেছে ডক্টর নাদিরা ভাঙবেন, তবু মচকাবেন না। তাদেরকে এ-ও বোঝাও যে প্লেনটাকে অচল অবস্থায় এখানে এভাবে ফেলে রাখাটা মারাত্মক বোকামি হয়ে যাচ্ছে। যখন-তখন যে-কোনও কিছু ঘটে যেতে পারে।'

রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জিকো তানাই। 'তুমি কিন্তু একবারও বলছ না তোমার কাছ থেকে কী পাব আমি। এটা একটা বিজনেস ডিল, কাজেই খালি হাতে কিছু পাবার আশা কোরো না।'

'এই যে লোভ ত্যাগ করতে পারছ না, এর কারণ আমার কথা হয় ভাল করে শোনোনি, না হয় বিশ্বাস করোনি তুমি,' বলল রানা।

'মানে?'

'তা হলে আবার বলছি, শোনো,' বলল রানা, 'আমি সংকেত না দিলে নাক গলাবে না চিন।'

গম্ভীর হলো জিকো তানাই। 'সিরিয়াস আলোচনায় জোক শুনতে ভাল লাগে না।'

'তা হলে আমার আর কিছু বলার নেই,' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

মনে মনে কী ভাবল সে-ই জানে, নিজের পাওনা নিয়ে আর কিছু বলল না থাই টং চিফ। 'ঠিক আছে, প্রস্তাবটা জানাচ্ছি আমি। দেখা যাক কী প্রতিক্রিয়া হয়।'

পাঁচজন সশস্ত্র গার্ডকে রানার পাহারায় রেখে প্রভুর সঙ্গে আলোচনা করতে চলে গেল জিকো তানাই। মংকটকেও নিয়ে গেল।

বেশি সময় নিল না, আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে এল ওরা। কে জানে কী শুনে এসেছে, দুজনের চেহারাই মড়ার মত ফ্যাকাসে লাগল রানার চোখে।

'ওরা রাজি,' বলল জিকো তানাই। 'তবে ডক্টর নাদিরাকে দিয়ে কাজগুলো তুমি করাতে পারবে কি না সন্দেহ করছে। চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছে তোমাকে।'

আসলে চব্বিশ ঘণ্টাই দরকার রানার। 'আটচল্লিশ ঘণ্টা হলে ভাল হত,' বলল ও।

'মাত্র একদিন,' বলল তানাই, মংকটের দিকে ফিরে ইঙ্গিত করল। 'প্লেনে নিয়ে যান ওকে। যা যা দেখতে চায় দেখতে দেবেন।'

'একটা প্রশ্ন,' খুক করে কেশে বলল রানা। 'তোমাদের কী হয়েছে বলো তো?'

'অত কথার কী দরকার?'

'আমিই বলে দিচ্ছি,' বলল রানা। 'থাইল্যান্ড সরকারকে চাপ দিচ্ছে বেইজিং, বলছে চিনের কাছ থেকে সাহায্য চাও।'

উত্তেজিত হয়ে উঠল জিকো তানাই: 'গায়ের জোরে সাহায্য করতে চাইছে ওরা।'

মৃদু হাসল রানা।

'তোমার এত খুশি হবার কিছু নেই, মাসুদ রানা,' হিসহিস করে বলল তানাই। 'খবর আরও আছে।'

অপেক্ষা করছে রানা।

'থাইল্যান্ড সরকারকে চাপ দিচ্ছে আমেরিকাও,' জানাল তানাই। 'বলছে– আমাদের কাছ থেকে সাহায্য চাও!'

'থাই সরকারের অবস্থা দেখা যাচ্ছে খুবই সঙ্গীন,' বলল রানা।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

দীর্ঘশ্বাস চাপল জিকো তানাই। 'জানতে ইচ্ছে করছে কার অবস্থা সঙ্গীন নয়!'

মংকটের সঙ্গে রওনা হলো রানা, যতটা না খুশি, তারচেয়ে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন।

পনেরো

দুরন্ত ঈগলকে এখনও ঘিরে রেখেছে আমেরিকান মেরিন আর থাই মিলিটারি পুলিশ। সতর্ক ও অনিশ্চিত দৃষ্টিতে রানাকে হেঁটে আসতে দেখল তারা, অনুমতি থাকায় প্লেনে উঠতে বাধা দিল না কেউ। রানাকে আগেই জানানো হয়েছে, প্লেনের কাছ থেকে দেশি-বিদেশি পাইলট ও টেকনিশিয়ানদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

আমেরিকান মেরিন সৈন্যরা সবাই শ্বেতাঙ্গ। এরা কমান্ডো, আগেও অনেকবার দেখেছে রানা, তাই চিনতে কোনও অসুবিধে হলো না। তবে মনে খুঁতখুঁতে ভাব জাগিয়ে তুলল থাই মিলিটারি পুলিশ। ইউনিফর্মের ভাঁজ ঠিক নেই, এরকম মিলিটারি পুলিশের কথা কল্পনাও করা যায় না, অথচ এখানে প্লেনটাকে যারা পাহারা দিচ্ছে, তাদের কারও ইউনিফর্মই দু'চারদিনের মধ্যে ধোলাই বা ইস্ত্রি করা হয়নি।

আরও কিছু খুঁত চোখে পড়ল। এক একজনের মাথার ক্যাপ এক একদিকে বেঁকে আছে। ইউনিফর্মের বোতাম ভাঙা। একটা বুটও পালিশ করা নয়। সবাই তারা চিনা।

ফাইটার-বম্বার দুরন্ত ঈগল লম্বায় পঞ্চাশ ফুট হবে। ভিতরটা শান্ত, সারি সারি কমপিউটার ও রেইডার কনসোল নীরব হয়ে আছে, একটা বাতিও মিটমিট করছে না। শোনা যাচ্ছে না এতটুকু যান্ত্রিক গুঞ্জন। স্ক্রিনগুলো সব অন্ধকার। প্লেনের খোল প্রায় ভরাট হয়ে আছে দুর্বোধ্য টেকনলজিকাল ধাঁধায়।

প্লেনের সামনের অংশে উজ্জ্বল একটা আলো জ্বলছে, সেটার দিকে এগোচ্ছে রানা। ওর ঠিক পিছনেই রয়েছে জুতনা মংকট, তার ক্ষতবিক্ষত চেহারায় অশুভ একটা ভাব ফুটে আছে। বদ্ধ বাতাসে মেশিন-অয়েল, ঘাম ও সিগারেটের গন্ধ।

একটা সিটে বসিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে ডক্টর নাদিরাকে, মাথাটা ঝুলে পড়েছে সামনের দিকে। আই.ভি টিউব থেকে দুটো হাতেই তরল মেডিসিন ঢুকছে। সিটের পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে আই.বি-এর একজন গার্ড। জুতনা মংকটকে দেখে স্যালুট করল সে।

'এখানে আমার কর্তৃত্ব থাকলে এ-এতক্ষণে মারা যেতে তুমি,' বলল মংকট, রানার পিঠে গুঁতো মারল একে-ফোরটিসেভেনের মাজল দিয়ে।

ব্যথাটা নীরবে সহ্য করলেও, ধীরে ধীরে ঘুরল রানা, চোখ নামিয়ে প্রায় বুক ছুঁয়ে থাকা রাইফেলের মাজলটার দিকে তাকাল একবার। 'তুমিই তো, না?' জিজ্ঞেস করল ও। 'হাইওয়েতে মোটরসাইকেল, গাড়ি আর হেলিকপ্টার পাঠিয়েছিলে? সত্যশুভ চুনাভানের নির্দেশে, আমার ব্যবস্থা করার জন্যে?' শান্ত আলাপের সুরে বলছে কথাগুলো। 'প্ল্যানিংটা আহামরি কিছু হয়নি।'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

রানার ঠাণ্ডা আচরণ দেখে আরও রেগে উঠল মংকট, দাঁতে দাঁত ঘষে হিসহিস করে বলল, 'তো-তোমাকে আমি দেখে নেব!'

ব্যারেলের পাশে একটা আঙুল ঠেকিয়ে অস্ত্রটা বুকের সামনে থেকে একপাশে সরিয়ে দিল রানা। 'পারলে দেখো,' বলল ও। 'তবে তানাই বলে দিয়েছে এখন তোমরা আমাকে ছুঁতে পারবে না।' গার্ডের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল ও।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল গার্ড।

রাইফেল নামিয়ে ঘুসি পাকাল মংকট, তারপর সেটার দিকে তাকিয়ে হতাশায় ভেঙে পড়বার ভঙ্গি করল। কাঁধ দুটো ঝুলে পড়ল, মাথাটা নত হলো। তারপর অকস্মাৎ প্রচণ্ড শক্তিতে একে- ফোরটিসেভেনের বাঁট দিয়ে বাড়ি মারল দেয়ালে। ফাইবারবোর্ড ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। 'তো-তোমাকে আমি খুন করব, হারামজাদা!'

নিঃশব্দে হাসল রানা, জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। পিছন ফিরল ও, হাঁটু গাড়ল ডক্টর নাদিরার সামনে। ব্লাউজটা এত জায়গায় ছিঁড়ে গেছে, শরীরে ওটা থাকা না থাকা সমান। নীল জর্জেট শাড়িটাও কাদা-মাটি লেগে নোংরা হয়ে আছে। মুখে আঁচড়ের বেশ কয়েকটা দাগ। চোখ বুজে আছেন তিনি।

'ডক্টর নাদিরা,' নরম সুরে ডাকল রানা। বাংলায় বলল, 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

তাঁর গলার গভীর থেকে কুলকুচো করবার মত আওয়াজ বেরিয়ে এল– দুর্বোধ্য, যেন আহত কোনও পশু ব্যথা ও হতাশায় কাতরে উঠল।

বিজ্ঞানীর চিবুকে তালু রেখে দাগে ভরা মুখটা উঁচু করল রানা। 'ডক্টর নাদিরা,' বলল আবার। 'আমি মাসুদ রানা। আমার কথা মনে পড়ে? আমি আপনাকে মুক্ত করতে এসেছি।'

চোখ মেলে তাকালেন ডক্টর নাদিরা। ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছেন। 'প্রথমবার তো পারনি,' জড়ানো গলায় বললেন তিনি, যদিও ঠিক তিরস্কারের সুরে নয়। 'তবে বোঝা যাচ্ছে তুমি নাছোড়বান্দা। আবার এসেছ, সেজন্যে ধন্যবাদ।' সম্ভবত ড্রাগস দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

মাথা চুলকাল রানা, জানে প্রতিভাবান প্রায় সব মানুষই একটু অন্যরকম হন–ইনি বড় বেশি স্পষ্টবক্তা। 'জী, আমার ব্যর্থতা ক্ষমা করবেন।'

'আচ্ছা। পরেরবার কিন্তু করব না, মনে থাকে যেন,' বললেন ডক্টর নাদিরা। 'মানুষের সহ্যেরও তো একটা শেষ আছে! ওরা... ওরা আমাকে...' আধবোজা চোখ দুটো আবার দৃষ্টিহীন হয়ে আসছে। দু-ফোঁটা পানি নেমে এল গাল বেয়ে।

'আপনার ওপর ওরা টরচার করেছে?' নরম সুরে জানতে চাইল রানা।

'শেষপর্যন্ত বুঝে ফেলে, টরচার করে কোনও লাভ হবে না,' জড়ানো গলায় বললেন ডক্টর নাদিরা। 'তারপর আমাদের দুরন্ত ঈগলের রহস্য জানার জন্যে হাতে-পায়ে ধরে এমন অনুনয়-বিনয় শুরু করল, সেই সঙ্গে ওষুধ। আমি... ওদেরকে... দু'একটা... বলে ফেলেছি...'

'তাতে কিচ্ছু আসে যায় না,' বলল রানা। 'কিছু তো ওদেরকে বলতেই হবে, তা না হলে ওরা আমাদেরকে ছাড়বে কেন। তবে এ-সব নিয়ে এখনই উদ্বিগ্ন হবেন না। প্রথমে আপনাকে সুস্থ হতে হবে।'

'কী জানি... পারব কি না। ওরা... মেডিসিন দিয়ে... আমাকে ওরা...' যেন বাবার কাছে নালিশ জানাচ্ছে ছোট্ট একটা মেয়ে।

রানার ঘাড়ে আবার রাইফেলের মাজল ঠেকাল মংকট। 'ইংরেজি, নয়তো থাই ভাষায় ক-কথা বলো,' কর্কশ সুরে নির্দেশ দিল সে।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

'ভয় পাচ্ছ?' ঘাড় ফিরিয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল রানা। 'যার গোলামি করছ সেই জিকো তানাই তো ভয় পাচ্ছে না। সে যাদের গোলামি করছে, তারাও দেখো কেমন সরে দাঁড়িয়েছে। ওদের ওপর তোমার আস্থা নেই?'

রানার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকল মংকট। ধীরে ধীরে একে-ফোরটিসেভেনটা একপাশে সরিয়ে নিল সে।

ঘাড় সোজা করে আবার ডক্টর নাদিরার বিষণ্ন চোখ দুটোর দিকে তাকাল রানা। 'আমার সঙ্গে কথা বলুন, ডক্টর নাদিরা। সব আপনি মনে করতে পারছেন কি?'

'না, যা ভাবছ তা নয়,' বললেন ডক্টর নাদিরা, জিভে জড়িয়ে যাচ্ছে কথা। 'আমার স্মৃতিশক্তির কিচ্ছু হয়নি।'

'বাহ্, দারুণ!' বলল রানা। 'ডক্টর নাদিরা, দেশের জন্যে, বিশ্বশান্তির জন্যে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন আপনি, আমরা সবাই তাই গর্বিত, আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'আমি দেশে ফিরতে চাই,' বললেন তিনি। 'আমার কাজ...কী জানি... আর কি কোনও দিন কাজ শুরু করতে পারব...'

'অবশ্যই পারবেন,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা। 'আমার দিকে তাকান। চোখ দেখে বলুন, আমাকে বিশ্বাস করা যায়?'

রানার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন বিজ্ঞানী। তাঁর কলঙ্কিত চেহারায় আশা ও অবিশ্বাস যুদ্ধ করছে। অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। 'হ্যাঁ,' বললেন তিনি, গলাটা কেঁপে গেল। 'যতটুকু পারা যায় আমি সাহায্য করব।'

'ধন্যবাদ, এর বেশি আমরা কিছু আশা করি না।'

চোখ বুজলেন ডক্টর নাদিরা, ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লেন, আবার সামনের দিকে ঝুলে পড়ল মাথাটা।

সিধে হয়ে মংকটের দিকে ঘুরল রানা। 'শোনো হে, দুই নম্বর,' ইংরেজিতে বলল ও। 'এখনই ডক্টর নাদিরার হাত থেকে টিউব দুটো খুলে নাও। যতক্ষণ ড্রাগস চলবে, ততক্ষণ কাজের কোনও কথাই বলানো যাবে না তাঁকে দিয়ে। এদিকটা তুমি দেখো, সেই ফাঁকে আমি একটু ঘুমিয়ে নেব। ...রেস্ট নেয়ার কী ব্যবস্থা এখানে?'

'এখানে তোমার চা-চালবাজি বেশিক্ষণ চ-চলবে না,' হুমকির সুরে বলল মংকট। গার্ডের দিকে ফিরে আই.ভি খুলে নেওয়ার ইঙ্গিত দিল সে। তারপর রানার পিঠে মাজল ঠেকিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল দরজার দিকে।

দুপুরের সূর্য আগুন ঝরাচ্ছে দুর্গের চারপাশে। দূরের পাহাড়ি ঢালে চিকচিক করছে অস্থির ঝর্না। হালকা নীল আকাশে সোনালি ডানা মেলে উড়ছে নিঃসঙ্গ একটা চিল।

বন্দি হওয়ার আগে, প্ল্যানটা তৈরি করবার সময়, চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর লিউ ফুচুঙের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করতে হবে, মোহনাকে তা জানিয়েছে রানা। সন্দেহ নেই, এতক্ষণে ওর মেসেজ পেয়ে গেছে ফুচুং।

এই যুদ্ধক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় বন্দি হয়েছে রানা। এখন যেভাবেই হোক একটা ডাইভারশন তৈরি করতে হবে ওকে, ফুচুঙের নেতৃত্বে চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট ও কমান্ডোরা যাতে থাই টঙের এই আস্তানায় চুপিসারে ঢুকে পড়ার সুযোগ পায়– যদিও ওর কোনও ধারণা নেই ফুচুং ঠিক কীভাবে সাহায্য করতে আসবে, কিংবা এই মুহূর্তে কোথায় রয়েছে সে।

নিজের উদ্ভাবনী শক্তির উপরই বেশি নির্ভর করতে হবে রানাকে। ডাইভারশনটা যদি যথেষ্ট ভাল হয়, ডক্টর নাদিরাকে উদ্ধার করা সম্ভব, সম্ভব দুরন্ত ঈগলকে নিয়ে আকাশে উঠে পড়া।

প্লেন থেকে নেমে কাঁটতারের বাইরে বেরিয়ে এল রানা ও মংকট, রানওয়ে ধরে জিকো তানাইয়ের অস্থায়ী অফিস, প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড হাটগুলোর দিকে এগোচ্ছে। সশস্ত্র মিলিটারি

www.MurchOna.com

পুলিশরা টহল দিচ্ছে চারপাশে। পরিচ্ছদ ছাড়াও, এবার তাদের আচরণেও অসঙ্গতি লক্ষ করল রানা।

তাদের দাঁড়ানোর ঢিলে-ঢালা ভাব, অমার্জিত ভঙ্গিতে খসখস করে গা চুলকানো, চোখে-মুখে গাম্ভীর্যের অভাব ইত্যাদি একদমই মিলিটারি পুলিশের মর্যাদার সঙ্গে খাপ খায় না।

হঠাৎই ব্যাপারটা রানার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। থাই টং লিডার জিকো তানাই মহা পরাক্রমশালী আমেরিকাকে নিজের আস্তানাই শুধু ভাড়া দেয়নি, মিলিটারি পুলিশও সাপ্লাই দিয়েছে। সেজন্যই এরা সবাই চিনা। আসলে নিজের লোকদেরকেই ইউনিফর্ম পরিয়ে মিলিটারি পুলিশ বানিয়েছে সে।

তার মানে, থাই সরকার ও সামরিক বাহিনী এখনও এই ব্যাপারটার সঙ্গে জড়ায়নি। এখানে কী ঘটছে সে-সম্পর্কে হয়তো পরিষ্কার কোনও ধারণাও নেই তাদের।

এক জায়গায় দেখা গেল আর্মার্ড কার থেকে অ্যামিউনিশন নামানো হচ্ছে। ভ্যান গাড়ি থেকে আরও কিছু থাই সৈন্যও নামল। এদের পরিচ্ছদের হাল আরও খারাপ, আচরণ পাতি গুণ্ডাদের মত। নিজের অন্য কোনও আস্তানা থেকে আরও লোক আনাচ্ছে জিকো তানাই।

চওড়া কিচেন-টেন্ট থেকে মাংস ও মসলার সুবাস ভেসে আসছে।

রানওয়ের ধার ঘেঁষে উত্তরাকে হেঁটে আসতে দেখল রানা, দুশ্চিন্তায় মাথাটা নত হয়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে, টিসিআই-এর অপারেশন চিফ সত্যশুভ চুনাভান আর টিবিআই-এর লোকাল অফিসের হেড জুতনা মংকটের আস্থা অর্জন করতে পারেনি সে। তবে, মন্দের ভাল এই যে, এখনও তাকে বন্দি করা হয়নি।

পাশ কাটাবার সময় কোনও কথা হলো না, তবে চোখাচোখি হতে নীরবে একটা ইঙ্গিত করল রানা, যার অর্থ– সাহস হারাবে না, কাছেপিঠে থেকো।

রানাকে নিয়ে বড়সড় ব্যারাকে ফিরে এল মংকট। ভিতরটা তিন ভাগে আলাদা করা। ডানদিকে জিকো তানাইয়ের তালা দেওয়া অফিস কামরা। ওটার সামনে দুটো ডেস্ক ফেলা হয়েছে, সেগুলোয় বসে আছে লোকাল আই.বি-এর দুজন অপারেটর। একজন টেলিফোনে কথা বলছে, আরেকজন নোটবুকে কী যেন লিখছে। মংকটকে দেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে যাচ্ছিল তারা, ইশারায় নিষেধ করল সে।

বাম দিকে প্যাসেজ। সেটা ধরে হাঁটছে রানা, মাঝেমধ্যেই ওর পিঠে রাইফেলের নল দিয়ে গুঁতো মারছে মংকট। তার বোধহয় ধারণা, ক্ষমতার দাপট দেখানোর জন্য এর প্রয়োজন আছে।

সামনে খোলা দরজা, ভিতরে ঢুকল রানা।

'এটাই তোমার শেষ ঠিকানা, রানা,' বলল মংকট। 'এখান থেকে সরাসরি ভ-ভগবানের কাছে চলে যাবে।'

নিঃশব্দে হাসল রানা। জবাবে ঘোলাটে চোখ জোড়া থেকে ঘৃণা ছড়াল মংকট, বাইরে থেকে দড়াম করে বন্ধ করল কবাট, তারপর তালা মেরে দিল দরজায়।

কামরার ভিতরে একটাই কট, তাতে লম্বা হয়ে শুয়ে বাতাস শুঁকল রানা। হালকা পারফিউম ছাড়াও মেয়েলি একটা গন্ধ পাচ্ছে। উত্তরা আর মোহনাকে সম্ভবত এঘরেই আটকে রাখা হয়েছিল।

প্যাসেজ ধরে বুট জুতোর আওয়াজ এগিয়ে এল, থামল দরজার ঠিক বাইরে। ওকে পাহারা দেওয়ার জন্য গার্ড পাঠিয়েছে মংকট।

রানার সঙ্গে কিছুই নেই, জিকো তানাইয়ের অফিস কামরায় আছে সব–পিস্তল, ছুরি, রেডিও, ব্যাকপ্যাক। কাছে, তবু ওর নাগালের বাইরে।

পরিস্থিতি নিয়ে ভাবছে রানা। ডক্টর নাদিরাকে নিয়ে আসার

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

জন্য একটু পরেই দুরন্ত ঈগলে উঠবে টেকনিশিয়ানরা। এই হাটের কোনও কামরায় তালা দিয়ে রাখা হবে তাঁকেও, যেহেতু এখানেই রাখা হচ্ছে বন্দিদের।

কতক্ষণ? যতক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্য রানাকে ডাকা না হয়। ড্রাগসের প্রভাব দূর হতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে।

ইতিমধ্যে প্রতিবেশী কোনও দেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে থাইল্যান্ডে ঢুকে পড়বে চিনা সিক্রেট সার্ভিসের লোক। রানার ধারণা, কয়েকজন দক্ষ অপারেটর নিয়ে নিশ্চয়ই কোনও প্রতিবেশী দেশেই অপেক্ষা করছে ওর প্রিয় বন্ধু লিউ ফুচুং।

রানা আশা করছে, কোনও অঘটন না ঘটলে কাল ভোরের মধ্যে উপত্যকা ঘিরে পজিশন নেবে চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিস। তাদেরকে পথ দেখিয়ে ব্যান সপ দুর্গ এলাকায় নামিয়ে আনবে মোহনা আর মানস।

তবে তার আগে মূল কাজটা ওকেই সেরে ফেলতে হবে। আমেরিকানরা কোনওভাবে যদি বুঝতে পারে থাই টং-এর এই সুরক্ষিত আস্তানা আক্রান্ত হতে চলেছে, মেরে ফেলতে পারে ডক্টর নাদিরাকে। কাজেই হাতে সময় নেই উদ্ধার করতে হবে তাঁকে।

কীভাবে তা সম্ভব এখনও জানে না ও।

চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের আক্রমণ রক্তবন্যাও বইয়ে দিতে পারে। পাহাড়ের নীচে থাকলেও, রানওয়ের চারপাশে ট্রেঞ্চ কেটে রেখেছে থাই টং, গা ঢাকা দিয়ে পাল্টা গুলি করতে পারবে। চিনা অপারেটরদের সুবিধা একটাই– সারপ্রাইজ।

কট ছেড়ে নামল, হেঁটে এসে দাঁড়াল রানা গরাদ লাগানো জানালার সামনে। নির্দেশ ভোলেনি ভোলা, জানালার বাইরে মাটিতে ঘুমাচ্ছে জিভ বের করে।

'ভোলা!' চাপা গলায় ডাকল রানা। 'এই ভোলা!'

বড়সড় কুকুরটা মুখ তুলল, চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল জানালার দিকে। উঠে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দিল, হেঁটে চলে এল জানালার কাছে, লেজটা এদিক ওদিক নাড়ছে।

কামরার চারদিকে চোখ বুলাল রানা। কটের কাছে সরে এসে বালিশের কাভারটা খুলে গোল পাকাল, রশি জড়াল ওটার গায়ে, তারপর জানালার সামনে ফিরে এসে বাংলায় বলল, 'আমাকে চেনো তো? তোমার মালিক মানসের বন্ধু আমি। ছুঁড়ে দেয়া জিনিস কীভাবে তুলে আনতে হয়, মনে আছে তো?'

মাথাটা কাত করে কথাগুলো শুনল কুকুরটা, সামনের পা দুটো উঁচু করে জানালার গোবরাটে রাখল, তারপর গলা লম্বা করে মাথাটা ঢুকিয়ে দিল একজোড়া রডের মাঝখানে।

তার কান চুলকে দিল রানা, মাথায় হাত বুলাল, সবশেষে হাতে ধরা কাপড়ের গোল বলটা শুঁকতে দিল। তারপর বলটা জানালার বাইরে ছুঁড়ে দিল। 'আনো, ভোলা।'

বলটার পিছু নিল ভোলা। বলটা নিয়ে রানার কাছে ফিরে এল। ঘন ঘন লেজ নাড়ছে, গর্বে উঁচু হয়ে আছে মাথা।

'গুড বয়,' বলে আবার তার কান চুলকে দিল রানা।

সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে ভোলা, খুশি মনে লেজ নাড়ছে। এই সময় পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। মাথাটা জানালার একধারে সরিয়ে এনে দেখতে চেষ্টা করল রানা কে আসছে।

দৃষ্টিপথে চলে এল উত্তরা, এদিকেই আসছে সে, বারবার কাঁধের উপর দিয়ে পিছনদিকে তাকাচ্ছে।

'কী খবর, উত্তরা?' নিচু গলায় জানতে চাইল রানা।

জানালার সামনে এসে দাঁড়াল উত্তরা। 'রানা, আমার ওপর নজর রাখছে ওরা,' রুদ্ধশ্বাসে বলল, দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে নিল আশপাশে কেউ আছে কি না। 'এবার বলো, আমার কী...'

'প্রথম কাজ মাথা ঠাণ্ডা রাখা,' বলল রানা। 'ভাব দেখাও ওদের প্রতি সমর্থন আছে তোমার। তারপর চেষ্টা করে দেখো

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

এখান থেকে আমাকে বের করতে পার কি না।'

'কীভাবে? ঠিক কী চাইছ তুমি?'

প্রথমে ভোলার মাথায় হাত বুলাল রানা, তারপর চাপ দিয়ে বলল, 'সিট ডাউন, ভোলা।'

দু'বার চক্কর দিল ভোলা, তারপর শুয়ে চোখ বুজল।

উত্তরার দিকে তাকাল রানা। 'আমার ধারণা, থাই কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর ডিরেক্টর খোন কায়েন চাও পুরোপুরি অন্ধকারে আছেন। তাঁর অপারেশন্স চিফ সত্যশুভ চুনাভান বা লোকাল আই.বি-এর ভূমিকার কথা কিছুই জানেন না। ছুটিতে থাকলেও, হেডঅফিসের সঙ্গে নিশ্চয়ই যোগাযোগ রাখছেন তিনি। তুমি কোনও মেসেজ পাঠালে অবশ্যই পাবেন।'

'আমি মেসেজ পাঠাব?' অবাক হলো উত্তরা। 'কীভাবে?'

'আমার ব্যাকপ্যাকটা জিকো তানাইয়ের অফিসে আছে,' বলল রানা। 'ওটা যদি নিয়ে আসতে পার, আমার খুব কাজে লাগবে; তুমিও তোমার বস্‌কে মেসেজ পাঠাতে পারবে। ওটায় একটা রেডিও আছে।'

'কী জানি অফিসটায় ঢোকা সম্ভব কি না,' অনিশ্চিত দেখাল উত্তরাকে। 'ঠিক আছে, চেষ্টা তো করি।'

'ব্যাকপ্যাকটা নিয়ে এসো, আমি দেখিয়ে দেব কীভাবে ট্র্যান্সমিট করতে হবে।'

ষোলো

ধীরে ধীরে গড়াচ্ছে সময়। কড়া রোদে অ্যালুমিনিয়ামের ছাদ তেতে গরম তন্দুর হয়ে উঠল রানার কামরা।

ডক্টর নাদিরার কথা ভেবে দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওর, এখনও বন্দি হয়ে আছেন দুরন্ত ঈগলে। মাঝে-মধ্যে গরাদের ফাঁক দিয়ে কামরার ভিতর মাথা ঢোকাচ্ছে ভোলা– একঘেয়েমির শিকার, মনোযোগ আশা করছে। সেদিকে তাকিয়ে দু'একটা কথা বলছে রানা।

শেষ বিকেলের দিকে প্যাসেজে ভারী পদক্ষেপ কানে এল, যেন কিছু বয়ে নিয়ে আসছে কয়েকজন। একটা দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দ ভেসে এল। ধাতব ক্লিক আওয়াজ তুলে লেগে গেল তালা। পায়ের শব্দ প্যাসেজ ধরে চলে গেল আবার।

বোধহয় ডক্টর নাদিরাকে রেখে গেল।

আরও এক ঘণ্টা পর ওর খাবার দিল গার্ড। গরুর মাংস আর ছোলার ডাল দিয়ে রান্না করা খিচুড়ি। প্রচণ্ড খিদের কারণে খুব মজা লাগল জিভে, কিন্তু সব না খেয়ে অর্ধেকটা রেখে দিল ও।

নিজের খাওয়া শেষ হতে ভোলাকে ডেকে খাওয়াল।

সন্ধ্যার পর চারদিক ঢাকা পড়ে গেল কালো চাদরে। হঠাৎ জানালার বাইরে থেকে উত্তরার চাপা গলা ভেসে এল।

'রানা, ওটা আমি এনেছি!'

কট থেকে নেমে জানালার সামনে চলে এল রানা। রানওয়ে আর হ্যাঙ্গারের ওদিকে বেশ কয়েকটা ফ্লাডলাইট জ্বললেও ব্যারাকের পিছন দিকে তার আভা খুব কমই পৌঁছেছে। তবে আকৃতি দেখে উত্তরাকে চিনতে পারল ও।

আদর পাওয়ার জন্যই হোক, কিংবা রানার কাছাকাছি কাউকে আসতে দিতে চাইছে না বলে উত্তরার পাঁজরে দুই পা রেখে দাঁড়িয়েছে ভোলা।

'এ তো আমাকে যেতে দিচ্ছে না!'

'সিট ডাউন, ভোলা, সিট ডাউন!'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে ভোলা, কথা শুনছে না।

'ওখানে দাঁড়িয়েই মেসেজটা পাঠাতে পার তুমি,' বলল রানা। 'রেডিওটা আগে বের করো।'

ব্যাকপ্যাক খুলে রেডিওটা বের করল উত্তরা।

কীভাবে অন করতে হবে বলে দিল রানা। 'এবার বোতাম টিপে কোড দাও। ওয়ান, জিরো, ওয়ান...' বলে গেল রানা। 'এবার টিসিআই হেডকোয়ার্টারের ফ্রিকোয়েন্সিতে টিউন করে মেসেজটা পাঠাও।'

তিন মিনিট লাগল উত্তরার, উৎফুল কণ্ঠে বলল, 'বস্ নিজে রিসিভ করেছেন আমার মেসেজ! আমার রিপোর্ট শুনে বললেন...'

'কে ওখানে?' থাই ভাষায়, কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল কেউ।

চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল উত্তরা। একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল ব্যারাকের কোণে। ঠিক তখনই ওকে ছেড়ে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে গেল ভোলা লোকটার দিকে।

'কে?' ফিসফিস করল রানা।

'বোধহয় কোনও গার্ড...'

'ব্যাকপ্যাকটা জলদি দাও আমাকে...' বলল রানা।

ধুপ করে একটা শব্দ হলো। ঘাড়ে রাইফেলের বাঁটের বাড়ি খেয়ে কেঁউ করে উঠল ভোলা।

'সর্বনাশ!' লোকটা এদিকেই এগিয়ে আসছে দেখে ভয় পেয়ে গেল উত্তরা।

'কেটে পড়ো!' চাপা গলায় তাগাদা দিল রানা। 'তোমাকে যেন চিনতে না পারে!'

আবার গর্জে উঠল ভোলা। কব্জির হাড়ে দাঁত বসতেই এবার কেঁউ করে উঠল গার্ড।

এই সুযোগে রেডিও ও ব্যাকপ্যাক একটা ঝোপ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়েই ছুটল উত্তরা, মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

'কী হলো?' আরেকটা গলার আওয়াজ পেল রানা। বাজখাঁই।

'কুত্তার বাচ্চা...'

'কী?' এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ।

অবস্থা বেগতিক দেখে কব্জি ছেড়ে কয়েক লাফে মিলিয়ে গেল ভোলা অন্ধকারে।

জানালার কাছ থেকে সরে এসে কটে বসল রানা।

কিছুক্ষণ নিচুগলায় গুজুর গুজুর করল দুই গার্ড, তারপর এগিয়ে এসে দাঁড়াল জানালার সামনে। একজন আহত কব্জি চেপে ধরে অন্ধকার কামরার ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করছে।

'কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল?' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জানতে চাইল অপরজন।

'মর্কট না কী যেন নাম, তার সঙ্গে ,' বলল রানা।

'যেন মনে হলো একটা মেয়েলোক দেখলাম?'

'মর্কটের সঙ্গে ছিল,' বলল রানা।

আর কিছু না বলে চলে গেল গার্ড দুজন। রানা ভাবল, নিশ্চয়ই নিরাপদ দূরত্ব থেকে ওদের চলে যাওয়া দেখছে উত্তরা। ব্যাকপ্যাকটা ওর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই ফিরে আসবে একটু পরেই।

কিন্তু বিশ মিনিট অপেক্ষা করবার পরও এল না উত্তরা।

'ভোলা!' ডাকল রানা।

সাড়া নেই।

আবার ডাকতেই লেজ নাড়তে নাড়তে জানালার গোবরাটে পা তুলল মানসের প্রিয় ডোবারম্যান পিনশার।

কাপড়ের তৈরি বলটা ঝোপ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল রানা। বলল, 'আনো!'

ব্যগ্র ভঙ্গিতে ছুটে গিয়ে বলটা নিয়ে এল ভোলা। তার মাথা

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

চুলকে দিল রানা।

হাত খালি, কাল্পনিক একটা বল ছুঁড়ল এবার ও, সেই একই ঝোপ লক্ষ্য করে। 'আনো!'

মাথাটা কাত করল ভোলা, প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে পালা করে ঝোপ আর রানার দিকে তাকাচ্ছে।

কুকুরের মাথাটা ঠেলে জানালার বাইরে বের করে দিল রানা। 'আনো!'

কুকুরটা বোকা নয়, অনিশ্চয়তায় ভুগছে। মানুষের গন্ধ আছে এমন জিনিস ওই ঝোপের ভিতর একটা নয়, দুটো– রেডিও আর ব্যাকপ্যাক। হেঁটে গিয়ে দুটোই শুঁকল সে।

'আনো!'

লেজ নাড়ল ভোলা, ঝাঁপিয়ে পড়ে শক্তিশালী চোয়ালে ব্যাকপ্যাক আটকাল, তারপর গর্বিত ভঙ্গিতে রানার কাছে বয়ে নিয়ে এল।

ওটা নিয়ে ভোলাকে আদর করল রানা। সুযোগ পেয়ে চট্ করে ওর গালটা চেটে দিল ডোবারম্যান।

'আনো!' বলল রানা আবার।

বসে পড়ল ভোলা, লম্বা জিভ বের করে হ্যাহ্ হ্যাহ্ করছে। একটা উপকার করে দিতে পেরে খুশি হয়েছে খুব।

'আনো!'

নড়ে না ভোলা। পরবর্তী পনেরো মিনিট চেষ্টা করেও রেডিওটা আনাতে পারল না রানা।

হতাশ হয়ে বিছানায় ফিরে এসে ব্যাগটা হাতড়াল ও। রেডিও আর অস্ত্র নেই ভিতরে, তবে বাকি সব ঠিক আছে। খড় দিয়ে তৈরি গদির নীচে গুঁজে রাখল ব্যাগ।

এবার আড়মোড়া ভেঙে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজল রানা। কয়েকটা দিন খুব ধকল যাচ্ছে, উত্তেজিত হয়ে আছে নার্ভগুলো। মিশনটাও পৌঁছে যাচ্ছে পরিণতির দিকে।

কাল সকালে জানতে পারবে এত সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করা ওর প্ল্যান সফল হবে, নাকি পা-চাটাদের সাহায্য নিয়ে জিতে যাবে প্রতিদ্বন্দ্বী অশুভ শক্তি।

আকাশ তখনও অন্ধকার, রানার দেহঘড়িতে অ্যালার্ম বেজে উঠল। শান্ত কামরার ভিতর ঘুম ভেঙেছে। কান পাতল ও।

ঝিঁঝি ডাকছে। পাখিগুলোও কিচিরমিচির শুরু করতে যাচ্ছে। জানাচ্ছে, ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই।

তালা দেওয়া দরজার বাইরে করিডরের মেঝেতে পা ঠুকে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করছে নাইট গার্ড, রাতের এই সময়টাই সবচেয়ে সুনসান।

দূরে কোথাও ভেড়ার গলায় বাঁধা ঘণ্টি বেজে উঠল, ভোর হওয়ার আগেই ওগুলোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে রাখাল।

বিছানায় উঠে বসে নিজের কাজ শুরু করল রানা।

প্রথমে স্ট্রাইয়েটেড টেপ জড়াল জানালার গরাদে, প্রতিটি লোহার রডের আগা ও গোড়ার চারপাশে। টেপের উপর নখের চাপ দিল রানা। চচ্চড় করে মৃদু একটা শব্দ হলো, সঙ্গে সঙ্গে বাতাস ভরে উঠল ওযন-এর ঝাঁঝালো গন্ধে।

জানালার রডগুলো খুলে নিয়ে বিছানার নীচে ঢুকিয়ে রাখল রানা। সূর্য ওঠার আভাস দিয়ে পুব দিগন্ত মাত্র ফরসা হতে শুরু করেছে। টেপটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে ব্যাকপ্যাক পিঠে ঝোলাল ও, তারপর শান্ত পায়ে দরজার কাছে হেঁটে এসে নক করল কবাটে।

'এই, কে! কী চাই?' হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় চমকে উঠে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল গার্ড, ভয় পাচ্ছে প্যাসেজের দু'পাশে যারা ঘুমাচ্ছে তাদের না ঘুম ভেঙে যায়।

'ল্যাট্রিন,' বলল রানা।

এ এমন একটা অনুরোধ, থাই গুণ্ডা ঠিকই বুঝবে। না

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

বোঝার ভান করেও কোনও লাভ নেই, কারণ কামরার ভিতর জরুরি পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে পরিষ্কার করবার দায়িত্বটা চাপবে তারই ঘাড়ে।

দরজা খুলে গেল।

কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা। প্যাসেজ খালি। দু'পাশের কয়েকটা কামরায় জিকো তানাইয়ের ডান ও বাম হাত ঘুমাচ্ছে, নাক ডাকার আওয়াজ ভেসে আসছে সেগুলো থেকে।

'তোমার সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো?' কৃত্রিম উদ্বেগের সঙ্গে ঘুমকাতুরে গার্ডকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'অস্ত্র লোড করা, যে-কোনও পরিস্থিতির জন্যে রেডি তুমি?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাতের রাইফেলটা একবার দেখে নিল লোকটা। নিজেকে জাগিয়ে রাখতে এত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে, তার মাথায় অন্য কিছু খেলছে না। মুহূর্তের এই বিভ্রান্তিই দরকার ছিল রানার।

হাতের কিনারা দিয়ে ঘাড়ের পাশে যে কোপটা মারল ও, গার্ডের মনে হলো নিশ্চয়ই বজ্রপাত হয়েছে ওখানে। রাইফেল ছেড়ে দিল সে, মেঝেতে পড়ার আগেই খপ্ করে ধরে ফেলল সেটা রানা।

আঘাতটা সামলে নিয়ে ঘুসি পাকাল গার্ড, তেড়ে এল রানার দিকে। মাথা সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল রানা, নকের পাশে লেগে পিছলে গেল ঘুসিটা।

লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ায় ভারসাম্য হারাল প্রতিপক্ষ। সাহায্য করার ভঙ্গিতে তাকে ধরে ঘোরাল রানা, পেশল বাহু জড়াল গলার চারধারে, তারপর উপর দিকে ঝাঁকি দিল একবার।

শ্বাস-প্রশ্বাস থেমে গেল, বন্ধ হয়ে গেল মগজের সব কাজ। আর খেলবে না সেটা।

মেঝে থেকে তুলল তাকে রানা, নিঃশব্দে বয়ে নিয়ে এল কামরার ভিতর। দেয়ালের দিকে মুখ করে কটে শোয়াল তাকে, চাদর দিয়ে ঢাকল শরীরটা– যেই দরজা খুলুক, শুধু ঘুমন্ত একজন লোককে দেখতে পাবে।

প্যাসেজে বেরিয়ে এসে নির্দিষ্ট একটা দরজার সামনে থামল রানা, ওর ধারণা কাল রাতে এই কামরাতেই বয়ে নিয়ে আসা হয়েছে ডক্টর নাদিরাকে।

দরজায় তালা দেওয়া। টুথপিকটা বের করে কী-হোলে ঢোকাল ও। একটু পরেই ক্লিক করে আওয়াজের সঙ্গে খুলে গেল তালা। কবাট ফাঁক করে ভিতরে ঢুকল রানা।

ওর কামরার মত, এখানেও ফার্নিচার বলতে শুধু একটা কট। ডক্টর নাদিরার ছোটখাট শরীর ওটার কিনারায় কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। তাঁর কাঁধে হাত রেখে ফিসফিস করল ও, 'ডক্টর নাদিরা? আমি রানা।'

'ওহ্!' ভয় মেশানো তীক্ষ্ণ আওয়াজ বেরুল বিজ্ঞানীর গলা থেকে।

'চুপচাপ থাকতে হবে, প্লিজ,' জরুরি আবেদনের সুরে বলল রানা। 'তা না হলে আপনাকে অজ্ঞান করতে বাধ্য হব আমি। এবার আর কোনও ঝুঁকি নেয়া যাবে না।'

ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি, যেন ধাঁধায় পড়ে গেছেন। নরম হাতে বিছানায় উঠে বসতে সাহায্য করল রানা তাঁকে।

ভদ্রমহিলা অত্যন্ত সাহসী। চিন্তাশক্তি ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করলেন। টলমল করছেন, তবে নিজেই বিছানা থেকে মেঝেতে নামতে গেলেন। 'তুমি... আজ এসেছিলে, নাকি স্বপ্ন...?' স্মরণ করতে পারছেন না।

'কাল।' পড়ে যাচ্ছেন দেখে তাঁকে ধরে ফেলল রানা, দু'হাতের মাঝখানে তুলে নিয়ে কামরার আরেক দিকে চলে যাচ্ছে। 'মনে পড়ে?'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

'হ্যাঁ... বোধহয়।'

দরজা খুলে তাঁকে নিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা, তারপর কয়েক পা এগিয়ে ঢুকে পড়ল নিজের কামরায়। ওখানে তাঁকে দাঁড় করিয়ে রেখে প্যাসেজে বেরুল আবার, তাঁর কামরার দরজাটা বন্ধ করে দিল।

নিজের কামরায় ফিরে এসে দরজা লাগাল রানা, ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, মেঝেতে বসে পড়েছেন ডক্টর নাদিরা, ভারী নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করে কী সব বলছেন।

'আসুন,' বলল ও। 'আপনি পালাচ্ছেন।'

'সত্যি?' অস্ফুটে জানতে চাইলেন বিজ্ঞানী।

আবার তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল রানা, জানালার সামনে চলে এল। 'প্রথমে আপনাকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করব,' ব্যাখ্যা করল ও। 'আপনি জানালার পাশে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। আপনার ঠিক পেছনেই থাকব আমি।'

প্রথমে ডক্টর নাদিরার পা দুটো জানালার বাইরে বের করে দিল রানা। তাঁর মাথার উপর দিয়ে দেখতে পেল, হালকা গোলাপি রঙ ধরতে শুরু করেছে পুবের আকাশ।

ঘুমন্ত উপত্যকায় একটু পরেই শুরু হয়ে যাবে মরণ পণ লড়াই। তিন অক্ষরের এই শব্দটা আজও কত প্রাণ কেড়ে নেবে, কে জানে। রানা আশা করছে, চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের অপারেটররা এরইমধ্যে থাই টং-এর শক্ত ঘাঁটিটা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।

সকাল হচ্ছে, এখন তারা চুপিসারে এগোবে, কাজে লাগাবে স্যাবটাজের প্রতিটি সুযোগ। তারপর শুরু হবে বন্দুকযুদ্ধ। সবশেষে আনআর্মড কমব্যাট। এভাবেই প্ল্যানটা তৈরি করেছে ও।

চিনা বন্ধুরা যখন ব্যস্ত রাখবে টং গার্ড আর শ্বেতাঙ্গ কমান্ডোদের, নিজের টিম নিয়ে প্লেনটা দখল করবে রানা। ওর টিম বলতে নিজেকে ছাড়া আরও তিনজন– মানস, উত্তরা ও মোহনা। যে-কোনও মুহূর্তে ওদেরকে দেখতে পাবে বলে আশা করছে ও।

বন্দুকযুদ্ধ, জিম্মি, ছুটোছুটি আর বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে ডক্টর নাদিরাকে নিয়ে প্লেনে ওঠার পথ করে নেবে ওরা।

ফুচুংকে বলা হয়েছে, রানওয়ে পরিষ্কার করবার দায়িত্বটাও তাদেরকেই নিতে হবে, প্লেনটা যাতে নিরাপদে আকাশে উঠে যেতে পারে।

কাজের সহজ একটা সিরিজ, তবে যে-কোনও পয়েন্টে কেঁচে যেতে পারে। সবই এখন অনিশ্চিত।

'এই ছেলে বলছে আমি পালাচ্ছি,' বিড়বিড় করলেন ডক্টর নাদিরা। 'পালাচ্ছি পায়ে হেঁটে...সত্যি বলতে কী, আসলে ওর কোলে চড়ে।'

'আপনাকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে,' বলল রানা। ডক্টর নাদিরা নীচের মাটিতে পা রাখবার চেষ্টা করছেন, তাঁকে সাহায্য করছে ও। 'আপনার ডেভেলাপ করা দুরন্ত ঈগলে চড়েই বেইজিঙে যাচ্ছি আমরা।'

'চিনে কেন?' সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলেন ডক্টর নাদিরা। 'বাংলাদেশে নয় কেন? দুরন্তকে নিয়ে এখনও কিছু কাজ বাকি আছে আমার...'

'চিনে যাচ্ছি নিরাপত্তার খাতিরে,' বলল রানা। 'ওরা আপনার জন্যে সব রকম ফ্যাসিলিটির ব্যবস্থা করে রেখেছে, যখন খুশি আবার কাজ শুরু করতে পারবেন।' জানালার গোবরাটে উঠল ও।

চোখ তুলে ভাল করে রানাকে দেখলেন ডক্টর নাদিরা। মুখে কদিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথাভর্তি এলোমেলো চুল, সাদা পপলিনের শার্টের উপর ছাই রঙা জ্যাকেট, কোমরে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

সাদাটে জিনস। 'গুড, ভেরি গুড,' আয়োজন সম্পর্কে মন্তব্য করলেন তিনি। 'অ্যান্ড ভেরি স্মার্ট, ইনডিড!' শেষটুকু প্রশংসা।

গোবরাট থেকে নামছে রানা।

হঠাৎ করে জেগে উঠল ভোলা। বিস্মিত কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেল ডক্টর নাদিরাকে। অচেনা মানুষ, আগন্তুক।

ঘেউ করে ডেকে উঠল ডোবারম্যান।

'ভোলা!' কড়া সুরে ধমক দিল রানা, মাটিতে নেমে ঘুরে দাঁড়াল। 'চুপ!'

রানাকে লক্ষই করছে না কুকুরটা, তার দৃষ্টি বিঁধে আছে দেয়ালে পিঠ সাঁটিয়ে দাঁড়ানো ডক্টর নাদিরার উপর। থরথর করে কাঁপছেন তিনি।

পিলে চমকানো শব্দে ঘেউ করে উঠল ভোলা, তাঁকে লক্ষ্য করে লাফ দিল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে রক্ত ছলকানো একটা চিৎকার দিলেন ডক্টর নাদিরা, হাত দুটো গলায় উঠে গেছে, চেষ্টা করছেন দেয়ালে মুখ গুঁজে দেওয়ার।

ঝট্ করে হাত বাড়িয়ে ভোলার কলারটা ধরে ফেলল রানা। বাধা পেয়ে আবার গর্জে উঠল শক্তিশালী কুকুরটা। ডক্টর নাদিরার নার্ভে চোট লেগেছে, আরও জোরে চিৎকার করছেন তিনি।

প্রথমে প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড হাটগুলো থেকে হইচই শুরু করল লোকজন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রানওয়ের দু'পাশে ফেলা তাঁবুর ওদিক থেকে হাঁক-ডাক ভেসে এল। তারপর দূর থেকে ভেসে এল ঠুস-ঠাস গুলির শব্দ। কী হচ্ছে বুঝতে না পেরে নিশ্চয়ই কোনও গার্ড ফাঁকা গুলি শুরু করেছে।

কিন্তু না, একজন নয়, কয়েকজন... বহু লোক...চারদিক থেকে...

হঠাৎ রানা উপলব্ধি করল, কুকুরের গর্জন আর ডক্টর নাদিরার চিৎকারের সঙ্গে আসলে লোকজনের হইচই আর গুলিবর্ষণের কোনও সম্পর্ক নেই।

থাই টং-এর বিশাল আস্তানার চারদিক হঠাৎ করে যেন একসঙ্গে জেগে উঠছে। কেউ বোধহয় এখনও পরিষ্কারভাবে জানে না কী হচ্ছে। রানার ধারণা, ও জানে।

তবে ওর জন্যও অপেক্ষা করছে বিস্ময়।

'ধুস্ শালা!' রাগে ও হতাশায় অসহায় বোধ করছে রানা। 'ভোলার বাচ্চা, চুপ!'

অনেক দেরি হয়ে গেছে, তবে কুকুরটা থামল, ক্ষমা পাওয়ার আশায় রানার হাত চাটছে। দেয়ালে ঘষা খেয়ে মাটিতে বসে পড়লেন ডক্টর নাদিরা, ফোঁপাচ্ছেন।

হইচই আর হাঁক-ডাক আরও বাড়ছে। নতুন মাত্রা যোগ হলো– আর্তনাদ! চারদিক থেকে ভেসে আসছে আহত লোকজনের কাতরানি।

শুধু গুলি নয়, এবার পাল্টা গুলিও শুরু হয়ে গেল।

একদল আমেরিকান কমান্ডো কুইক মার্চ করে হ্যাঙ্গারের দিকে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন চিৎকার শুরু করল: 'কমান্ডার ডুগার্ড ম্যাকমোহন, সার! আমরা আক্রান্ত হয়েছি! চারদিক থেকে...'

দেড়-দুশো জোড়া বুট জুতোর আওয়াজ আরও কাছে চলে আসায় বাকিটা আর শোনা গেল না।

'আসুন!' ডক্টর নাদিরাকে কাঁধে তুলে নিল রানা। ঠিক সেই মুহূর্তে গরাদবিহীন জানালা দিয়ে প্রথমে বাইরে মাথা বের করল জুতনা মংকট, তারপর বেরোল তার পিস্তল ধরা হাতটা। রানাকে দেখামাত্র গুলি করল সে। তার আগেই দৌড় দিয়েছে রানা। ছুটতে ছুটতে কয়েকটা গাছের পিছনে চলে গেল।

গাছগুলোর আড়াল পেয়ে সতর্কতার সঙ্গে বেশ কিছুটা এগোল রানা। বাঁক ঘুরল দু'বার, একটা খালি তাঁবুর পিছনে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

থেমে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করছে।

চারদিক থেকে পিছু হটে নিজেদের তাঁবুর কাছে ফিরে আসছে সশস্ত্র টং বন্দুকবাজরা। প্রত্যেকের চোখে-মুখে আতংক। তাদের মধ্যে থেকে একজন বলল, 'আউটসাইড পেরিমিটারে একজন গার্ডও বেঁচে নেই!'

আরেকজন বলল, 'এইমাত্র আহত একজন গার্ড রেডিওতে জানাল, নদীর ঘাটে থাই সোলজার গিজগিজ করছে। ট্রাকের একটা কনভয় নিয়ে আসছে তারা।'

মিলিটারি পুলিশের কয়েক সারি তাঁবুর বাইরে আশ্চর্য এক কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। প্রায় দেড়-দুশো নকল মিলিটারি পুলিশ কে কোন্‌দিকে যুদ্ধ করতে যাবে সেই নির্দেশ পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল, থাই সৈন্যের কনভয় আসছে শুনে হঠাৎ তারা যে যার ইউনিফর্ম খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। স্বচক্ষে না দেখলে কাউকে বিশ্বাস করানো মুশকিল যে, অতগুলো লোক কে কার আগে উলঙ্গ হবে তারই প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে!

রানা ধারণা করল, উত্তরার মেসেজে কাজ হয়েছে– নিশ্চয় থাই ইন্টেলিজেন্স চিফের অনুরোধেই মিলিটারি পাঠাচ্ছে থাই সরকার। শাস্তির মাত্রা কম হওয়ার আশায় টং গুণ্ডারা ইউনিফর্ম খুলে ফেলছে।

রানার পিছনে, পাহাড়ি ঢালের উপর, আই.বি লোকাল এজেন্টদের কয়েকটা লাশ পড়ে রয়েছে। দূরে, রানওয়ের উপর, ট্রেসার বুলেট ছুটোছুটি করছে। ওখানে চিনা সিক্রেট সার্ভিসের অপারেটরদের সঙ্গে থাই টং ও আই.বি লোকাল এজেন্টদের তুমুল লড়াই হচ্ছে। রানা দেখল, রানওয়ের একটা অংশ এরইমধ্যে পরিষ্কার করা হয়ে গেছে, এমনকী রানওয়ের পাশে যে তাঁবুগুলো ছিল সেগুলোতেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওখানে যাতে কেউ লুকিয়ে থাকতে না পারে।

দুরন্ত ঈগলে উঠতে হলে কাঁটাতারের বেড়া টপকে হ্যাঙ্গারটার সামনে যেতে হবে রানাকে। কীভাবে তা সম্ভব ভাবছে ও।

'রানা? মাসুদ রানা?' ওর কাঁধ থেকে ডাকলেন ডক্টর নাদিরা। 'তুমি বাপু আমাকে এবার মাটিতে নামাবে নাকি?'

ভদ্রমহিলার কাঁপুনি থেমেছে, তবে রানাকে এখন দ্রুত এগোতে হবে। বোঝাটা কাঁধে অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে বলল, 'একটু পরে।'

পা চালিয়ে এগোল রানা। আরও দুটো তাঁবুর মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে এসে এগোচ্ছে সাতটনী একটা ট্রাকের দিকে। ওর গলাটা শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরেছেন বিজ্ঞানী। ট্রাকের পিছনের চাকার পাশে তাঁকে নামাল ও, বলল, 'এখানে অপেক্ষা করুন, কোথাও যাবেন না।'

'এক চুল নড়ব না,' বললেন তিনি। 'ভাল কথা, ধন্যবাদ। এরইমধ্যে যা করেছ, এরচেয়ে বেশি কিছু কারও কাছ থেকে আশা করা যায় না।'

তাঁর কথায় কান নেই রানার, মাটিতে শুয়ে ক্রল শুরু করল। ট্রাকের তলায় ঢুকে সাবধানে এগোচ্ছে ও, ওর টার্গেট একজোড়া পা।

সাদা জুতো জোড়া চেনে রানা।

'আমি জা-জানি আশপাশেই কোথাও আছে বেজন্মা কু-কুত্তাটা!' রাগে হিসহিস করে উঠল মংকট। 'তাকে আ-আমি চাই। যেভাবে হোক খুঁজে বের ক-করো!'

তিন জোড়া পা তিনদিকে ছুটল।

'এ-এখানে আমি অ-অপেক্ষা ক-করব!' যত খেপছে ততই বেশি তোতলাচ্ছে মংকট।

দশ পর্যন্ত গুণল রানা, হাত দুটো পরস্পরের সঙ্গে ঘষল, তারপর মংকটের গোড়ালি ধরে হ্যাঁচকা টান দিল।

ধুলোর মেঘ উড়িয়ে আছাড় খেল লোকাল আই.বি হেড।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

চিৎকার করবার সময় পেল না, প্রচণ্ড শক্তিতে ট্রাকের নীচে টেনে নিল তাকে রানা।

পা ছুঁড়ল মংকট, তবে কোথাও লাগাতে পারল না। তারপর শরীরটাকে ধনুকের মত বাঁকিয়ে মোক্ষম একটা ঘুসি চালাল রানার চোয়াল লক্ষ্য করে।

ঝিন ঝিন করছে মাথার ভিতরটা, বমি পাচ্ছে, তারপরও খালি হাতটা দিয়ে মংকটের চোয়াল গুঁড়িয়ে দিল রানা।

মাথা ঝাঁকাল মংকট। অত্যন্ত কঠিন পাত্র, রাগে চোখ দুটো জ্বলছে তার।

দুজনেই পাশ ফিরে শুয়ে আছে ওরা, প্রত্যেকের মাত্র একটা করে হাত মুক্ত।

হঠাৎ সাপের মত ছোবল মারল রানা। মংকটের গলার কাছে শার্টের কলার চেপে ধরেছে। জবাবে রানার চোখে আঙুল ঢোকাবার চেষ্টা করল মংকট। মাথাটা সরিয়ে নিয়ে চোখ বাঁচাল রানা, তারপর নিতম্ব আর কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে মুঠোয় ধরা কলারটায় ঝাঁকি দিল। মংকটের মাথাটা সবেগে বাড়ি খেল ট্রাকের অ্যাক্সেল-এ।

শরীরের পাশে স্থির হয়ে গেল মংকটের হাত। চোখ দুটো বিরাট হয়ে উঠেছে। থেঁতলানো মুখের কয়েক জায়গা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। 'শি-শিট!' গালি দিল সে।

'সব দিন এক রকম যায় না,' মন্তব্য করল রানা, পরমুহূর্তে তার ভাঙা চোয়ালে প্রচণ্ড গুঁতো মারল ভাঁজ করা হাতের কনুই দিয়ে।

গুঙিয়ে উঠে জ্ঞান হারাল মংকট। তার উপর দিয়ে ক্রল করে ট্রাকের তলা থেকে বেরিয়ে এল রানা, ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা। তার একে-ফোরটিসেভেনটা তুলে নিল মাটি থেকে। ক্রল করে আবার ঢুকল ট্রাকের তলায়, চলে এল ডক্টর নাদিরার পাশে।

নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ট্রাকের নীচে লুকিয়েছেন তিনি।

'এবার আমরা আপনার দুরন্ত ঈগলে পৌঁছাবার চেষ্টা করব,' বলল রানা। ট্রাকের তলা থেকে বেরুতে সাহায্য করল তাঁকে।

ডক্টর নাদিরাকে ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা। তারপর হঠাৎ কান পাতল। দেখল– ও একা নয়, ওর মত আরও দু'চারজন কী যেন শোনার চেষ্টা করছে।

বাতাসে কীসের যেন কম্পন। তারপর গুরু-গম্ভীর একটা আওয়াজ, যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। আকাশে চোখ বুলাল রানা। পরিষ্কার আকাশ, একটা চিল পর্যন্ত নেই কোথাও।

কয়েক সেকেন্ড পর কালো মেঘের মত কী যেন দেখা গেল এক কোণে। না, চারকোণেই। আর, মেঘও নয়। কালো রঙ করা হেলিকপ্টার গানশিপ, ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসছে, ঢেকে দিচ্ছে উপত্যকার গোটা আকাশ।

পরমুহূর্তে গোটা উপত্যকা সনিক বুম-এ কেঁপে উঠল। চিনে তৈরি এক ঝাঁক জেট ফাইটার ছুটে গেল মাথার উপর দিয়ে।

হেলিকপ্টার গানশিপগুলোকে ভাল করে দেখবার জন্য ট্রাকের আড়াল থেকে বেরুতে যাচ্ছে রানা। কোণটা মাত্র ঘুরেছে, দেখল, পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের একটা টিমের সামনে পড়ে গেছে। মানসকে সামনে নিয়ে ওর দিকেই এগিয়ে আসছে খুনিরা। তাদের অন্তত একজনকে চিনতে পারল ও।

তবে রানাকে দেখতে পায়নি তারা, চেষ্টা করলে এখনও বোধহয় পিছিয়ে ট্রাকের আড়ালে ফিরে আসা যায়।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

সতেরো

পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর টিমে চারজন এজেন্ট রয়েছে। তাদের মাঝখানে অতি নগণ্য ও নিষ্প্রভ একটা চরিত্র হিসাবে দেখা যাচ্ছে মানস ঘোষকে।

মোহনাকে নিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে নামবার সময় পিসিআই-এর হাতে বন্দি হয়েছে মানস। মোহনাও ধরা পড়ত, ভাগ্যক্রমে সে অনেকটা পিছনে ছিল বলে বেঁচে গেছে।

ধরা পড়বার পর পাকিস্তানী এজেন্টরা তাকে নির্দেশ দিয়েছে, হয় পথ দেখিয়ে দুরন্ত ঈগলের কাছে নিয়ে চলো আমাদেরকে, নয়তো দেখিয়ে দাও মাসুদ রানা কোথায় আছে। তাদের ধারণা, রানা জানে কীভাবে ঈগলের কাছে পৌঁছানো যাবে, কাজেই তাকে ধরতে পারলেই তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়।

তাদের হুকুম মত কাজ না করলে মানসকে এই মুহূর্তে মেরে ফেলা হবে, জানিয়ে দিয়েছে পিসিআই এজেন্টরা।

প্রাণ বাঁচানো ফরজ, তাই মানস ওদেরকে বলেছে, মাসুদ রানাকে কোথায় পাওয়া যাবে সে জানে, সেখানে নিয়ে গিয়ে হাত তুলে দেখিয়ে দেবে তাকে।

পাকিস্তানী এজেন্টরাও কথা দিয়েছে বিনিময়ে ইন্ডিয়ান শত্রু ও কাফের হওয়া সত্ত্বেও মানসকে ওরা ছেড়ে দেবে। যদিও পাকিস্তানীরা কথা রাখবে কি না সে-ব্যাপারে প্রবল সন্দেহ আছে মানসের।

পাহাড়ের ঢালে টং সেন্ট্রিদের মেরে সাফ করে ফেলেছে চিনা সিক্রেট সার্ভিসের অপারেটররা, সেই সুযোগে সরু ট্রেইল ধরে নীচে নেমে এসেছে পিসিআই এজেন্টরা। সে-ও প্রায় আধ ঘণ্টা হতে চলল।

'কোথায় মাসুদ রানা?' খুনিদের একজন জানতে চাইল। 'তুমি আমাদেরকে শুধু শুধু চক্কর খাওয়াচ্ছ নাকি? এই জায়গা দিয়ে খানিক আগেও গেছি আমরা...'

'এই তো, এদিকেই কোথাও আছে সে,' বলল মানস।

'কোথাও আছে কথাটার মানে কী?' স্কোয়াড লিডার জানতে চাইল। 'পরিষ্কার আলাপ হয়নি, ঠিক কোথায় তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে?'

'তা তো হয়েছেই,' বলল মানস। 'কিন্তু...'

ওদের ডানদিকে কয়েকটা সাত ও পাঁচটনী ট্রাক দেখা যাচ্ছে। কেউ লুকিয়ে আছে কি না দেখবার জন্য সেগুলোর দিকে এগোল ওরা।

পাহাড়ের ঢালের উপর চোখ পড়তে থেমে গেল মানস। দুশো ফুট উপরে থাকলেও, বাদামি রঙের সুট দেখে লোকগুলোকে চিনতে কোনও অসুবিধে হলো না ওর। তাদের সঙ্গে রয়েছে, এমন কয়েকজনের ইউনিফর্মও ওর পরিচিত– ভারতীয় টিম।

টিমের সবাই চোখে বিনকিউলার তুলে দেখছে তাকে। তাদের একজন ওকে আশ্বস্ত করবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মানস। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সামনে তাকাল ও। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল ভূত দেখার মত।

ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা।

একটা পাঁচটনী ট্রাকের পিছন থেকে বেরিয়ে এল রানা। প্রথমে ডানে, তারপর বামে তাকাল। ওর মুখে কদিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় এলোমেলো একরাশ চুল, সাদা পপলিনের শার্টের উপর ছাই রঙা জ্যাকেট, কোমরে সাদাটে জিনস।

মানসের চোখে যেন একটা অপার্থিব আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। ইশারায় পিসিআই এজেন্টদের দেখাল। 'ওই তো,' ফিসফিস করল ও। 'মাসুদ রানা।'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ ফুট দূরে রানা। চারজন লোকের মাঝখানে মানসকে দেখামাত্র তার বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল ও। ওরা যে পিসিআই এজেন্ট, তা আর বুঝতে বাকি থাকল না ওর।

মানসের দিকে একটা হাত তুলল রানা, যেন নিজের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে।

ওদিকে পিসিআই এজেন্টরা যে যার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করছে।

এরপর ঠিক বোঝা গেল না কীভাবে কী হলো। হঠাৎ আগুন ধরে গেল মানসের দু'পাশে দাঁড়ানো পিসিআই এজেন্টদের কাপড়ে। আগুন ছড়াতে যে সময় লাগে, এখানে তা লাগল না। প্রত্যেকের পুরোটা শরীর একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে। তাদের বিস্ময় ও আতংকিত আর্তচিৎকারে ভারী হয়ে উঠল আশপাশের বাতাস। হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে আগুন নেভাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল তারা। দু'একজন পরনের কিছু কাপড় খুলে ফেলতেও পারল। কিন্তু নতুন করে আগুন লাগল সেখানে, কাপড়ের বদলে গায়ের চামড়ায়!

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, মানস সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায়, হাসতে হাসতে হেঁটে আসছে রানার দিকে, আগুনের একটা শিখাও ওকে স্পর্শ করেনি। ওর হাতে একটা পিস্তল রয়েছে, এই মাত্র মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে।

সোজা হেঁটে এসে রানার সামনে দাঁড়াল মানস। তার ঠোঁটে বিষণ্ন এক চিলতে হাসি। হাতের পিস্তলটা ঝট করে তুলে রানার কপালে ঠেকাল সে, তারপর ওকে কোনও সময় না দিয়ে টিপে দিল ট্রিগার।

রানার মাথাটা মুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো। লাশটা পড়ে যাচ্ছে, লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল মানস। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে পাহাড়ের দিকে তাকাল।

ভারতীয় টেকনিকাল টিমকে হঠাৎ করে অস্থির হয়ে উঠতে দেখল মানস। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে আসছে তারা।

তবে চিনা সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা তাদের পিছু নিয়েছে।

ব্যান সপ দুর্গের মাথায়, রানওয়ের পাশের খোলা মাঠে, আর হ্যাঙ্গারের দু'পাশে একে একে ল্যান্ড করছে চিনা এয়ারফোর্স-এর হেলিকপ্টার গানশিপ। পাইলটরা খুব সাবধানী, কেউ তাড়াহুড়ো করছে না।

ফাইটার জেটগুলো এখনও চক্কর দিচ্ছে আকাশে, সাউন্ড ব্যারিয়ার ভেদ করবার সময় কান ফাটানো আওয়াজ করছে মাঝে-মধ্যেই।

এবার উপত্যকার মাথায় উড়ে এল বেশ কয়েকটা পেটমোটা ট্রুপস ক্যারিয়ার। পরিষ্কার আকাশের গায়ে কালো বিন্দুর মত লাগছে চিনা ছত্রিসেনাদের, ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসছে ট্রুপস ক্যারিয়ারের পিছন থেকে। উপত্যকার সব জায়গায় নেমে আসছে প্যারাশুটগুলো, চাইনিজ কমান্ডোদের হাতে চাইনিজ স্টেন ও মেশিন-পিস্তল।

হঠাৎ লাউডস্পিকার থেকে একটা ঘোষণা ভেসে এল। ভাষাটা চিনা আর যান্ত্রিক, তবে কণ্ঠস্বরে কর্তৃত্ব ও দৃঢ়তার কোনও অভাব নেই। 'চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর লিউ ফুচুং বলছি। আমেরিকানদের প্রতি আমার নির্দেশ, ভাল চাও তো তোমরা যে যার হাতের অস্ত্র ফেলে দাও।'

কয়েক সেকেন্ড কিছুই ঘটল না। শত্রুরা বোবা হয়ে আছে।

তারপর আবার লিউ ফুচুং-এর নির্দেশ ছড়িয়ে পড়ল বিশাল টং আস্তানার চারপাশে, এবার সুরটা আরও কঠিন: 'হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়ো তোমরা। এটাই শেষ নির্দেশ। এরপর...'

হঠাৎ অন্য একটা লাউডস্পিকার জ্যান্ত হয়ে উঠল। 'আমি

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

ইউ.এস.এয়ারফোর্সের অপারেশন্স চিফ, কমান্ডার ডুগার্ড ম্যাকমোহান। আমি জানতে চাইছি–আমাদের কী হবে?'

ফুচুং জবাব দিল, 'আমাদের জিনিস আমরা ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, ব্যস। তোমরা আঙুল চুষতে চুষতে বাড়ি ফিরে যাও।'

ফুচুং থামতেই বজ্রকণ্ঠে নির্দেশ দিল ডুগার্ড ম্যাকমোহন: 'গ্রিন বেরেট, অ্যাটেনশন! নাসা অফিশিয়াল আর থাই টং, অ্যাটেনশন! তোমরা যে-যার সমস্ত অস্ত্র ফেলে দাও! দ্যাট'স অ্যান অর্ডার! এবং তারপরেই যে-যেখানে আছ শুয়ে পড়ো! আই রিপিট...'

চারদিকে গিজগিজ করছে চিনা সৈন্য, ওদিকে ট্রাক বহর নিয়ে কাছে চলে আসছে থাই সৈন্যরাও, এরকম একটা পরিস্থিতিতে কার সাহস হবে বীরত্ব দেখাবার! দ্বিতীয়বার বলবার প্রয়োজন হলো না, যে যেখানে ছিল হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে সেখানেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

*

চিনা এজেন্টদের সঙ্গে ভারতীয় টিমের কী সমঝোতা হলো মানস জানে না, তবে দেখতে পেল টিমের সবাই ঢাল বেয়ে ওর দিকে হেঁটে আসছে। এখনও অনেকটা দূরে তারা, ওর কাছে পৌঁছাতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে।

'দাদা, এবার আপনি বেরিয়ে আসতে পারেন!' হঠাৎ গলা চড়িয়ে বলল মানস ঘোষ।

এক কি দু'সেকেন্ড পর আড়াল থেকে বেরিয়ে, উদয় চৌধুরীর লাশটা টপকে, রানাকে ওর দিকে হেঁটে আসতে দেখছে মানস। কাঁধে ডক্টর নাদিরা রয়েছেন, তাই সাবধানে এগোচ্ছে সে।

পিসিআই এজেন্টরা আর উদয় চৌধুরী কীভাবে মারা গেল, পরিষ্কার দেখেছে রানা।

পাকিস্তানীরা দেখতে পায়নি ওকে, এটা বুঝতে পেরে পিছাতে শুরু করেছিল ও, হঠাৎ দেখতে পেয়েছে সামনের অন্য একটা ট্রাকের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে এক লোক।

লোকটা প্রথমে ডানে, তারপর বামে তাকিয়েছে। তার চেহারা আর বেশভূষা দেখে চমকে উঠেছে রানা। এত মিল গাঁজাখুরি গল্পেও সাধারণত পাওয়া যায় না– মুখে কদিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় এলোমেলো একরাশ চুল, সাদা পপলিনের শার্টের উপর ছাই রঙা জ্যাকেট, কোমরে সাদাটে জিনস।

ডানে-বামে তাকালেও, রানাকে দেখতে পায়নি ওর কার্বনকপি। একই চেহারা নিয়ে ওই লোক যে ওর বা ডক্টর নাদিরার কোনও উপকার করতে আসেনি, সেটা বুঝতে দেরি হয়নি ওর। পিছিয়ে ট্রাকের আড়াল চলে এসেছে ও, ডক্টর নাদিরার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখেছে কী হচ্ছে।

মানস জানে, তার বিপদটা মারাত্মক। এসপিওনাজে এরচেয়ে বড় অপরাধ আর হয় না। টপ বস্ রমেশ ঠাক্‌রের নির্দেশ ছিল, মঞ্চ থেকে রানাকে আউট করে দিয়ে ওর কার্বনকপি উদয়কে ইন করাতে হবে। সেই নির্দেশ শুধু অমান্য করেনি ও, নিজেদের লোককে গুলি করে মেরে ফেলেছে। কাজেই ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসে ওর ক্যারিয়ার শেষ।

মানসের উপর ঠিক কী নির্দেশ ছিল রানা তা জানে না, তবে আন্দাজ করে নিতে অসুবিধে হয়নি ওর।

উদয়কে খুন করবার আগে রানার একটা উপকারও করেছে মানস। উদয়কে দিয়ে পাকিস্তানী চার খুনিকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে। উদয় প্রায় হুবহু রানার মত দেখতে হলেও, তার একটা হাত নেই। সেখানে কৃত্রিম একটা হাত ফিট করা ছিল, হাতের মত দেখতে অত্যাধুনিক লেযার গান। উদয়কে হাত লম্বা করতে দেখেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে রানা।

আর উদয় যে উদয়ই, রানা নয়, এটা মানস বুঝতে পারে দুটো জিনিস দেখে– উদয় তার এক কানে রিঙ পরে, এবং

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

রানার চেয়ে ইঞ্চি দেড়েক কম লম্বা সে।

মার্কিন এয়ারফোর্স-এর কর্মকর্তা ডুগার্ড ম্যাকমোহানের ঘোষণা শুনেছে রানা, এই মুহূর্তে ডক্টর নাদিরাকে নিয়ে মানসের দিকে এগিয়ে আসছে।

'মাসুদ ভাই!'

ঘাড় ফিরে তাকাতেই মোহনাকে দেখতে পেল রানা, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে। তার সঙ্গে উত্তরাও রয়েছে। হাতের একে-ফোরটিসেভেনটা একটু উঁচু করে তাদের উদ্দেশে নাড়ল ও।

'নমস্তে, সার! সেলাম, হুজুর!'

সামনে মানস রয়েছে জানে রানা, তারপরেও ওর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু আছে, ঝট্ করে ঘাড়টা সিধে করল।

সেই সঙ্গে আজ দ্বিতীয়বারের মত চমকাতে হলো ওকে।

হাতের পিস্তলটা নিজের কপালে ঠেকিয়ে রেখেছে মানস। চোখাচোখি হতেই বিষণ্ন এক চিলতে হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। 'বিদায়, ওস্তাদ! যাবতীয় অপরাধ আর বেয়াদবি নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন!'

কীভাবে যেন বুঝে ফেলল রানা, ও স্বপ্ন দেখছে না। কীভাবে যেন সহজ যোগ অঙ্কটাও মিলিয়ে ফেলল– ওকে মেরে ফেলার নির্দেশ অমান্য করায়, ওর বদলে কার্বনকপিকে খুন করায়, মানসের সামনে এখন আর আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।

'না!' নিষেধ নয়, নয় অনুরোধও, মহৎপ্রাণ মানুষটির প্রতি ভালবাসার অধিকার থেকে আদেশ করল রানা। 'না, মানস, না!'

খালি হাতটা তুলে দেখাল মানস। ভারতীয় টেকনিকাল টিম এখন আর হাঁটছে না, ছুটে আসছে ওর দিকে। তবে তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে চিনা সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা।

রানাও দেখল তাদেরকে। 'ওদেরকে আমি ঠেকাব,' কথা দিল রানা। 'আপনি জানেন গোটা এলাকা এখন আমার বন্ধুদের দখলে। কেউ আপনার গায়ে একটা টোকাও দিতে পারবে না...'

মাথা নাড়ল মানস। 'বুঝলাম, আপনি আমাকে বাঁচাতে পারবেন। কিন্তু আমার ভোলার কী হবে? আমাকে ইন্টারোগেট করার সময় প্রথমেই ওকে ওরা মেরে ফেলবে। আমার মা আর দিদির কী হবে? ভেবেছেন আমি বেঁচে থাকলে ওরা তাদেরকে ছাড়বে, টরচার করে খুন করবে না?'

পিস্তলটা কপাল থেকে নামিয়ে মুখে পুরল মানস, তারপর টিপে দিল ট্রিগার।

এতক্ষণ কোথায় ছিল কে জানে, হঠাৎ ছুটে এসে কয়েকবার ডেকে উঠল ভোলা, তারপর কাত হয়ে মাটিতে পড়ে থাকা মনিবের পাশে পাহারায় বসল।

মাঝে-মধ্যে লাশটার গন্ধ শুঁকছে ওটা, ওর বুকপকেটে পোরা রানার রুমালটা শুঁকছে। সবই বুঝে ফেলল ও, তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে নালিশ জানাল; করুণ, লম্বা সুরে কেঁদে উঠল অবুঝ পশু। যেন বলছে, ফিরিয়ে দাও আমার মনিবকে!

রানার মত অবোধ প্রাণীটিও এই অকাল মৃত্যু মেনে নিতে পারছে না। রানা উপলব্ধি করল, সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুকে ওরই হাতে তুলে দিয়ে গেছে লোকটা।

ও যে থাকবে না, এ সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নিয়েছিল মানস ঘোষ।

বিশ মিনিট পর ডক্টর নাদিরাকে নিয়ে আকাশে উঠল দুরন্ত ঈগল। কেবিনে পাশাপাশি দুটো সিটে বসেছে মাসুদ রানা ও লিউ ফুচুং। দুরন্ত ঈগলকে চালাচ্ছে ফুচুঙের সঙ্গে করে নিয়ে আসা পাইলট। বেইজিঙে যাচ্ছে ওরা। মাঝে-মধ্যে রানার হাত

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

চলে যাচ্ছে ভোলার পিঠে। আদর করছে ওর পায়ের কাছে শুয়ে থাকা মানসের প্রিয় ডোবারম্যান পিনশার ভোলাকে।

থাই এয়ারফোর্সের আটটা জেট ফাইটার এসকর্ট করে থাই এয়ারস্পেসের শেষসীমা পর্যন্ত পৌঁছে দিল ওদেরকে।

***

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com